ইকবাল মননে অন্বেষণে

ফাহমিদ-উর-রহমান

B-13
IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No. 30801
LAHORE.

اقبال مونونے اونیشونے

ইকবাল মননে অন্বেষণে

ফাহমিদ-উর-রহমান

اقبال کے فکر و شعور کی تلاش

فہمید الرحمان

আল্লামা ইকবাল সংসদ

ইকবাল মননে অন্বেষণে
ফাহমিদ-উর-রহমান

প্রকাশনায়
আল্লামা ইকবাল সংসদ
৩৮০/বি মিরপুর রোড ৩য় তলা
ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৯৫
কার্তিক ১৪০২
জমাদিউস সানী ১৪১৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মহিউদ্দিন আকবর

লিপিসজ্জা
দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম
১৯০ এলিফ্যান্ট রোড, হাতিরপুল, ঢাকা১২০৫

মূল্য : ১২০.০০ টাকা মাত্র

Iqbal Manane Anneshane
[In quest of Iqbal's Thought and Perception]
Written by Fahmid-ur-Rahman
Published by Allama Iqbal Sangsad
380/B Mirpur Road, 2nd Floor
Dhanmondi R/A, Dhaka-Bangladesh
Phone : 406512, 257161
First Edition : November 1995
Price : Taka 120.00 US $ 5

উৎসর্গ

আমার আব্বা
মরহুম ডাঃ মোহাম্মদ মাসুদুর রহমানের
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—
যাঁর অনুপ্রেরণায় আমার ইকবাল চর্চার হাতেখড়ি।

লেখকের অন্যান্য বই

- খলিফাতাবাদের সন্ধানে
- কেন জিন্নাহ

সূচীপত্র

ইকবালের কবিতা ১১
ইকবাল ও বাঙ্গালী মুসলমান ২৬
ইকবালের খূদী দর্শন ৩৪
ইকবালের ইনসান-ই-কামিল ৫৫
ইকবালের আদর্শ সমাজ ৬৩
ইকবাল ও সক্রিয় রাজনীতি ৭১
প্যান ইসলামিজম ঃ আফগানী ও ইকবাল ৯১
ইকবাল ও গণতন্ত্র ১০৭
ইকবাল ও জাতীয়তাবাদ ১১৮
ইকবাল ও কমিউনিজম ১৩২
ইকবাল ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ১৪৪
ইকবাল কাব্যে রাসূল প্রশস্তি ১৫১
ইকবাল ও নান্দনিকতা ১৬১
ফররুখ কাব্যে ইকবালের অনুরণন ১৬৮
নবমূল্যায়নে ইকবাল ১৭২
ইকবাল ঃ জীবন ও কর্ম ১৮৯

আমাদের কথা

এদেশে ইকবাল চর্চা প্রায় শতাব্দী পূর্ণ হতে চলেছে। এর মধ্যে হাজারো পৃষ্ঠা মুদ্রিত হয়েছে ইকবালের জীবন ও কর্মের ওপর। কিন্তু ইকবালের রচনা সমগ্র আজ অবধি প্রকাশিত হয়নি। এর প্রধান কারণ হয়তো ভাষার প্রাচীর।

তবু বলা যায়, অনুবাদের মাধ্যমে ইকবালের ম্যাসেজ বাংলা ভাষাভাষি এরই মধ্যে পেয়ে গেছে। আশার কথা যে—ইকবাল রচনা সমগ্রের কাজও এগিয়ে চলেছে। প্রতিশ্রুতিশীল লেখক-গবেষক ফাহমিদ-উর-রহমান আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে তুলে এনেছেন দার্শনিক কবির চিন্তা ও কর্মের বিস্তৃত পরিচয়। এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে ইকবাল হবেন আরো পরিদৃশ্যমান, আরো আলোকসম্পাতি। আর ইকবাল চর্চাও হবে আরো বেগবান। আমাদের জাতীয় আদর্শ ও মননের পরিপুষ্টির জন্য এই গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

আরজ

ইকবাল আমাদের চেতনা ও ভালবাসার অনুভূতিতে জীবন্ত হয়ে আছেন। মহাকালের দুর্দৈব ও মূঢ় সংক্রান্তিকে অতিক্রম করে তাঁর কাব্য এক অবিনাশী বায়ুস্তরে পৌঁছেছে।

ইকবাল কবিতা লিখেছেন। দর্শন চর্চা করেছেন, কখনো কখনো রাজনীতির বন্ধুর পথ ধরেও তাকে হাঁটতে হয়েছে। এই যে বহু পথের পরিমার্জনা। একটি মাত্র লোকের জীবনে এত ফুলের সমাহার, এর মধ্যেও এক মহৎ মানবতাবাদী কবির সৌরভ-মদিরা ছড়িয়ে আছে।

তিনি যখন কবিতার বাগানে ঘুরে বেড়ান তখন তার কবিতার পত্রগুলো হয়ে ওঠে ভুখা-নাঙ্গা মজলুম ইনসানের হাতিয়ার। তিনি যখন দর্শনের অতলান্তিক সমুদ্রে পরিভ্রমণ করেন তখন তার ভাবনার পাপড়িগুলো হয়ে ওঠে ধর্মাদর্শ নিষিক্ত এক মহামানবিক চিন্তাধারার আকর। তিনি যখন রাজনীতির ভাষায় কথা বলেন তখন তার সত্যভাষণ মানবমুক্তির প্রশ্রয় খোঁজে বারবার।

আমাদের জীবনেও ইকবাল এসেছেন পৌনপৌনিকভাবে। মুসলিম জাগরণ ও অভ্যুত্থানের কবি কণ্ঠ হিসেবে তিনি আমাদের বোধে, মননে ও সাহিত্যে অগ্নিমশাল হেনেছেন তীরতীব্রভাবে।

বাংলা ভাষায় ইকবাল চর্চার সিলসিলা অবাধ গতিতে এগিয়ে গেলেও একাত্তরের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে চক্রান্তকারীদের চেতনা ও চিন্তার ক্লৈব্য দানবীয় আকৃতি গ্রহণ করে। মানুষের শুভাশুভ ও কল্যাণবোধের মর্মকে পীড়িত ও অসুস্থ করে তোলে। এই পীড়িত শরীরের উত্তাপ ইকবাল চর্চার গায়েও এসে লাগে।

দেশে দেশে চক্রান্তকারীদের এই অসুস্থ মানসিকতাই বারবার মানবতাকে পিছিয়ে দেয়; মানব প্রগতির সকল দুয়ার পেরেক ঠুঁকে বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের উপর থেকে বৃটেনের রাজনৈতিক ছায়া অপসৃত হলেও থেকে গেছেন শেক্সপিয়র, শেলী, কিটস, টি,এস এলিয়টেরা। ভৌগোলিক দূরত্ব ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি এদেশে গ্যাটে, হুইটম্যান কিংবা গোর্কী, মায়াকোভস্কির চর্চা।

বাংলাদেশও এক সময় ছিল যুক্তবাংলার অংশ। রাজনৈতিকভাবে আমরা এখন স্বতন্ত্র জাতিসত্তার অধিকারী এবং বাংলাদেশী নামে পরিচিত। কিন্তু তাই বলে বাঙালী রবীন্দ্রনাথের উপর কেউ খড়গহস্ত হোক— একথা কেউ চিন্তা করেনি এখানে। তেমনি ওখানকার কোন শিল্পী-সাহিত্যিকের উপর নেমে আসেনি কোন নিষেধাজ্ঞা। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন ঃ সত্যের কোন জিওগ্রাফী নেই। তাহলে এদেশে বৈশ্বিক ও মানবিক ইকবাল চর্চাটাও বোধ হয় খুবই সংগত ও স্বাভাবিক। তাছাড়া উপমহাদেশে ইসলামী মানস জাগরণের অগ্রণী মুখপাত্র হিসেবে ইকবালের সাথে আমাদের নাড়ীরও যোগাযোগ।

অনেকটা কর্তব্যবোধের দায় থেকে বিভিন্ন সময় ইকবালের উপর কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি। এর কয়েকটি দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয় সাহিত্য সম্পাদক জনাব হাস্‌নাইন ইমতিয়াজের অশেষ উৎসাহে। বাকীগুলো প্রকাশিত হয় দৈনিক মিল্লাত, সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, মাসিক ঐতিহ্য, ত্রৈমাসিক আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকায়। এ সবেরই সংকলিত রূপ এই পুস্তক।

লেখালেখি করবার সময় ইকবালের বিভিন্ন কবিতার অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলায় যে সমস্ত কবিতা ইতোমধ্যে অনূদিত হয়েছে সেগুলো আমি যথাসাধ্য ব্যবহার করেছি। যেগুলোর

অনুবাদ হয়নি কিংবা সন্ধান পাইনি সেগুলো নিজ থেকেই করতে হয়েছে। এটি অপচেষ্টা হলেও আমি ছিলাম উপায়হীন।

লেখালেখির প্রয়োজনে ইকবাল সম্পর্কিত দেশ-বিদেশের নানা বই আমাকে ঘাটতে হয়েছে এবং এসব বই-পুস্তক থেকে আমি সাহায্য নিয়েছি অকৃপণভাবে। এসব বই-এর গ্রন্থকার ও রচয়িতাদের জানাই মোবারকবাদ।

এ গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার জন্য বিভিন্নজন বিভিন্ন সময় আমাকে উৎসাহিত করেছেন। অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা।

বিশেষ করে স্মরণ করছি বরিশালের ডাঃ আরজুমান্দ আকতার, বাল্যবন্ধু ডাঃ খন্দকার মোঃ মাসুদ ও শ্রদ্ধেয় বড়ভাই ডাঃ সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমেদকে, যাদের সহযোগিতা ব্যতীত এ পুস্তক কখনো প্রকাশিত হতো না। আমি আরো স্মরণ করছি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েনকে যিনি শত ব্যস্ততা ও কর্মপ্রবাহের মধ্যেও এ পুস্তকের পান্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং ভূমিকা লিখে দিয়ে এ পুস্তকের ইজ্জত বৃদ্ধি করেছেন বহুলাংশে। এ পুস্তক যখন ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে তখন তিনি সকল লোকচক্ষুর ওপারে চিরকালের দেশে গিয়ে হাজির হয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন।

পরিশেষে মোবারকবাদ জানাই পুস্তকের প্রকাশক আল্লামা ইকবাল সংসদ এবং সংসদের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল ওয়াহিদকে—যাদের অপরিসীম উদ্দীপনা এদেশে ইকবাল চর্চার ইতিহাসকে অনেক অপ্রেম ও নির্বান্ধবিকতার মধ্যেও প্রীতিপূর্ণ করেছে।

ফাহমিদ-উর-রহমান

ভূমিকা

ফাহমিদ-উর-রহমান পেশায় চিকিৎসক। কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ গভীর। চিকিৎসকেরা সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে পারেন না বা সাহিত্য পাঠ করার অধিকার তাদের নেই তা নয়। তবে সাধারণত সাহিত্য সৃষ্টি বা সাহিত্য সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করার অবকাশ এদের হয় না। সেদিক থেকে ফাহমিদ-উর-রহমান বেশ ব্যতিক্রমধর্মী।

সে অনেক দিন থেকে ইকবাল সাহিত্য চর্চা করছে। তার সংগে আলোচনায় যেটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে সেটা হলো এই যে, ইকবাল দ্বিবিধ কারণে তাকে আকর্ষণ করে। প্রথমত. নিছক কাব্য হিসাবে ইকবালের কবিতা হৃদয়গ্রাহী, দ্বিতীয়ত. আধুনিক যুগে আর কোন কবি দর্শনকে এভাবে কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আরো আকর্ষণের কারণ ইকবালের ইসলামপ্রীতি। ইকবাল ইসলামের শাশ্বত আদর্শকে যেভাবে তাঁর কাব্যে ব্যাখ্যা করেছেন তার তুলনা মুসলিম বিশ্বে নেই। এমনকি আরবী, ফার্সী বা তুর্কী ভাষায় কোন কবিই আধুনিককালে ইকবালের মত ইসলামের মৌল বিশ্বাসগুলিকে কাব্যে রূপান্তরিত করতে পারেননি।

বেশ কিছুকাল ধরে ইকবালের কবিতা এবং চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ফাহমিদ-উর-রহমান প্রবন্ধ লিখে আসছে। এর অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থটি এসব প্রবন্ধের সংগ্রহ। এগুলি সবই আমি দেখেছি এবং যে জিনিসটা লক্ষ্য করে পুলকিত বোধ করেছি সে হলো, এই বয়সেও ফাহমিদ-উর-রহমান ইকবালের চিন্তাধারার মর্মবাণী হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে এবং এর ফলে তার মনে যে অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে তার প্রবন্ধগুলিতে।

তরজমায় ইকবালের রচনা যতটা পড়া সম্ভব ফাহমিদ-উর-রহমান সে চেষ্টা করেছে। তবে যারা মূল উর্দূ ও ফার্সীর সাথে পরিচিত তারা হয়ত বলতে পারেন যে, শুধু অনুবাদের উপর নির্ভর করে এ রকমের আলোচনার সার্থকতা কোথায়? এর জওয়াবে বলা যায় যে, বিশ্বের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের রচনার সংগে আমাদের পরিচয় অনুবাদের মাধ্যমে। আমরা হোমার, ভার্জিল, দান্তে প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত কবির রচনা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই অনুবাদের উপর নির্ভর করেই। সেই কারণে এ ধরনের আলোচনার যে কোন মূল্য নেই– সে কথা স্বীকার করা যায় না।

ফাহমিদ-উর-রহমানের প্রবন্ধে ইকবালের চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক যেমন আলোচিত হয়েছে তেমনি মুসলিম ঐতিহ্যে ইকবালের স্থান কোথায়– সে সমস্যার উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য। আমার বিশ্বাস, বাংলাদেশের পাঠক যারা মূল উর্দূ ও ফার্সীর সঙ্গে পরিচিত নয় তাদের মনে এই বই পড়ে ইকবালের কাব্য এবং চিন্তাধারার প্রতি একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হবে।

বলা বাহুল্য, ইকবাল গতানুগতিকভাবে ইসলামকে দেখেননি। তিনি মুসলিম বিশ্বকে যে খূদীর বাণী শুনিয়েছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে নিষ্ক্রিয়তা ও নির্জীবতা থেকে রক্ষা করা। এই দর্শনের প্রয়োজন ত মেটেইনি বরঞ্চ বলা যায় যে, আজকের বাংলাদেশে এর প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আশা করি, ফাহমিদ-উর-রহমানের প্রবন্ধ সংগ্রহ বহুল প্রচারিত হবে। তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে মোবারকবাদ জানাই এই জন্য যে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে একাগ্রচিত্তে গত কয়েক বছর ধরে সে যেভাবে ইকবাল সাহিত্যের সাধনা করছে– সেটা তরুণদের সামনে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

ইকবালের কবিতা

ইকবালের কবিতা মৃত্যুঞ্জয় জীবনের প্রাণোন্মাদক সুরা, এ হলো নতুন প্রভাতের স্বপ্নীল গীতিমালা। ইকবালের কবিতা ঐতিহ্যের রঙিন পশমিনার উপর এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পকাজ।

অন্ধকারে আলোক বিচ্ছুরণের মতো অভ্যুন্নত এই তীর্থযাত্রী কবি তন্দ্রাতুর মানবতার শিয়রে জীবন জাগার পুষ্পিত সৌরভ বহন করে এনেছেন। তাঁর ঠিকানা এক দূরচারী সর্বমানবিকতার প্রসারী রৌদ্রপ্রখর আলোতে দীপ্তিমান।

ইকবাল নবযুগের কবি; যুগ সঙ্কটেরও কবি। মানবতার সকল দ্রোহবুদ্ধির অচলায়তন উপড়ে ফেলার তাই তিনি ডাক দেন। দেশে দেশে হানাহানি, জাতিত্বের অভিমান কিংবা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে যে আন্তর্জাতিক পরিচয়, ইকবাল সেই মহামানবযাত্রার সঙ্গী। ইকবালের বিশ্বাসের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায় সাধারণ মজলুম মানুষ; সমস্ত ইতিহাসের প্রবাহে তিনি তাদেরকেই দেখতে পান উন্নত ও প্রকর্ষিত। এরই মোহমুগ্ধতায় তিনি আজীবন কবিতা লিখেছেন; এরই স্বপ্নাচ্ছন্নতায় তিনি খরশরবিদ্ধ করেছেন সকল অসাম্য আর যা কিছু এর বিপক্ষে দণ্ডায়মান। ইকবাল এক পত্রে লিখেছেন–

আমার পূর্ব পুরুষগণ কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন, যারা তাদের জীবন এই ভাবনাতে উৎসর্গ করেছেন যে, খোদা কি? আর আমি এ চিন্তায় মগ্ন, মানব কি?

এই স্বপ্নে ইকবাল এসে পৌঁছেন এক খোলা চত্বরে, যেখানে স্বদেশী-বিদেশীর পরিচয় লুপ্ত, যেখানে লেনদেন চলে সকলের সাথে। নানা দেশীয় ধাতু দিয়ে তাঁর এই কবিতার তাম্রপাত্র মোড়ানো।

ইকবালের কবিতায় বাংলা পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম মনীষার মহোত্তম বিকাশ ঘটেছে। তিনি লিখেছেন প্রধানত উর্দূ ও ফার্সীতে এবং কিছুটা ইংরেজীতেও। তাঁর একটি মাত্র গদ্য গ্রন্থ 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' চোস্ত ইংরেজীতে লেখা। এই যে বহুভাষার পরিমার্জনা, এর মধ্যেও ইকবালের সুদূরচারী মনের কিছুটা পরিচয় মিলবে। হয়ত তিনি নিজেও চাইতেন তাঁর বিশ্বদৃষ্টি এইভাবে বহু পথ ঘুরে একটি কেন্দ্রে এসে মিলিত হবে। কাব্যের শাশ্বতকে তিনি সবসময় উঁচু করে ধরেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সংকীর্ণ স্বার্থের সাধনায় কোন মুক্তি নেই–

> মহাজাতি বেঁচে থাকে চিন্তার ঐক্যে,
> ধার্মিক অনুষ্ঠানও যদি ভাঙ্গে সেই এককে
> জানব তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধ। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী।)

ইকবালের সত্যিকার কবি জীবন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই। ছাত্র জীবনেই তিনি কমবেশী কাব্যচর্চা করতেন এবং বিভিন্ন মুশায়ারায় (কাব্য-সভায়) যোগ দিতেন। এ সময়েই তাঁর সাথে যোগাযোগ হয় হায়দ্রাবাদের কবি মীর্জা দাগের সাথে। ইকবাল ও দাগের মধ্যে চিঠিপত্রের বিনিময় হত। ইকবাল কবিতা ও গজল লিখে সংশোধনের জন্য দাগের নিকট পাঠাতেন। এ সময়ই ১৯০১ সালে লাহোরের এক মুশায়ারায় ইকবাল তাঁর বিখ্যাত হিমালা কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। তরুণ কবির কণ্ঠে সেদিন শ্রোতারা শুনতে পায় সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যের এক রূপ-তাঁর স্বাদেশিক চেতনার মধুর অন্তরঙ্গিতা।

ইকবালের এ যাত্রা শুরু হয়েছিলো উনিশ শতকের মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকদের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে। তাঁর তখনকার প্রায় সব কবিতার মর্মবীণায় এসে যোগ হয়েছিলো ভারতীয় তপস্যার সাধনা। ইকবালের কাছে তখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল মুসলমানদের প্রয়োজনীয় সমস্যাটি।

সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে ভারতীয় মুসলমানরা ছিল রাত্রিশেষের গভীর ঘুমে অচেতন। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ভারতীয় মুসলিম শক্তির উপর যখন পাশ্চাত্যের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো তখন তাদের নিঃশ্বাস বন্ধের উপক্রম। সেই সাথে যুক্ত হলো ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির জয়যাত্রা। এই দুই বৈরী সংস্কৃতির উপর্যুপরি আঘাতে ভারতীয় মুসলমানদের দীর্ঘ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকোজ্জ্বল মিনারটি ভেঙ্গে পড়তে আরম্ভ করলো।

এ সময় গালিব, হালী, আকবর এলাহাবাদী প্রমুখ শক্তিশালী কবি মুসলমানদের তাঁদের অতীতের গৌরব গাঁথা স্মরণ করিয়ে জাগাতে চেয়েছেন। একথা সত্য, ভারতে মুসলিম জীবনে নতুন সুরের ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়েছে উর্দূ সাহিত্যে। দিশেহারা মুসলিমকে সামনে চলার বাণী দিয়ে জাগিয়ে তুলবার মত আশার দীপ্তি ফুটে উঠেছে এখানেই। রাজনৈতিক অঙ্গনে স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর সাধনার বাণী দিয়ে এবং উর্দূ কবিরা তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী গান গেয়ে সমাজের স্তরে স্তরে জাগরণের জলতরঙ্গ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও পরিণত হয়েছে এক দীর্ঘবিলাপে। এক নিঃসীম অসম্পূর্ণতা বেলা শেষের করুণ রাগিনী হয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

এর পরে, ইকবালের আগমন। অফুরন্ত বীর্যের দৃঢ়তায়, প্রজ্বলিত মরু রাত্রির নক্ষত্র দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন করেছেন হতাশ্বাস পীড়িত মুসলিম অন্তরকে। এক অপূর্ব তেজস্ক্রিয়তার বাণী দিয়ে তিনি তাদের অতীতকে তুলে আনলেন বর্তমানের জলছবিতে; তিনি তাদের ভবিষ্যৎকেও প্রতিফলিত করলেন বর্তমানের দর্পণে–

I Keep in view the glorious past
And See the morrow in the mirror of today.

রাজ্যহারা অপাংক্তেয় দুর্ভোগপীড়িত মুসলমানদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন এই দেশ তোমারও। এই হিমালয় তোমার পিতৃ-পুরুষের বাসভূমি। এই গঙ্গার তীরে একদিন উঠে এসেছিলো তোমারই কাফেলা। এ সময় লেখা প্রসিদ্ধ একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন ঃ

ধর্ম আমাদের শেখায়নি কলহ, ভারতীয় আমরা
মাতৃভূমি আমাদের এই ভারতবর্ষ। (তারানা-ই-হিন্দ, অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

১৯০৫ সালে বিদেশ যাবার আগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ছিল ইকবালের স্বপ্ন আর আবেগের বস্তু। তারানা-ই-হিন্দি'র কবি লিখলেন ঃ হিন্দি হ্যাঁয় হাম ওয়াতান হ্যাঁয়, হিন্দুস্তাঁ হামারা। এ সময় তাঁর মুখে ছিল হিন্দু মুসলমানের ঐক্যভাবনার কথা। এ কথা ঠিক, ইউরোপীয় সংঘ শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সামনে তাঁর স্বাদেশিকতা জাগ্রত হয়েছিল, পাশাপাশি তাঁর এ প্রতীতিও জন্মেছিল ভারতের কল্যাণ আসতে পারে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের মধ্য দিয়ে। তবেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে সে। মহামানবযাত্রার সেও হতে পারে সঙ্গী–

সবাইকে দেখাব তোমাতে বিশ্বাস কাকে বলে
হে হিন্দুস্তান
নিবৃত্ত হবনা যতদিন জীবনের ত্যাগ পূর্ণ হয়নি তোমার কাছে।
আমার এই একমুঠো প্রাণধূলি করব বপন,

অঙ্কুরিত হয়ে বেরোবে তাতে নতুন হৃদয়, প্রাণে ভরা, জাগবে কুঁড়ি হয়ে।
ধর্মান্ধতা বাসা বেঁধেছে আমার এই দেশের মাটিতে,
আমি সেই ঝড় যাতে ভাঙবে ধূলোয় সেই ইমারত। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য তা-ই ইকবাল সন্ধান করে ফিরেছেন। এই কবিতাটির অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

এই যে বিভিন্ন ছড়ানো রুদ্রাক্ষ, সব নিয়ে গাঁথব জপমালা,
হোক কঠিন এ-ই হবে আমার কাজ।
অবগুণ্ঠন ঘোচাব আমি প্রিয়ার মুখ থেকে,
প্রিয়া আমার 'একতা'
লজ্জা দেবো আমি গৃহবিবাদকে।
সারা দুনিয়াকে দেখাব আমি কী দেখেছি মুগ্ধ চোখে। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

ইকবালের ভারতীয় গুলিস্তানে শোনা গেলো অভূতপূর্ব সামগান। নানক এসে হাত ধরলেন আলফেসানীর। বুদ্ধের গাঁথা উঠল আকাশে বিশ্বামিত্রের সাথে। ব্রাহ্মণের স্তোত্র এক হল মুয়াজ্জিনের ভক্তগাঁথায়। মূর্তিপূজার দেশে ইকবাল এমন শিবালয় (উপাসনাগার) তৈরি করলেন যেখানে শুধুমাত্র প্রেমের মন্ত্র উচ্চারিত হলো–

ওরে ব্রাহ্মণ! মন্দিরের দেবতা তোর পুরনো হয়ে গেছে!
নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ–এতো তুই তাঁর কাছেই শিখেছিস,
খোদাইত শিখিয়েছেন ওয়ায়েজকে ঝগড়া বিবাদ করতে।
মসজিদ মন্দির কোনটাতেই আমার ভক্তি নেই।
ব্রাহ্মণ মোল্লা দুইই ছেড়েছি আমি।
তুই ভেবেছিস পাথরের মন্দিরে দেবতা আছে,
নতুন শিবালয় তৈরী করব প্রাণের বসতভূমিতে
উদার আকাশ মেলে দেবে এ চূড়ার পাখা।
সকল তীর্থের সেরা তীর্থ হবে এই
মানুষের মুক্তি আসবে প্রেমের ভিতর দিয়ে। (নয়া শিওয়ালা, অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)

ইকবালের কবি জীবনের প্রথম অংশের কবিতাসমূহেই মূলত তাঁর দেশাত্ম সাধনার ধারা উজ্জীবিত হয়েছে। তাঁর এ যুগের বহু কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় বিশেষতঃ স্যার আবদুল কাদির সম্পাদিত 'মাখজান্' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। এ ছাড়া হিমালার মত এ যুগে 'আঞ্জুমান-ই-হিমায়েত-উল-ইসলামে'র জন্য রচিত 'নালায়ে এতীম', 'পরিন্দে কি ফরিয়াদ', 'গুল-ই-রঙিন', 'শামা ও পরওয়ানা', 'এক আরজু', 'চাঁদ' 'রাভি কিনারে', 'তারানা-ই-হিন্দ' এসব কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। এ যুগের প্রায় সব কবিতাই উর্দূতে লেখা যা পরবর্তীকালে কবির বিখ্যাত কাব্য 'বাঙ্গ-ই-দারায়' সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলির উপর নজর ফেরালেই এর অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে। প্রাচীন রীতির বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন সৃষ্টির কলগীতিতে যেন মুখরিত হয়ে উঠেছে এ সমস্ত কবিতার প্রাঙ্গণ–

ওগো আলোর শিখা! কেন পতঙ্গ তোমায় ভালবাসে।
কেন বিসর্জন দেয় তাঁর জীবন।
কি প্রেম তুমি তাকে শেখালে।
কিসের মায়ায় পারদের মত সে অধীর চঞ্চল?

কি প্রেম তুমি তাকে শেখালে?
তোমার আলোতে অনন্ত জীবন সে খুঁজে পায়
মরণেই পায় সে চরম শান্তি।
তোমার সুমুখে লুটিয়ে পড়া এইতো তার চরম আকাঙ্ক্ষা.
কি প্রেম তুমি তাকে শেখালে।
(শামা ও পরওয়ানা. অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)
আমার কাজ নয় ডাল থেকে ফুল ছেঁড়া
তারই রীতি এ– যে চায় শুধু বাহিরের শোভা।
বাগানের বেদিল মালী আমি নই
আমার হাত জানেনা আঘাত করতে।
বিজ্ঞানের তত্ত্ব নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই
বুলবুলের চোখ নিয়ে আমি শুধু চেয়ে থাকি
ফুলের দিকে– চেয়েই থাকি
(গুল-ই-রঙিন. অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)
হে চাঁদ. তুমি যা খুঁজছ তাঁরই সন্ধানী আমিও–
জ্যোৎস্না হলো তোমার আলো.
আমার হলো প্রেম।
তোমার জগতে তোমার রূপের তুলনা নেই।
আমিও একা আমার জগতে।
দিনের আলো নিয়ে আসে তোমার মরণ
অনন্তের ধ্যানে আমিও হই দিশেহারা
(চাঁদ, অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)

ওগো জ্ঞান! জানো তুমি জীবনের রহস্য
আমি (প্রেম) শুধু দেখে যাই– দেখেই যাই।
বাহিরকে দিয়ে তোমার কাজ
আমার প্রবেশ অন্তরের গোপন প্রদেশে।
খোদাকে খোঁজো তুমি. বুঝতে চাও তুমি.
খোদা প্রেম কিন্তু আসে আমার কাছ থেকে:
স্রষ্টাকে আমিইতো করি প্রকাশ
(আক্ল আওর ইশ্ক্, অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)

এগার বছর পর ১৯৩৫-এ এসে ইকবালের দ্বিতীয় উর্দূ কাব্যগ্রন্থ 'বাল-ই-জিব্রীল' প্রকাশিত হয়। অন্তবর্তী সময়ে তাঁর যেমন ঘটে রূপান্তর নানা দিক দিয়ে তেমনি এই মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময়ে তিনি ফার্সী ভাষায় উচ্চাঙ্গের মিষ্টিক কাব্যও সৃষ্টি করেন। এখন থেকে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্যের এই ধ্যানমুগ্ধ কবি সরে যেতে থাকেন তার পুরনো অবস্থান থেকে; ভারতীয় সীমানা ছেড়ে তিনি যাত্রা করেন বিশ্বলোকালয়ে।

আশ্চর্যের বিষয়, জাতীয়তার অন্দর পার হবার সময়ই তিনি তুলে নেন পারসিক ভাষা। বোধ করি এ সময় তিনি উর্দূর স্বদেশী বৈচিত্র্যও ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। এখন থেকে তাঁর জাতীয়তা সর্বজাতীয়, পারসিক ভাষা তাঁর বিশ্বজনীন ভাবের বাহন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন–

হিন্দের ভাষা চিনির মত মিষ্টি যদিও
ফারসী ভাষার ভঙ্গি মধুরতর।
এ ভাষার সৌন্দর্যে মন আমার মুগ্ধ,
ভাব আমার অতি উচ্চ
ফারসীই এই ভাবের যোগ্যতম বাহন।
রসেরই বিচার করো শুধু
পাত্রের সঙ্গে করোনা বিবাদ। (অনুবাদ–হাবীবুল্লাহ বাহার)

নিজের কওমকে দেশাত্মবোধের শক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত করবার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইকবাল জানতেন ইসলামের পূর্ণতর মানবিক রূপায়ণের জন্য তা মোটেও যথেষ্ট নয়। এখন থেকে তাই তিনি ধর্ম সাধনার পথে মানবমুক্তির প্রশ্রয় খুঁজতে শুরু করলেন। এই যে মাত্র কিছুদিন আগেও ভারতের ফুল বাগানে তিনি হলেন এক বুলবুল– একথা তারস্বরে বলেছিলেন 'তারানা-ই-হিন্দ' কবিতায়, কিন্তু সেই কবিই মাত্র কিছুদিন পর তারানা-ই-মিল্লীতে গেয়ে উঠলেন–

চীন ও আরব হামারা হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যাঁয় হাম ওয়াতান হ্যাঁয় সারা জাঁহা হামারা।

দেশ প্রেমের উপর এক ধর্ম প্রেমে পৌছলেন তিনি। ভৌগোলিক দেশের ধারণাকে তিনি ক্ষতবিক্ষত করলেন; জাতীয়তাবাদকে বিবেচনা করলেন এক রক্তাক্ত প্রান্তর। এই সংকীর্ণ জালকে ছিন্ন করবার জন্য তিনি খুঁজলেন সর্বব্যাপী এক ইসলামের পৃথিবী। তাঁর বিশ্বাস ছিল কাবাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজোড়া এক ইসলামী রাষ্ট্রের পত্তন ঘটবে, যার মধ্যে উজ্জীবিত হবে মানবিক কল্যাণের ফুলেল স্পর্শ– ঐহিক কল্যাণের সুস্থতার কোন স্বপ্ন।

কিন্তু একথা কি তখনও বলবার উপায় ছিল? মানবিকতার গায়ক, বাদক, প্রচারক সবই তখন ইউরোপ। ইউরোপের কণ্ঠেই তখন জাতীয়তাবাদের মিঠেকড়া সুর। তাই মুসলমানদের পূর্ণাঙ্গ কোন ব্যবস্থাপত্র দেয়ার আগে ইকবালেরই প্রয়োজন ছিল ইউরোপের প্রাণস্পন্দন অনুভব করবার। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালে তাঁর প্রবাস যাপন পর্বে এল এ সুযোগ। তিনি পরিচিত হতে লাগলেন ইউরোপের বিচিত্র কলার সঙ্গে। তিনি একদিকে যেমন শুরু করলেন ইউরোপীয় দর্শনের প্রগাঢ় চর্চা তেমন তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীর ছলনাময় প্রবৃদ্ধি; তার পীড়াদায়ক কৌশলাদির প্রতি। প্রাচ্য আর মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ জিইয়ে কিভাবে পশ্চিমী দেশগুলো তার ঠগীবৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছে– ইকবালের পক্ষে তা বোঝা মোটেই দুষ্কর হল না। মোটকথা, তিনি ইউরোপকে দেখলেন সমীকৃত করে। পর্যটকের মাধুকরী মন নিয়ে নয়, বিশ্লেষকের অবিচিত্র ও নির্মোহ দৃষ্টিতে। পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর-গভীরে যে দুর্বীনিত শক্তির ক্রিয়া চলছে, সাম্রাজ্যবাদীর পদপিষ্ট হয়ে যারা আজ ক্লান্তিহীন আহাজারীতে ডুবে আছে ইকবাল তারই ছবি তুলে আনলেন শিল্পীর প্রচ্ছায়ায়। ইউরোপ প্রবাসের সময়ই তিনি আঁচ করেছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রায়ান্ধকার ইঙ্গিত। পশ্চিমী সভ্যতার বুকে তাই তিনি ছুড়লেন খরধার তীর। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা যুদ্ধাক্রান্ত আবিসিনিয়ার দুঃখে তাঁর মর্ম উৎপীড়িত হলো; তাঁর কলমে ছুটলো আগুন– কেঁপে উঠলো ন্যাশনালিজমের তস্কর তনুকা–

ইউরোপীয় শকুন দল এখনো জানেনা
কত বিষাক্ত ঐ শবদেহ আবিসিনিয়ার।.....
সভ্যতার শীর্ষ হচ্ছে মহত্ত্বের অধঃপতন,

নেশন– এর প্রাত্যহিক জীবিকা দস্যুবৃত্তি
নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে প্রত্যেক নির্দোষ এক–একটি
মেষশাবকের সন্ধানে।
বিলাপ করো, চার্চের স্বমহিমার আয়নাটি ভাঙল
রাস্তার মাঝখানে ঐ রোমানেরা;
হায়রে চার্চের মানুষ, হৃদয়বিদারক এই ঘটনা। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

ইকবালের চোখে তখন বারুদ। আরো কয়েকটি প্রজ্বলিত দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। যেমন–

যদিও এসব গোপন বারতা বলবে না কোন দানেশমন্দ,
ফিরিঙ্গি এক বেখেয়ালভাবে ফাঁস করে দেয় অকস্মাৎ ঃ
গণতন্ত্র কি জানতে পেরেছো? এক ধরনের সে হুকুমত,
মানুষের সেথা শুধু গোনা হয়, হয়না ভুলেও করা ওজন।
(জমহুরিয়াত, অনুবাদ– ফারুক মাহমুদ)

ভুল বুঝাবুঝি যত এরি লাগি জাতি বিদ্বেষ ও হানাহানি
বাণিজ্য জাল বিস্তার লাগি প্রয়োজন হ'ল জয়ের গ্লানি
ইহারি কারণে রাজনীতি হতে দূরে পালিয়েছে সততা যত,
এরি ফলে আজ হতেছে ধ্বংস গরীবের প্রিয় কুটির শত।
খোদার সৃষ্টি মানুষ জাতিটি দেশের টানেতে শতধা হয়,
মহান ভ্রাতৃভাবধারাবাহী ইসলাম এতে হয় যে লয়।
(ওয়াতানিয়্যাত, অনুবাদ– মনির উদ্দীন ইউসুফ)।

আন মদ্য প্রিয় হেজাযের
পশ্চিমের সুরা রস মূক আজ করেছে মোদের।
(শামা আওর শায়ের, অনুবাদ– মনির উদ্দীন ইউসুফ)

ইকবালের মন সরে গিয়েছিল পশ্চিমী দেশ থেকে। তিনি এবার পরিপূর্ণ নির্ভরতার সাথে মুখ ফেরালেন পূর্বীয় দেশগুলোর দিকে। এতদিন যে ইসলাম তাঁর চৈতন্যের গভীরে দল মেলবার প্রত্যাশায় দিন গুণছিল, পূর্ণ প্রত্যয়ে এবার তা বিকশিত হবার দাবী জানালো। বলা চলে, ইকবালের মধ্যে ইসলামের নবজাগরণও ঘটলো। বহুদিন ধরে পশ্চিমী সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দানবীয় যাত্রার প্রেক্ষাপটে রাজ্যহারা সাম্রাজ্যবাদ দলিত মুসলমানরা যে অসহায়ত্বের যবনিকায় ডুবে ছিল এবার তারও অবসান হল।

নিকলসন তাঁর আসরার-ই-খূদীর ইংরেজী অনুবাদ ভূমিকায় এক মুসলিম যুবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা ছিল প্রকৃত অর্থেই যথার্থ–

Iqbal has come among us as a Messiah and has stirred the dead with life.

তিনি মুসলমানকে নব প্রেরণা নিয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন–

ভোলো এই নাম ডাকা
সিরিয়া, ইরাক, প্যালেস্টাইন। (অনুবাদ– শঙ্খ ঘোষ)

জাতীয়তাবাদকে তিনি মানবিকতার বৃহত্তম দায়িত্ব পালনে অক্ষম এক বাহন হিসেবে চিত্রিত করলেন। পাশাপাশি ইউরোপীয় সভ্যতার চিন্তার উৎসকে তিনি গণ্য করলেন মানবতার ঘাতক হিসেবে। অতঃপর ইকবাল ইসলামের আন্তর্জাতিক চিত্রটি নিয়ে অগ্রসর হলেন; নতুন সভ্যতার

বিন্যাসের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি ইঙ্গিত করলেন কোরআনী সমাধানের সূত্রগুলো। জাভিদনামায় তিনি লিখেছেন–

কোরান কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা, আর
অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কোরান আশ্রয় তার।
আমরা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটিজল খাই
আমরা আদমের বংশধর যারা, সবাই এক আত্মাই।
মনের ভিতরে তা পৌঁছে যায় যদি, বদল হয়ে যায় মনে
বদল হলে মনে গোটা এ পৃথিবী সে মাতায় পরিবর্তনে। (অনুবাদ– শঙ্খ ঘোষ)

এই বিশ্বাসের উন্মুখরতা নিয়ে ইকবাল চাইলেন মানবিকতাকে আরো ঋদ্ধ করতে। এই ভাবনায় ইসলাম তাঁর কাছে এসে পৌঁছল অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠে আসার একটি পদ্ধতি হিসেবে। ইহজগতের সব সমস্যা সমাধানের বৈতরণীরূপে। এইভাবে ইকবাল বললেন ফকরই হচ্ছে সব কল্যাণের ভিত্তি। যার প্রচ্ছায়ায় বর্ধিত হয় জিকর ও ফিকর। এর মানে খোদার প্রতি ভালবাসা ও সমীহ আমাদের অনুপ্রেরণা ও শক্তি যোগায়। কিন্তু সে ভালবাসার প্রকাশ ঘটে মানবিকতার পরিচর্যায়। চাই সাম্রাজ্যবাদ পিষ্ট অনাথ জাতিসমূহের মুক্তি, চাই ধনিক ও শোষকের ধ্বংস আর গরীব মানুষের কল্যাণ। এ-ই হচ্ছে ইকবালের ফকর।

ইকবাল মনে করেন যে, মানবনিয়তির এই ব্যাখ্যাই ইসলাম একদিন দিয়েছিলো। কিন্তু মানব সমাজ আজো তাকে নিজের মধ্যে রূপায়িত করতে পারেনি। তিনি দাবি করেন, মানবতার অগ্রগতি ও কল্যাণে এখনও ইসলামের কালজয়ী ভূমিকা নিস্পন্দ হয়ে যায়নি। বিশ্বমানবতার সার্বিক কল্যাণে ইসলামের নব অভ্যুত্থানের মধ্যে আজ তাই আর কোন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য নেই। সমস্ত মানবতা যেখানে আসন্ন রূপান্তরের প্রয়োজন অনুভব করছে-অনুভব করছে পুনর্গঠনের– সেখানে মানবতার এক পরীক্ষিত সত্যের পুনরুজ্জীবন ঘটানো সম্ভব। ইসলাম তার কাছে এখন আদর্শের প্রতিকৃতিতে দন্ডায়মান। ইকবালের নিজের ভাষায়–

The object of my Persian 'masnavis' is not to attempt an advocacy of Islam. My real purpose is to look for a better social order and to present a universally acceptable ideal (of life and action) before the world, but it is impossible for me, in this effort to outline this ideal to ignore the social system and values of Islam whose most important objective is to demolish all artificial and pernicious distinctions of caste, creed, colour and economic status..... I have selected the Islamic community as my starting point not because of any national or religious prejudice,but because it is the most practicable line of approach to the problem.

মনে রাখা দরকার, ইসলাম তাঁর কাছে প্রচলিত এক ধর্মের অবয়বে অস্তিত্ব লাভ করেনি। ইসলামী ইতিহাসও তাঁর কাছে মুসলমানের কীর্তি-কাহিনী সর্বস্ব এক পাষাণ প্রতিমা হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি। মানব কল্যাণের এক অভ্রান্ত ত্রাতা হিসাবে তিনি তার পরিবেশনা করেছেন–

এতেই রয়ে গেছে প্রাচী ও প্রতীচির
যতেক ভাগ্যের ভার
এ গূঢ় ভাবনার তড়িৎ ক্ষিপ্রতা
তাহলে বোঝো একবার। (অনুবাদ– শঙ্খ ঘোষ)

১৯০৮-এ এসে ইকবালের প্রবাস জীবনের সমাপ্তি হয়। দেশে ফিরে তিনি ঝুঁকে পড়েন অনেকটা তাত্ত্বিকতার গভীরে। প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাস ও জলতরঙ্গ শান্ত হয়ে আসে তাসাউফ ও ফালসাফার নির্মলিন সাধনার স্পর্শে। ইকবাল আরোহণ করেন মানব চৈতন্যের শিখর চূড়ায়; দেশ-কাল-পাত্রের উর্ধে এক অনাবিল জীবন ছন্দে লীলায়িত বৈচিত্র্যের অন্তর্দেশে।

Iqbal stands on a hill by himself. (Dr. R. A. Nicholson)

এখন থেকে ইকবাল আর জীবন শিল্পী নন, জীবনের গভীরে যে সত্য তার মর্ম উন্মোচনকারী। ইকবাল হলেন তার্জুমান-ই-হকীকত। মানবতার দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে তিনি মর্মের গভীরে নিয়ে অবলোকন করেন; তারপর চৈতন্যের উষ্ণতায় তিনি তাকে বন্দী করেন শব্দের কুঠরীতে।

শেক্সপিয়র সম্বন্ধে ইকবাল বলেছেন ঃ সত্যের দর্পণ সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের দর্পণ মানুষের মন, মানুষের মনের দর্পণ তোমার ভাষা।

ইকবাল সম্বন্ধেও কি একথা প্রযোজ্য নয়। কি গভীর সাধনার পথ ঘুরে, নানা দেশের বেদনার রঙ রঞ্জিত করে তাঁকে পৌছুতে হয় সেই দেশে যেখানে তিনি তৈরী করেন মানবতার নতুন তাজমহল–

Intellect founded a temple of idols in my head
But the Abraham of love turned the idol house into a Kaba.

এ যুগের তাঁর অধিকাংশ কবিতাই পারসিক ভাষায় লেখা। কিন্তু তার মধ্যে তিনি কিছু উর্দূ কবিতাও রচনা করেন। অবশ্য তাঁর প্রাথমিক যুগের উর্দূ রচনার সাথে এর ভিন্নতা লক্ষণীয়। 'মাযহাব' 'কুফর ও ইসলাম' 'তারানা-ই-মিল্লী' 'মুসলিম আওর তালিমী জাদীদ' 'শামা আওর শায়ের' 'খিযর-ই-রাহ' 'তুলু-ই-ইসলাম' 'শেকওয়া' 'জওয়াবে শেকওয়া' 'জওয়ানান-ই-ইসলাম' এসব কবিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

শেকওয়া ও জওয়াবে শেকওয়ায় বিশ্ব মুসলিম তার আপন মনের অনুরণন শুনেছে। কোটি কোটি মানুষের মর্মবেদনার সাথী হয়েছেন ইকবাল। কবির মধ্যে বিশ্ববিধাতার বাণীর উজ্জীবন এমন মহিমাময় হয়ে উঠেছে যে, তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবিদের জামাতে শামিল হয়েছেন। এ কবিতায় তিনি মুসলমানের দুর্দৈবকে সামনে রেখে বিশ্বস্রষ্টার কাছে অভিযোগ পেশ করেছেন। পাশাপাশি তৌহীদের নিশানবাহীদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন নবজীবনের পথ পরিক্রমায়– এ দুটো কবিতাকে অনেকে ইংরেজ কবি মিল্টনের Paradise Lost ও Paradise Regained-এর সাথে তুলনা করেন।

শেকওয়ায় কবি তীব্র ভাষায় খোদার কাছে নালিশ জানাচ্ছেন–

মুখর হয়েছে আকাশ হে খোদা যুগতব বন্দনাগীত রবে
এবার একটু বন্ধু তোমায় ভক্তজনের নিন্দা শুনিতে হবে
কত জাতি তুমি সৃষ্টি করেছ কত শত যুগ ধরে
শুনিতে কি পাই কে করেছে কিবা কোথায় তোমার তরে?
তোমার নামেতে ধরা তেগ্ তলোয়ার
সেতো আমরাই করেছি প্রথম, সেতো আমাদের একচেটে অধিকার।
তবে কেন আজ এই অপবাদ মোরা নই ওফাদার?
তাই যদি হয় তবে তো তুমিও নহ নহ দিলদার
বুলবুল কাঁদে, শুনিয়া রহিব নিশ্চুপ বিলকুল।

হায় খোদা শোন আমরা নহিত ফুল!
শুধু মরুভূমি নয়,
তোমার তরেতে করিনি সাগরেও কভু ভয়।
দুরন্ত অতলান্তিক ঢেউ একদা তুচ্ছ করে
ছুটায়েছি ঘোড়া, সে শুধু তোমার তরে।
চিরদিন তব প্রশংসাবাদ গাহিয়া এসেছি সবে
আজিকে একটু বন্ধু তোমায় নিন্দা শুনিতে হবে
তোমার বাণীরে ভুলেও যাহারা করেনি গ্রহণ কভু
ছড়ায়েছ তুমি সব কিছু তব তাহাদেরই তরে প্রভু,
শুধু আমাদের মাথায় করলে অসহ বজ্রপাত!
দুনিয়ার যত আরাম আয়াশ হুর-পরী জিন্নাত
নাসারারা পেল সব,
প্রতিশ্রুতিতে আমাদের শুধু করেছ তুমি নীরব।
এরপর হবে বদনাম দুনিয়ায় আর তৌহীদ রহিল না:
আমরাই যদি না থাকি বন্ধু বলো তোমার নাম লবে কোন জনা?
সাকী যদি না রহিল বসুধা পরে
জাম তবে শুধু রহিবে কেমন করে? (অনুবাদ– আবুল হোসেন)

জওয়াবে শিকওয়ায় খোদা বলছেন–

দানভান্ডার খোলাইত মোর: সে দান নেবার সায়েল কৈ?
কারে আমি বল পথ দেখাইব, পথ চলা সেই পথিক বৈ?
শিক্ষাত মোর সবার তরেই, কোথায় বল না ছাত্র তার?
যেই মাটি দিয়ে গড়ি আদমে, সেই মাটি কৈ পাচ্ছি আর।

....

হৃদয় তোমার ঈমানবিহীন, বাজু সে তোমার শক্তিহীন
তোমরা নবীর উম্মৎ? হায়! শরমে তাহার মুখ মলিন।
বুৎ ভাঙ্গা দল বিদায় নিয়েছে, বাকী যারা তারা গড়িছে বুৎ
ইব্রাহীমের ছেলেরা এখন আযর সেজেছে কী অদ্ভুত!

....

কওমের যারা ওয়ায়েজ, তারা ধার ধারে নাক' সুচিন্তার
বিদ্যুৎ সম তাদের কথায় হয় না এখন আছর আর
ফলসূফা আছে, প্রাণহীন পড়ে, আল গাজালীরে কোথায় পাই
মসজিদ আজি মার্সিয়া গায়– নামাযী নাহি ক তার ভিতর
হেজাযীরা ছিল যেমন– তেমন কোথায় মিলিবে ধরার পর।

....

খুবত কহিছ ঃ দুনিয়া হইতে বিদায় নিতেছে মুসলমান!
প্রশ্ন আমার ঃ মুসলিম কোথা? সে কি আজো আছে বিদ্যমান?
চলন তোমার খৃষ্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন
ইহুদীও আজি শরম পাইবে দেখতে তোমার এসব গুণ!
হতে পার তুমি সৈয়দ, মীর্জা, হতে পার সে তুমি আফগান,
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই ঃ বলত' তুমি কি মুসলমান। (অনুবাদ– গোলাম মোস্তফা)

এ সময় লেখা আর একটি বিখ্যাত কবিতা 'শামা আওর শায়ের' (প্রদীপ ও কবি) এখানে কবির সামাজিক ভূমিকা বিধৃত হয়েছে। কবিরা হলেন সমাজের দর্পণ। জীবনের সঙ্গে কবিদের যোগাযোগ কত গভীর, চার পাশের মানুষের উপর তাদের কবিতার প্রভাব কত ব্যাপক, তা তিনি নির্ণয় করেছেন। মূলত এ কবিতাটি কলা-কৈবল্যবাদীদের বিরুদ্ধে ইকবালের একান্ত অনুভব যেন রক্তিম আলোয় ঝলমলিয়ে উঠেছে। প্রদীপ বলছে কবিকে–

কাব্যকৃতি অপার্থিব ঐশিক প্রেরণা,
শোনাও মিল্লাতে বন্ধু, জীবনের বাণী উন্মাদনা।
প্রিয়ের দর্শন-আশে জাগ্রত কর হে, আঁখি তব,
অমরত্ব দাও প্রাণে কথার অমৃত ঢালি নব। (অনুবাদ– মনির উদ্দীন ইউসুফ)

'খিযর-ই-রাহ' কবিতায় জীবন, রাজত্ব, পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি কতকগুলি আধুনিক পৃথিবীর সমস্যার উপর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিবৃত করেছেন। 'তুলু-ই-ইসলাম' বাঙ্গ-ই-দারার শেষ কবিতা। এখানে কবি ইসলামের প্রতীকে মানব চরিত্র বিকাশের মহত্তর সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন–

'বাসন্তী মেঘ মুকুতা ফলায়'– মুসলমানের চোখের জল
ইব্রাহীমের নদীতে আবার জাগিবে উজ্বল মুক্তাদল।
আবার ঐশীবাণীর কেতাব নূতন করিয়া হতেছে গাঁথা,
হাশেমী শাখায় ঋতুর প্রভাবে আবার জাগিবে নতুন পাতা
লুটে নিয়ে আয় শিরাজী রূপসী তাব্রিজী প্রাণ কাবুলী দিল,
কুসুম সুবাস নিয়াছে লুটিয়া যেমন করিয়া মলয়ানিল।
উসমানীদের চারিদিক ঘিরে যদিও নেমেছে অন্ধরাত,
করিয়োনা খেদ, তারার শোণিতে উষার যে খোলে নয়নপাত।

(অনুবাদ– মনির উদ্দীন ইউসুফ)

পারসিক ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে ইকবালের জীবন ভাবনার মৃদঙ্গ; তাঁর অনুভূতি প্রবণ বিশ্ববীক্ষার মর্মানুকৃতি। বলা বাহুল্য, আসরার-ই-খূদী হচ্ছে তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এতে ইকবাল চেয়েছেন মানবতার এক ধরনের বিশ্বাসকেই বিবৃত করতে; যে বিশ্বাসের দীপাবলী সমস্ত পৃথিবীকেই জ্বালাবে। মানব সভ্যতার কথা বলতে তিনি তাদের চেতনার উৎসমুখগুলিকে ক্ষুরধার করতে চাইতেন। বছরের পর বছর ধরে পূর্ব দেশীয়রা দলিত হয়ে আসছে। আর নয় এ দলন-পীড়ন, সংহার। যেমন করে হোক তাদেরকে জাগতেই হবে। উজ্জীবিত হতে হবে প্রবল শক্তি মন্ত্রে। এ তুফান তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দূর মরু রুক্ষ পরিবেশে। আসরার-ই-খূদী হলো মানব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সমুন্নত আলোক যাত্রার কাফেলা। শক্তিমন্ত্রের কথা বলতে তিনি ফিরে যেতেন প্রাচীন ইসলামী ইতিহাসে, বেদুঈনের তাঁবুতে, পার্বত্য গহ্বরে, যেখানে একদিন শোনা গিয়েছিলো কারাঁভার ডাক; রৌদ্র প্রখর জীবনের প্রশ্বাস। মুসলমানের দৃষ্টিকে তিনি প্রজ্বলিত করেন সেই ইসলামীয় চেতনার বহ্নিতে–

ফিরে চলো তুমি আরবের কাছে
তুলেছ ইরানী বাগানে গোলাপ,
দেখেছ বসন্তের জোয়ার ইন্দোস্তানে ইরানে।
আস্বাদন করো এবার মরুভূমির তাপ,
পান করো পুরনো মদ খেজুরের।

বাসা বেঁধে রইবে কতদিন উদ্যানে?
বাঁধো নীড় উঁচু পর্বতে
বিদ্যুৎ এবং বজ্রের মাঝখানে।
ঈগলের নীড়ের চেয়েও উঁচুতে।
যোগ্যতা হোক তোমার জীবন যুদ্ধের,
শরীর আত্মায় জ্বলে উঠুক জীবনের আগুন। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

কিন্তু এ হলো সাধনার পথ। অনন্ত দুঃখ ও বেদনার মধ্য দিয়ে এর যাত্রা–

শিরীর রূপ ফুটবে ফরহাদের বেদনায়
শত হরিণের প্রাণের বিনিময়ে কস্তুরির সুবাস,
পতঙ্গের জন্মতো পুড়বারই জন্য
আলোর শিখা হলো এই দাহনের সার্থকতা;
এই শিখায় জ্বলবে শত ইব্রাহীম
শুধু একটি মোহাম্মদের চেরাগ ধরাবার জন্য। (অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)

রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে অবশেষে আসবে গৌরবদীপ্ত জীবন; সাধনা দীপ্ত প্রাখর্য। মানুষ তখন নিজের মধ্যে বিকাশ ঘটাবে অতিমানবিক জীবনানুভূতির–

সে খোদারই জন্য জাগে।
খোদার জন্যে ঘুমায়।
বৃদ্ধকে সে শোনায় নব যৌবনের গান
সব কিছুকে ভরে দেয় জীবনের প্রাচুর্যে,
মানুষের জন্যে সে বয়ে আনে আনন্দের বাণী,
কখনো বা তাকে করে সাবধান।
জীবনের সে অর্থ খোঁজে
স্বপ্নকে রাঙায় নতুন রঙে।
জীবন বীণার অশ্রু সংগীত
তার গোপন সত্তা হয় জীবনের রহস্য। (অনুবাদ– হাবীবুল্লাহ বাহার)

আসরারই-খূদী কাব্যে এই যে বিশ্বাসের আহ্বান, মুখরিত জীবনের অনুসরণ তা মুসলিম ঐতিহ্যের কল্পনায়, অনুশাসনে ও রূপকল্পে মিশ্রিত। তিনি মনে করতেন ইসলামী দর্পণেই বিশ্বাশ্রিত সত্যের মুখ দর্শন সম্ভব হয়ে উঠবে যদি তার সাথে মর্মের সত্যগুলিও অন্বিষ্ট হয়। আসরার-ই-খূদীর অনুবাদক নিকলসন বলেছেন–

A Free and independent Muslim fraternity, having the Kaba as its centre and knit together by love of Allah and devotion to the prophet—such is Iqbal's ideal.

কবির রমূযে বেখূদী হচ্ছে তাঁর খূদী চিন্তার সামাজিক রূপায়ণ। আসরারে তিনি ব্যক্তিত্বের জয়নিশান উড়িয়েছেন; রমূযে বিবৃত করেছেন খূদীর বিকাশে মিল্লাতের প্রয়োজনীয়তার কথা।

ইকবালের কবিতায় ঈগল (শাহীন) পাখীর উপমা বারে বারে এসেছে। দূর নীলিমায় শক্তির পাখায় ভর করে তার সঞ্চরণ। ব্যথা-বেদনার উর্ধে তাঁর জীবন। বাস তার রুক্ষ পরিবেশে। ঈগল

তার কাছে যৌবনের বীর্যের প্রতীক। হতাশ্বাসের সীমানা ছাড়িয়ে আশা-উদ্দীপনার এক প্রজ্বলন্ত ছবি–

আশা অমর। ধ্যান জ্ঞানের মৃত্যু হতাশায়;
মনের চাবিকাঠি খোদার মোমিন শুধু পায়।
তোমার নীড় নয় শাহের প্রাসাদ গম্বুজে,
শাহীন তুমি, বাঁধবে বাসা পাহাড় চূড়া খুঁজে।

(কোন যুবকের প্রতি, অনুবাদ– আবুল হোসেন)

ইকবালের 'পায়াম-ই-মাশরিক' গ্যাটের West Ostlicher Divan এর অনুসৃতিতে বিরচিত। গ্যাটে প্রতীচ্যের নিবীর্য আধ্যাত্মিকতায় বিলাপ করেছেন এবং প্রাচ্যকে আহবান করেছেন ভালবাসা ও ধর্মের বন্ধনে প্রতীচ্যের মরুরুক্ষ জমিতে সোনা ফলাতে। ইকবাল সাড়া দিয়েছেন সে ডাকে। পায়ামে মাশরিকে ইকবাল ইউরোপের চিত্রকে তুলে ধরেছেন মর্মের আলোর তীব্রতায়। এখানে ইকবাল নিজেকে গ্যাটের সঙ্গে তুলনা করেছেন–

গ্যাটে হলেন মুক্তপাখী– পুষ্পকুঞ্জে তার সঞ্চরণ
ইকবাল হলেন মরুগামী উটবাহিনীর ঘন্টাধ্বনি
জন্ম যার মৃতের দেশে।
গ্যাটে হলেন কোষমুক্ত অসি আর
ইকবাল হলেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার।

এরপরে ইকবাল লিখলেন যবূর-ই-আযম। সূফী কবি মাহমুদ শাবিস্ত্রীর মসনবী 'গুলশান-ই-রাজে'র অনুসরণে লেখা এ গ্রন্থে নৈরাজ্যে ঢাকা আধুনিক পৃথিবীকে তিনি পুনরায় মঙ্গল আলোয় জ্বালিয়ে দেখালেন। জাভিদনামায় এসে ইকবাল স্বপ্ন দেখলেন সেই পৃথিবীর যার সন্ধান করে ফিরেছেন তিনি আজীবন। এখানে কবি পর্যটক, ভ্রাম্যমাণ এবং অন্তরের পিয়াসী। মাটির পৃথিবী ছেড়ে তিনি যাত্রা করেছেন গ্রহান্তরে। তাঁর ভ্রমণ সঙ্গী রুমের পীর জালালুদ্দীন– যার উদ্দেশ্যে তিনিই একবার লিখেছিলেন–

Decorate the walls of the temple of your heart with the verses of Rumi
From the intoxicated eyes of Rumi I learnt to enjoy the
Glory of Divine grandeur.

(Armughan-i-Hijaz)

মুর্শিদ রুমী তাঁকে হাত ধরে নিয়ে চলেছেন নক্ষত্রের দেশে। জামালুদ্দীন আফগানীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে রুমী ইকবালকে নাম দিয়েছেন 'জিন্দা রুদ'– জীবন্ত নদী। জিন্দা রুদ সদা প্রবাহমান এবং এক সমাজের ভাবনায় আচ্ছন্ন যা এখনো দূরাগত কিন্তু অসম্ভব নয়–

যন্ত্র দানবের এমন জোর নেই করবে প্রকৃতিকে পালন
আকাশ সেই দেশে ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার নয়,
কেবলই খাটছে যে কৃষাণ, পাচ্ছে যে প্রদীপের আলো
তাদের নেই কোনো জমির মালিকের ভয়।
তাদের কৃষিকাজ সে নয় নিশিদিশি জলের চিন্তায় ম্লান
তাদের ফসলে তো অন্য কারো নেই হাত
সে দেশে কোনোখানে সৈন্য নেই কোনো, নেই-বা ব্যূহনির্মাণ

খুনে বা সংঘাতে তাদের জুটছেনা ভাত।
মিথ্যে লেখা আর মিথ্যে রটনার ছলে
মর্ঘদিনে কোনো লেখক মর্যাদা পান না
বাজারে বেকারেরা ভরেনা পথ কোলাহলে
কানের পীড়া নেই আর্ত ভিখিরির কান্নায়। (অনুবাদ– শঙ্খ ঘোষ)

এ কাব্যে শিশুপুত্র জাভিদকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন নক্ষত্র রাত্রির পুষ্পিত পথের ধারে। চির তারুণ্যের গান গাইয়ে হিসেবে। সাধক কবি পুত্রকে ডেকে বলছেন ঃ প্রতাপের পথ তোমার নয়; ধনিকের চকমকিতে প্রতীচ্যের যে রংমহল তাও একদিন অস্পষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং নিয়ত প্রসারী এ বিশ্বভুক সভ্যতা থেকেও সাবধান–

খুঁজে নাও তোমার স্থান প্রেমের রাজ্যে,
সৃষ্টি করো নূতন যুগ, নূতন প্রভাত, নূতন সন্ধ্যাগুলি।
ঈশ্বর যদি দিয়ে থাকেন তোমায় প্রকৃতিকে বোঝাবার চিত্ত
বিনিময় করো ট্যুলিপ গোলাপের নীরবতায় তোমার অন্তরঙ্গিতা।
আমার এ পথ নয় ধনীর, গরীব মানুষের পথ আমার;
বিকিয়োনা আপনকে গরিব হয়েই হোক তোমার নাম।
(অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

কবির বাল-ই-জিব্রীল প্রকাশ পাবার পর বোঝা গেল উর্দূকে তিনি ভোলেননি। দিগন্ত বিস্তারী কল্পনার চুমকুড়ি যেমনি দোল খেয়েছে এ কাব্যে তেমনি কবির পরিণত মনের সংস্কৃতিঋদ্ধ চেতনার আলো জলও ক্রীড়া করে ফিরেছে। 'কর্ডোভা মসজিদ', 'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' 'খোদার ফরমান'– এসব কবিতায় কাব্য রসিকেরা পেয়েছেন অপূর্ব সুস্বাদ। মানবাত্মার চিরন্তন জয়যাত্রার কাহিনী রক্ত আখরে ফুটে উঠেছে যেন শান বাঁধানো পাথরঘটায়।

'কর্ডোভা মসজিদ' কবিতায় ইকবাল ইতিহাস ও কাল সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 'কর্ডোভা মসজিদ' দর্শনে তাঁর অন্তরে যে অনুভূতি বাঙময় হয়ে উঠেছে, তিনি তা-ই বিবৃত করেছেন। দুর্জয় কালের করাল গ্রাসে মানুষের কত কীর্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এতদস্বত্তেও অগ্রসরমান কালের ধারায় উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতাকে পশ্চাতে ফেলে মানুষের অনেক তিতিক্ষা ও সাধনাও কালজয়ী আকার ধারণ করে। 'কর্ডোভা মসজিদ' এমনি এক মহৎ শিল্প যা মানবতার চিরদিনের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে প্রোজ্বল করেছে। মানবাত্মার অমরত্বের সঙ্গে শিল্পের চিরন্তনতার যে নিগূঢ় যোগাযোগ রয়েছে ইকবাল তার রহস্য উদঘাটন করেছেন–

সেই তসবির যার বুকে ছাপ রেখেছে সময় চিরন্তন,
শেষ রেখা যার এঁকেছে মুমিন–মর্দে খোদা যে, খোদার জন,
প্রেমের পরশে মহীয়ান তার কর্মের ধারা অবিশ্রাম,
প্রেমের উৎস সত্য জীবন মরণ যে তার হল হারাম।
দ্রুত ধাবমান আর চঞ্চল যদিও কালের অমিতবেগ
বন্যা বিপুল এই প্রেম ধারা, পারে সে থামাতে বন্যাবেগ।

প্রেম থেকে জানি আস্তি তোমার ওগো মসজিদ কর্ডোভার,
ক্ষয় নাই যার, নাইতো বিলয়, অতীত অথবা অধুনা আর।

হোক তসবির অথবা পাথর, বেনুকার সুর অথবা গান
হৃদয় রক্ত কণায় শিল্প হয় জীবন্ত হৃদি সমান।
শিলাকে যে করে জিন্দা দিল, সে জিগরের তাজা কাতরা খুন
হৃদয় রক্তে জাগে অসহন, বেদনা দহন, সুর আগুন
হৃদয়-জাগানো প্রেরণা তোমার, হৃদয় জ্বালানো আমার গান,
তুমি শুধু ডাকো আমি খুলে যাই সকল হৃদয় তিমির ম্লান।

(অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

'আদমের প্রতি পৃথিবীর আত্মার অভিনন্দন' কবিতায় পৃথিবী আদমকে সম্বোধন করে বলছে ঃ কালের অবিশ্রান্ত ধারায় সেতার শিল্পীরূপকে উন্মোচন করুক, তার অবস্থানকে সে খুঁজে নিক সবার মধ্যে। সে বিশ্বস্রষ্টার প্রতিনিধি এবং দুনিয়ার যাবতীয় পরিবর্তন, সংগঠন ও কল্যাণের নিয়ামক– এই তার প্রকৃত ছবি–

যে সূর্যে প্রদীপ্ত বিশ্ব– সে তোমার স্ফুলিঙ্গ দহন,
তোমার শিল্পের মাঝে সম্মোহিত আছে এক
সুসম্পূর্ণ পৃথিবী নূতন।–
অর্জিত নহে যা শ্রমে– সে জান্নাত অসুন্দর দৃষ্টিতে তোমার,
তোমার বেহেশ্‌ত জানি হৃদিরক্তে সংগোপন (অশ্রান্ত আশার)।
মৃত্তিকার প্রতিকৃতি দেখ এ শ্রমের ফল
সংগ্রামের পথে দুর্নিবার। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

'খোদার ফরমান' কবিতায় বিশ্বস্রষ্টা, লেনিনের প্রার্থনার জওয়াবে ফেরেশতাদের দুনিয়ায় এসে সকল জুলুম ও বেইনসাফীর অবসান ঘটাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। কবির বিশ্বাস, মানুষ তার মহতী ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার আগেই দুনিয়া থেকে সকল বেইনসাফীর মূলোৎপাটন ঘটবে। ইকবাল সেই প্রকান্ড বিশ্বাসের দাবদাহনে সকলকে জ্বালাতে চেয়েছেন, যার ফলে দুর্বল চড়ুইও আকাশে উড়ে গিয়ে বাজের রক্তচক্ষু থামিয়ে দেয়; গোলামের চিত্তে প্রজ্বলিত হয় ঈমানের কণিকা।

তপ্ত করো রক্ত দাসদের, বিশ্বাসের আগুন
দুর্বল চড়ুইকে প্রবৃত্ত করো লড়তে ঈগলের সঙ্গে।

(অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ ইকবালকে পীড়িত করেছিল, তাঁর মর্মবেদনা রক্তাপ্লুত হয়ে জেগে উঠলো 'পস চেহ্ বায়াদ করদ আয় আকওয়ামে শারকে'র ব্যঞ্জনায়। ইকবালের প্রতি মুর্শিদ রুমীর সবক বর্ণায়নের মধ্যে দীপ্তিমান ও জ্বালাধর্মী এক বিশ্বাসের আবহ নির্মিত হলো এ কাব্যে।

প্রথম অনুচ্ছেদে রুমী ইকবালকে বলছেন, প্রাচ্যের জাতিসমূহ যাতে ইউরোপীয় শৃঙ্খল মুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে পারে তার জন্য তুমি তাদেরকে তৌহীদের সুরা পরিবেশন করো। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রুমী ইকবালকে নির্দেশ দিচ্ছেন, সে যেন কোনক্রমেই দুনিয়া পূজকদের ইশকের মর্মবীণায় উজ্জীবিত না করে; কেননা তারা এর নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে রুমী ইকবালকে পরামর্শ দিচ্ছেন, যারা আযাদীর খুনে রাঙা হতে চায় তাদেরকে দ্বীন ও সিয়াসতের মর্ম অনুধাবন করাতে এবং চতুর্থ ও শেষ পরিচ্ছেদে রুমী মুমিনের হাকীকত বিশ্লেষণ পূর্বক প্রকৃত মুমিনের চিত্র পেশ করেছেন এই বলে, সে কেবল পরের হিতের কারণেই স্বীয় জীবনকে নির্বাহ করে।

যরবে কলীমে ইকবাল আবার হাতে তুললেন অফুরন্ত তুন। এখানে তিনি এক সৈনিক; বর্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে উদ্ধত তাঁর অস্ত্র।

তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত আরমুগান-ই-হিজায এক অপূর্ব সৃষ্টি। উর্দূ ও ফার্সী কবিতার মধুর সমাহার ঘটেছে এতে। অন্যতম কবিতা 'ইবলিস কি মজলিসে শূরার' দৈবাৎ যদি কেউ পড়ে, মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। আশ্চর্য মনোগ্রাহী ভাষায় কবিতাটিতে ছন্দবদ্ধ কথোপকথনের ছলে বর্তমান পৃথিবীর ধনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মীয় উগ্রতা প্রভৃতি বিপদের সূক্ষ্ম আলোচনা আছে। সবার উপরে মহিমান্বিত এক মানব ধর্মের নিশান। ইসলাম ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে সামনে রেখে এ কবিতার কাঠামো গঠিত হলেও সকলের প্রবেশাধিকারই ন্যায়ত সম্ভব এবং সকলের জন্য তা অবাধ গ্রহণযোগ্য। আদর্শ ও শুভ্রতার প্রতীকে লোভহীন, মঙ্গলময় ও সূচিতার নির্মাল্য দিয়ে ত্যাগভূষিত ইসলামের যে মহামানবিক চিত্র ইকবাল পেশ করেছেন তা সত্যিই অভিনব। শয়তানের কাছে পাওয়া আফিমে গরীবরা হয়েছে যে অদৃষ্টবাদী, মোল্লারা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের গোলাম, ইউরোপ দাঁড়িয়েছে খোদার বিপক্ষে– এই আফিমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ইকবাল এক শুদ্ধ সুন্দর মানবীয় ইসলামের কথা বলেছেন, ধনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছেন তিনি; তিনিই স্বগতোক্তি করেছেন ইউরোপীয় গণতন্ত্রের বাহিরটা চকচকে; কিন্তু অন্তর চেঙ্গিস খানের চেয়েও অন্ধকার; মার্কসবাদ ধনিক সভ্যতার নিরাময় কিন্তু পরম সিদ্ধি নয়। কারণ, তার সাথে যুক্ত নয় ধর্ম; খোদাবোধের প্রশ্রয় নেই এখানে। আমাদের প্রাণের যে বহ্নি তা জ্বালিয়ে রাখতে পারে কেবল এই মানবধর্ম ইসলাম। আমাদের মানববোধকেও ইসলাম ঋদ্ধ ও পরিপূর্ণ করতে পারে।

এইভাবে কবি পৌঁছে যান এক দিগন্ত দৃষ্টিময় বালুকাবেলায়। তাঁর কবিতার মধুর ভঙ্গি কিংবা উজ্জ্বল মাধুর্য আমাদের নিয়ে যায় গভীর ভাবনার দেশে। তিনি অতিক্রম করে যান কবিতার ভাষাকে; এমনকি স্থানের গন্ডিকেও। তিনি দাগ কাটেন এমন এক মৃত্তিকায় যার হৃদয়বিক পরিচয়টাই বড়। এখানে তিনি সর্বমানবিকতার রৌদ্রধূলির কত কাছাকাছি।

বিভেদাক্রান্ত মানবতার শরীরে তিনি হৃদয়শীল সৌন্দর্য ও শ্যামল সৌরভকুঞ্জের মনোরম বীথিকার প্রচ্ছায়া নিয়ে আসেন। মানুষের প্রেম যেখানে পরাভূত হিংসার কাছে, লোভ যেখানে দল মেলেছে মানবতার ফুল্ল আননে, বিবেক হোঁচট খেয়েছে রিপুর কামড়ে; ইকবাল সেখানে চিরন্তন মানুষের মাঙ্গল্য বর্ণনা করেন। শয়তানী কারসাজির সামনে ইকবালের কাব্য হয়ে দাঁড়ায় ভালবাসার এক নির্জলা প্রতিবেদন। মানব কল্যাণের পথ বেয়ে তিনি পৌঁছে যান সম্প্রীতির শিখর চূড়ায়। একটি ছোটো কবিতা উদ্ধৃত করছি। মানবতার অম্লান রাগিনীই ধ্বনিত হয়েছে এখানে–

এই সিতারার শেষে জাহান আছে আরো
প্রেমের পথে ঝঞ্ঝা তুফান আছে আরো ।।
শূন্যতা মোর শূন্য নহে প্রাণ পরশে,
এই কাফেলায় দল অফুরান আছে আরো ।।
গন্ধ রঙে-রঙিন ধরায় আজ থেমোনা,
নীড়ের স্বপ্ন, ছায়া বিতান আছে আরো ।।
উর্ধচারী শাহীন তুমি নভঃগামী।
আকাশ পারে আকাশ খিলান আছে আরো ।।
শেষ হল আজ একলা থাকার ক্লান্ত দিন,
এই পথে মোর সন্ধানী প্রাণ আছে আরো ।। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

অনাগত মানব সমাজকে তিনি একটি ভ্রাতৃসমাজে রূপ দিতে চেয়েছেন। একটি একক পরিবারে সংহত হবার নৈতিক উপাদান যুগিয়েছে তাঁর কবিতা। সকলের নিত্য অভ্যাসকৃত্যের বাইরে গড়েছেন তিনি এক মানবধর্ম। তাঁর কাব্যতরী এসে ভিড়েছে দূরদিগন্ত রেখার কাছাকাছি– সুদূরবর্তী রহস্যের অতলস্পর্শে। মহাজীবনের পটভূমিতে এক নিঃসীম নিলীমা যেন গলে পড়ছে।

ইকবাল ও বাঙ্গালী মুসলমান

ইকবাল অমর। দেশ, কাল, পাত্রের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর সৃষ্টিকাব্যের অন্তর্গত বাণী বিশ্বমানবের হৃদয়ে এক তুমুল আশা ও আরজুর জন্ম দিয়েছে। ইকবাল কাব্যের সার্বজনীন আবেদন মানুষের চিরায়ত স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষাকেই শুধু জাগ্রত করেনি, দুনিয়ার পিছিয়ে পড়া মানুষের নির্জিত হৃদয়েও প্রচণ্ড আলোড়ন তুলেছে। ধূলায় পতিত মানুষের হাত ধরে তিনি যেমনি তাকে তুলে এনেছেন নক্ষত্রের কাছাকাছি তেমনি জড় পৃথিবীর হলুদ বিবর্ণ চোখে এঁকে দিয়েছেন সামুদ্রিক স্বপ্ন।

দ্রষ্টা, চারণ, দিশারী, স্বাপ্নিক, কবি, দার্শনিক এবং সর্বোপরি এক সূফী ব্যক্তিত্ব– এই হলো ইকবালের পরিচিতি।

জীবনের জরাগ্রস্ত কোলাহল এবং পঙ্কিলতার মিছিলের উর্ধে এক মৃত্যুঞ্জয় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। নিজের সম্পর্কে ইকবাল বলেছেন–

> আমার পরে তারা আমার কবিতা পড়বে, হৃদয়ঙ্গম করবে এবং বলবে ঃ
> নিজের খুদীকে জেনেছিল যে মানুষ
> পৃথিবীতে সে বিপ্লব এনে দিয়ে গেছে

একজন মহৎ মানবতাবাদী কবি হিসেবে যেমনি রয়েছে তার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি তেমনি ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে তিনি সমান গৌরবের অধিকারী। অধ্যাপক উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ তার মডার্ন ইসলাম ইন ইণ্ডিয়া গ্রন্থে ইকবালকে শতাব্দীর প্রখ্যাততম মুসলিম কবি ও চিন্তাবিদ হিসেবে সম্মানিত করে বলেছেন ঃ বিশ্বব্যাপী তিনি যে মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন তা থেকেই উপলব্ধি হবে তার মহত্ত্বের বিশালতা।

উনবিংশ শতাব্দী ছিল মুসলিম ভারতের ঘোর দুর্দিন। পলাশীর বিপর্যয় যে অন্ধকার অমানিশার সূচনা করেছিল, বৈদেশী ইংরেজ ও তার এ দেশীয় উচ্ছিষ্টভোজীদের কুটিল ষড়যন্ত্র ও হৃদয়হীন নির্যাতনের মুখে তাদের সে দুর্দৈব বহুগুণে বর্ধিত হয়েছিল। হিমালয়ান উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য এ ছিল এক রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও তামুদ্দুনিক নিরাপত্তাহীনতার কাল। কওমের এমনি জিল্লতি ও অচলায়তনের মধ্যে কবি ইকবালের জন্ম। পরাধীনতার শিকলে আটকে পড়া দেশবাসীর বুকফাটা ক্রন্দন তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি এগিয়ে এসেছিলেন, হতাশ, পীড়িত, ব্যথিত মানুষের জীবনে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ করতে ঃ

> ওঠো, জাগো, হে দুঃস্থজন
> পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি তুমি।
> জগৎটাকে কাঁপিয়ে তোলো।
> শক্তিমানের প্রাসাদের দেওয়াল– জানালা টেনে নামাও।
> যে শস্যক্ষেত্র ক্ষুধার্তের আহার যোগায় না
> জ্বালিয়ে দাও তার প্রত্যেকটি ধানের শীষ।

বছরের পর বছর ধরে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ জাতি এ আলোর ঝলকানিতে চমকে উঠলো।

ইকবালের এ বাণী নিরাশার আঁধারে ঘূর্ণায়মান জনতার কাছে অভিনব মনে হলো। তুরখাম থেকে আরাকান পর্যন্ত বিশাল এই হিমালয়ান উপমহাদেশে ইকবাল অভিনন্দিত হলেন গণমানুষের কবি হিসেবে। জনতার ভাষায় তিনি কবিতা লিখলেন। জনতার ভাবনা ও বেদনাকে তিনি কবিতায় স্থান দিলেন এবং সেই জনতার হাত ধরে মুক্তির মনজিলে পৌছানোর স্বপ্ন তিনি দেখলেন।

ইকবালের সাথে বাঙ্গালী মুসলমানের পরিচয় হয়েছিল ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় ও কালের প্রেক্ষাপটে। এ পরিচয়ের পেছনে ইকবাল কাব্যের আন্তর্জাতিক আবেদন হয়ত একটি বিশেষ কার্যকরণ হিসেবে কাজ করেছিল, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য ছিল ইকবাল কাব্যের অন্তর্গত বাণী বাঙ্গালী মুসলমানের হৃদয়ে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারা এ কাব্যে তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহ্যিক প্রেরণার একটি স্বচ্ছতোয়া ঝর্ণাধারাও খুঁজে পেয়েছিল।

বৈরী ইংরেজ শাসনের দানবীয় দাপট ও ঝঞ্ঝা মূলত বাঙ্গালী মুসলমানদের উপরই প্রবাহিত হয়েছিল বেশী। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াফতকরণ এবং রাজভাষার নির্বাসন এগুলো ছিল এ অঞ্চলের মুসলিম জনতাকে পঙ্গু করে দেয়ার সুদূরপ্রসারী বৃটিশ চক্রান্ত। ফিরিঙ্গি বেনিয়ারা বাঙ্গালী মুসলমানদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদে ধস নামিয়ে সেখানে সৃষ্টি করেছিল নতুন হিন্দু ভূস্বামী ও মধ্যস্বত্বভোগীর দল। বাংলার বিখ্যাত মসলিন শিল্পকে জেনে শুনে ধ্বংস করা হয়েছিল এ জন্যই যে, ওটা ছিল মুসলমানদের পরম গর্বের বস্তু। আর অন্যদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নব্য হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী বৃটিশের সাথে হাত মিলিয়েছিল এদেশের জাতীয় সাহিত্যকে সমূলে ধ্বংস করবার জন্য। এমনি দুর্যোগ ও প্রতিকূল পরিবেশেও বাঙ্গালী মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস ও মূল্যবোধে ভাঙন ধরতে দেননি। বরং তাদের সে বিশ্বাসী আগুন দাবানল হয়ে জ্বলে উঠেছে কখনো বা ফারায়েজী আন্দোলনের আকারে কখনো বা তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা অথবা ফকীর বিদ্রোহের রূপ ধরে।

এরপরে এলেন ইকবাল। পিছিয়ে পড়া বাঙ্গালী মুসলমানদের হতাশ অন্তরে তিনি নতুন করে আশার সঞ্চার করলেন। মুসলমানদের নিয়ে সাহিত্য রচনা করবার জন্য অন্য একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের সাহিত্যিকদের কাছে যখন অনুরোধ করতে হতো সেই অন্ধকার যুগে মুসলিম বাংলার কবি-লেখকদের চোখে ইকবাল মনজিল মকসুদের দিকনির্দেশ করলেন। একটি স্বতন্ত্র জীবন দর্শনের অধিকারী মুসলিম জাতিকে এগিয়ে যাওয়ার তাগিদ দিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহনের পথ ঘুরে রবীন্দ্রনাথ যেমন করে এসেছিলেন বেদের মন্ত্র নিয়ে। তেমনি হালি-গালিবের দেখানো পথ দিয়ে ইকবাল এসেছিলেন বিপর্যস্ত মুসলমানদের ভাষা জোগাতে।

ইকবালের কাব্যভাষার সাথে বাঙ্গালী মুসলমানদের পরিচয় যেমনি ছিলনা তেমনি ছিল ভৌগোলিক দূরত্ব। কিন্তু ইসলামের যে শাশ্বত বাণী দেশ-কাল ও ভাষার উর্ধ্বে বিশ্বাসী মানুষের মনোবলকে "সীসা ঢালা প্রাচীরের" মত দৃঢ় করেছে সেখানে ইকবাল ছিলেন আমাদের অতি নিকটের জন। কোরআনুল হাকিম ছিল ইকবাল কাব্যের পটভূমি। ইসলামকে তিনি একটি গতিহীন ধর্মের কতকগুলো সূত্র সর্বস্ব ব্যবস্থাপত্র মনে করতেন না। তার কাছে ইসলাম ছিল প্রাণ প্রাচুর্যপূর্ণ বলিষ্ঠ জীবনের প্রতীক। নিবিষ্ট মনে তিনি কোরআন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁর এ প্রতীতি জন্মেছিল, কোরআনী আদর্শের সুষ্ঠু অনুসরণ ও অনুশীলনই বিপর্যস্ত মুসলিম প্রাণে নয়া

জিন্দেগীর হিল্লোল সৃষ্টি করতে পারে। এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

In times of crisis in their history it is not Muslims that saved Islam on the Contrary it is Islam that saved Muslims.

এই বিশ্বাসী প্রাণের আগুন ইকবাল কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র কাঠামো বিনির্মাণে রসদ যুগিয়েছে। মুসলমানের বিপর্যয় ও হতোদ্যমে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তার ক্ষোভ দাবানল হয়ে জ্বলে উঠেছে। কিন্তু তিনি হতাশ হননি। দ্রষ্টা ও দিশারীর মত তিনি তাদের পথনির্দেশ করেছেন। তাদের পতন ও পরাজয়ের কার্যকারণগুলো দরদী মানুষের মত খুঁজে বের করে মরিচা ধরা এ জাতির প্রাণে আঘাত করেছেন–

কবর বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসা করলো–
আমিতো অন্ধকারে ছিলাম এবং থাকতামও:
কি আপদ! আমি আরও গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম কি করে?
আমার বক্ষ কন্দরে এ অসহ্য পূতিগন্ধ কিসের?
নীরব গুঞ্জনে ফিরিশতাদের বিষণ্ন জবাব এলো–
আজ তোমার অভ্যন্তরে একটা দাসের শব গচ্ছিত হয়েছে।

ইকবালের এ প্রাণ উন্মাদনকারী গতিধর্মিতা মুসলিম বাংলার প্রাণে জ্বালা ধরিয়ে দিল। তখন আযাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবী হয়ে উঠেছে সোচ্চার। মুসলিম বাংলার সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণা ও স্বকীয় চিন্তার বিকাশের এমনি উন্মুখর দিনগুলোতে ইকবালের প্রয়োজন হয়েছে তাই সঙ্গতভাবে অনেক বেশী। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকে ইকবাল যেমনি বুঝতে পেরেছিলেন উপমহাদেশের মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্য তাদের স্বাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, তেমনি ইসলামী জীবন দর্শনের সাথে তাঁর অন্তরংগ পরিচিতি তাঁর মধ্যে এ প্রতীতি জন্মিয়েছিল যে, মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ও মূল্যবোধের হেফাজতের জন্যও তাদের এক নিজস্ব আবাসভূমি দরকার। ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে মুসলমানদের সকল কালাকানুন আচরিত হতে পারে– এমন একটি কল্যাণরাষ্ট্রের বৈপ্লবিক ঘোষণা ইকবাল ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে পেশ করেছিলেন। ইকবালের এ ঘোষণা কোন কল্পনাপ্রসূত উক্তি ছিলনা। এ ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস ও উপলব্ধির উচ্চারণ। এলাহাবাদের এ বৈপ্লবিক ঘোষণা দেশজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং বুদ্ধিজীবী-জনতা এর বাস্তবতার অনস্বীকার্যতা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মুসলিম ভারতের স্বকীয় চিন্তা-ভাবনার বিকাশে ইকবালের এ অনন্য অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন বৃটেনের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও পণ্ডিত অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়ামস–

"ইকবাল নিজের অফুরন্ত উদ্যম ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তাঁর ব্যাখ্যাত গতিধর্মী ইসলামই হলো তাদের উত্তরণের একমাত্র পন্থা। এতেই নিহিত রয়েছে তাদের আত্মবিকাশের নির্ভুল উপায়। আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয় যে, ইকবালের জীবন ও কর্মধারার এই বিশেষ দিকটি অনেকখানি অপ্রকাশই রয়ে গেছে যে, যদিও একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি তখনকার হাল-হকীকতের প্রতি অসন্তোষ পোষণ করে গেছেন। তবুও প্রায় একজন ঋষির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি মুসলিম সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ভুলভাবে অবলোকন করতে পেরেছিলেন।"

ইকবাল নির্দেশিত এ কর্মপন্থার স্বরূপ কি ছিল? ১৯৩১ সালে কায়েদে আযমের কাছে লেখা এক

চিঠিতে ইকবাল এর দিকনির্দেশ করেছিলেন এমনিভাবে–

"ইসলামী আইন বহুদিন ধরে এবং পরম অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যদি এই কানুন-পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম ও কার্যকর করা হয় তবে প্রত্যেকের জন্য অন্ততপক্ষে জীবন যাপনের অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হবে। কিন্তু স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রাবলীর পত্তন ব্যতীত এদেশে ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগ ও বিকাশ সাধন কিছুতেই সম্ভব হবে না।"

বলা আবশ্যক, জাতীয়তাবাদী কায়েদে আযমের অন্তরে ইকবালই এ বিশ্বাস জন্মিয়েছিলেন, মুসলমানদের জন্য তাদের শরীয়ত আচরিত হওয়ার মত আবাসভূমি প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদ অথবা কংগ্রেসী সমন্বয়বাদের পথ ধরে মুসলমানদের মুক্তি আসতে পারেনা। উল্লেখ্য, এই বিশিষ্ট চিন্তার পথ ধরেই পরবর্তীকালে কায়েদে আযম মুসলিম ভারতের নেতৃপদ গ্রহণ করেন এবং মজলুম মুসলমানদের প্রাণের দাবীকে স্পষ্ট করে তোলেন, যার পূর্ণ পরিণতরূপ ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে জনস্বীকৃতি অর্জন করে। এ সময়ে ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার পুত্রকে কায়েদে আযম যে চিঠি লিখেন তার একাংশ–

আমার কাছে তিনি বন্ধু, নেতা ও দার্শনিক গুরুর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। মুসলিম লীগের চরম সংকটকালে তিনি পর্বতের মতো অটল থেকে তাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কখনো এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি সংকল্পচ্যুত হননি।

এই সংকল্প দৃঢ় মহান দার্শনিক কবি কায়েদে আযমের আদর্শিক পরামর্শদাতা হিসেবে নয়, মুসলিম ভারতের জেগে ওঠা জাগ্রত জনতার ফেনিল উত্তাল আযাদী আন্দোলনের প্রাণশক্তি হিসেবেও কাজ করেছিলেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব পেশের পর যখন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠলো ঠিক তার পাশাপাশি স্বকীয় সাংস্কৃতিক বাতাবরণ প্রতিষ্ঠার কথাও শোনা গেল। সংস্কৃতি যেহেতু জাতির মনন ও চিন্তার বিকাশের বাহন এবং সংস্কৃতিই যেহেতু জাতির আভ্যন্তরীণ পরিপুষ্টি ও নিজস্ব স্বকীয়তার নির্দেশক, তাই স্বাভাবিকভাবেই সেদিন মুসলমানদের সংস্কৃতির নতুন রাজপথ নির্মাণের তাগিদ এলো। সংস্কৃতির আপন ভুবন নির্মাণের এ পটভূমিতে মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে এলেন। এদিকে রাজনীতিবিদরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীর সাথে সাথে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির আওয়াজও সোচ্চার করে তুললেন। মুসলিম বাংলার প্রাণে এ আওয়াজ রেনেসাঁর নবকল্লোল নিয়ে হাজির হয়েছিল। এ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা শুধু এর রাজনৈতিক ও বহিরাংগিক আবেদনকেই গ্রহণ করলেন না। মুসলমানদের হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ভান্ডারও মেলে ধরলেন তারা। এ দীর্ঘ ঐতিহ্যের ধারা যেমন মুসলমানদের দিয়েছিল একটি স্বতন্ত্র চারিত্র্য, তেমনি তাদের আদর্শের নবরূপায়ণে এ ঐতিহ্যিক প্রেরণা আলোক স্তম্ভের কাজ করেছিল। শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে নিজস্ব আঙ্গিক ও প্রকরণ ফুটিয়ে তোলবার জন্য তারা ঐতিহ্যের মাল-মশলাকে কাজে লাগালেন।

স্মর্তব্য, মুসলিম পুনরুজ্জীবনের এ স্বপ্ন, তাদের উপমহাদেশে বিভিন্ন সময় জেগে ওঠা ইসলামী আন্দোলনের যে প্রবহমান ধারা তারই এক বিচ্ছুরণ। শেখ আহমদ সরহিন্দী ও শাহ ওয়ালী উল্লাহর সংস্কার আন্দোলন এবং বালাকোট, সিত্তানা, মুলকা ও নারকেলবাড়ীয়ার রক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে আন্দোলনের এ অবিরাম ধারা পরিবর্তিতভাবে হলেও এ শতকের আলীগড় আন্দোলন,

খিলাফত আন্দোলন এবং শেষতক আযাদী আন্দোলনের মধ্যে এর একটি আনন্দোজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছিল। বিশ শতকে আল্লামা ইকবাল ইসলামী জীবন বিধানের আলোকে যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তার পুনর্গঠন প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন, তা-ই দাবানল হয়ে জ্বলে উঠেছিল জাতির স্বকীয় সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের পথ ধরে।

আধুনিককালে ইসলামের অনিবার্যতা ও পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার মোকাবিলায় ইসলামের শাশ্বত বিধানের উৎকর্ষ ইকবালের কলমেই বলিষ্ঠভাবে ফুটে উঠেছে। বর্তমানকালে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা যে মোটেই ফুরিয়ে যায়নি, উপরন্তু নৈতিকতাহীন পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থা যে ভঙ্গুর শাখায় নীড় নির্মাণের মধ্য দিয়ে মানবতার অকল্যাণকেই এগিয়ে নিয়ে আসছে, তার প্রতিরোধে ইকবাল ইসলামের শাশ্বত গতিশীল বিধানকেই পেশ করেছেন। ইকবালের এ অকুতোভয় গতিশীল বলিষ্ঠতা পরাধীন মুসলিম ভারতের হীনমন্যতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ঠিক এমনি করে বাংলাদেশের কবি, লেখক, বিদ্বত সমাজেও ইকবাল আত্মবিশ্বাসের চারা রোপণ করেছেন এবং ক্রমে ক্রমে এ চারাই ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে এর আগে মীর মশারফ হোসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি মোজাম্মেল হক স্বীয় সমাজ ও জাতির জাগরণ কামনায় কলম ধরেছেন। শেখ আবদুর রহীম, রিয়াজুদ্দীন মাশহাদীর মত সাধক পুরুষেরা স্বকীয় সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, এর পরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বিদ্যুৎ ঝলকে বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রাণের কথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির প্রয়াসও পেয়েছেন। এ সমস্ত প্রচেষ্টাই বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনে নতুন কর্মোদ্যম ও জীবনপ্রবাহের জন্ম দিয়েছে সত্য এবং এর মধ্যে তাদের দরদ ভালবাসার ছাপ যেমন রয়েছে তেমন রয়েছে ঐতিহ্য-প্রীতির লক্ষণ। কিন্তু ইকবাল কাব্যে এসবের অতিরিক্ত যেসব বৈশিষ্ট্য সবার আগে আমাদের চোখে পড়ে তা হলো তাঁর বিশ্বাসের উন্মুখরতা এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। উপমহাদেশীয় আযাদী আন্দোলনের পটভূমিতে বাংলাদেশের মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা ইকবাল কাব্যের এ অনুরণনে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। রেনেসাঁ যুগের অন্যতম কবি সৈয়দ আলী আহসান সে সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন এমনিভাবে–

'ইকবালের সংগে আমাদের পরিচয় অনেক পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুর্কীর খেলাফত যখন আর নেই, যখন বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের স্বপ্ন অস্পষ্ট হয়েছে তখন নজরুল ইসলাম আমাদের প্রাণে উন্মাদনা আনলেন উদ্ভব যুগের ইসলামের কাহিনী স্মরণ করে এবং সংগে সংগে আমাদের স্থবির শান্ত মনে প্রচণ্ড আঘাত করে। নজরুল ইসলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙ্গালী মুসলমান যখন আপন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে তখন ইকবালের 'শেকোয়া'র সংগে আমাদের পরিচয় হয়। নজরুলকে পথিকৃত মেনে আশরাফ আলী খান আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন আমাদের জীবনের বিপর্যয় ও স্বস্তিহীনতার জন্য এবং সত্যাদর্শের অভাবের জন্যও। শেকোয়ায় তিনি আপন মনের অনুরণন শুনলেন। কাব্য হিসেবে শেকোয়ার মূল্য যতই লঘু হোকনা কেন, এর অভিযোগ আমাদের অনুভূতিতে শিহরণ তুলেছিল। নজরুলকে ভাল লেগেছিলো; ইকবালকে আরো ভালো লাগলো। নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ কিন্তু সে দীপ্তির দাহন আছে– স্নিগ্ধতা নেই, ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সংগে তার অসদ্ভাব নেই, তাই মূলত তা প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।' (ইকবালের কবিতার ভূমিকা, সৈয়দ আলী আহসান, ১৯৫২)

বলা আবশ্যক, কবি আশরাফ আলী খান বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের আগ্রহে শেকোয়ার অনুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ইকবালের সোচ্চার মানবিক কণ্ঠ কবি আশরাফ আলীকে নাড়া দিয়েছিল। দারিদ্র্যের তীর-তীব্র জ্বালা ও শোষিত মানুষের মনোবেদনা তার কাব্যের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু এবং ইকবালের মতোই এ সামাজিক বৈষম্যের অপনোদনে তিনিও শোষণহীন ইসলামী সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছেন। কবি আশরাফ আলীকৃত শেকোয়ার অনুবাদ এতই উচ্ছ্বাসময় ও প্রবহমান যে, এটি ফিটজেরাল্ডকৃত উমর খৈয়ামের অনুবাদের সাথেই একমাত্র তুলনীয়।

যা হোক, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব পেশের পর এর বিপ্লবী বাণীকে কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা মুসলিম সমাজ জীবনে ছড়িয়ে দেয়ার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইকবালের ধ্যান-ধারণার আলোকে নিজস্ব চিন্তার ভুবনকে সজ্জিত করতে শুরু করেন।

১৯৪২ সালে কলকাতায় দৈনিক আজাদ অফিসকে ঘিরে **পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি** গড়ে উঠে। এ সোসাইটির কাণ্ডারী ছিলেন মরহুম মুজীবুর রহমান খাঁ। এর সাথে যারা জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন, হাবীবুল্লাহ বাহার, সৈয়দ সাদেকুর রহমান, তালেবুর রহমান, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, কাজী মোহাম্মদ ইদ্রীস প্রমুখ।

আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়, এরা ছিলেন নিশিদিনের অক্লান্ত কলমী সৈনিক যারা বাঙালী মুসলমানদের এ উজ্জীবনের স্বপ্নকে রাজনীতির পংক থেকে উদ্ধার করে এক ইনটেলেকচুয়াল আইডিয়ালিজমে পরিণত করেছিলেন। নিঃসন্দেহে ইকবাল ছিলেন রেনেসাঁ গোষ্ঠীর পথিকৃত এবং এদের চিন্তা-ভাবনা ও মনন বিকাশে এক বিশিষ্ট ইকবালীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। ইকবালের বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন তাদের স্বতন্ত্র চিন্তার বিকাশে এক প্রচণ্ড ঝড় তুলেছিল। সেদিন পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক জোয়ারেই তারা ভেসে যাননি, জাতির নিজস্ব কৃষ্টি ও কলার সুউচ্চ মিনার নির্মাণে তারা তখনই সাধনার হাত বাড়িয়েছিলেন এবং আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ গতিপথের একটি দার্শনিক ও শিল্প সমন্বিত রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের বর্তমান সাহিত্যে যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং শিল্প-সংস্কৃতিতে যে স্বকীয়তার উচ্চারণ আমরা প্রায়শঃই শুনতে পাই তার পশ্চাতে ইকবালের সুউচ্চ চিন্তাধারার বলিষ্ঠ প্রভাব আজও ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং যা কিনা রেনেসাঁ গোষ্ঠীর সূচিত বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছিল।

কবিতা হলো সাহিত্যের সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ এবং সংগত কারণেই সেদিন বাংলাদেশের কবিরা এ ঐতিহ্যিক চেতনার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী। কবিদের মধ্যে সবার আগে যার নাম করতে হয়, তিনি ফররুখ আহমদ, রেনেসাঁ আন্দোলনের জোয়ার যখন তুঙ্গে সেই প্রেক্ষাপটে তিনি কলম ধরেছিলেন। ইসলামের উন্মেষ যুগের মধুর চিত্র ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যে নতুন করে ফুটিয়ে তুললেন। মুসলিম চেতনার এক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হল তাঁর রচনায়। ইকবালের চিন্তা-ভাবনা তাঁর সৃষ্টিকর্মে সেদিন বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। আঙ্গিক ও প্রকরণের দিক দিয়ে সেটা যতটুকু না ছিল তার চেয়ে ভাবনার জগতে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল অনেক বেশী। ফররুখ আহমদের সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম মুনীরা, হাতেমতায়ী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ শুধু মুসলিম ঐতিহ্যের নবরূপায়ণই নয়, ইকবালের কবিকর্মের মতো সমকালীন মুসলিম মানসের এ হলো পুনরুজ্জীবন আকাঙ্ক্ষী হৃদয়ের সুধা প্রস্রবণও বটে। ফররুখ আহমদের কাছে ইকবাল শুধু কবিমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর প্রোজ্জ্বল বিশ্বাসের

দিগন্তে প্রত্যয়ী এক মুর্শিদ। ফররুখ আহমদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' উৎসর্গ করেছিলেন "বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার, দার্শনিক মহাকবি আল্লামআ ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে"–

তোমার নয়নে দীপ্তি সিকান্দার শাহার মতন।
নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন তোমার অন্বেষা
(জিন্দেগীর নীল পাত্রে উচ্ছ্বসিত ঘন রক্ত নেশা
অনির্বাণ সিরাজীর) পাড়ি দেয় মরু মাঠ বন,
অথই দরিয়া তীর। হে বিজয়ী! তবু অনুক্ষণ
ধ্যান করো কোন পথ, কোন রাত্রি অজানা তোমার,
এক নেশা না মিটিতে সাড়া আসে দ্বিতীয় নেশার;
এক সমুদ্রের শেষে জাগে অন্য সমুদ্র স্বনন।
যেথা ক্ষীয়মান মৃত পাহাড়ের ঘুমন্ত শিখরে
জীবনের ক্ষীণ সত্তা মূর্ছাতুর অসাড়, নিশ্চল,
মুহূর্তের পদধ্বনি জাগেনা যে সুষুপ্ত পাথরে,
জ্বলেনা, রাত্রির তীর, নাহি জাগে স্বপ্ন সমুজ্জ্বল
প্রাণবন্ত মাদকতা; সে নির্জিত তমিস্রা সাগরে
দিনের দুর্জয় ঝড় আনিয়াছে হে স্বর্ণ ঈগল।।

বাংলায় ইকবাল কাব্যের সার্থক অনুবাদক হিসেবে ফররুখ আহমদের খ্যাতিও সর্বজনবিদিত।

রেনেসাঁ যুগের ইকবালভাবাপন্ন কবিদের মধ্যে আর যারা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তারা হলেন সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন, তালিম হোসেন, মুফাখখারুল ইসলাম ও সৈয়দ আলী আশরাফ। ইসলামী আদর্শের পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন তাদেরকেও আলোড়িত করেছিল এবং শিল্প-সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে তাই তারাও এগিয়ে এসেছিলেন।

এছাড়াও কবি গোলাম মোস্তফা, শাহাদাত হোসেন, বেনজীর আহমদ ও খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীনের মত প্রবীণ কবিরাও ইকবাল কাব্যের অবিনাশী বাণীতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। রেনেসাঁ আন্দোলনের কবিদের মতো কাব্যের বহিরাংগিক উপমা, রূপ ও চিত্রকল্পে মুসলিম ঐতিহ্যের ছবি এত প্রকট না হলেও কাব্য ভাবনা ও অনুভবে তারা অনেক কাছাকাছি ছিলেন। বিশেষ করে কবি গোলাম মোস্তফা যিনি ইকবালের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কবিতার মুক্তছন্দ অনুবাদকও বটে, এই মহান কবির চিন্তা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তার অনেক কবিতায় ও প্রবন্ধে রয়েছে এর প্রোজ্বল ছাপ। উদাহরণস্বরূপ আমরা কবি গোলাম মোস্তফার শব-ই-বরাত কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি, যেখানে ইকবালের শেকোয়ার অনুরণনই শোনা যায়।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও ইকবাল কাব্যের সাথে সুপরিচিত ছিলেন এবং একথা তিনি মোহাম্মদ সুলতানকৃত শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়ার অনুবাদ কাব্যের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। যদিও তিনি ইকবালের কোন কবিতার অনুবাদ করেননি। তবু এ ভূমিকায় ইকবালকে তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সম্মানিত করেছেন। ইকবালের সর্বমানবিকতা ও আন্তর্জাতিকতার বাণী তাকে মুগ্ধ করে থাকবে। বিভাগোত্তরকালে ইকবালের প্রত্যয়শীল বাণী ও কর্মের আবেদন আরও সফলভাবে আমাদের সমাজ মানসকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়। ইকবাল রচনাবলীর এক বিরাট অংশ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁর চিন্তা ও দর্শনের আরো ব্যাপক

প্রসারকল্পে বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসেন। এ প্রসঙ্গে অধুনালুপ্ত ইকবাল একাডেমীর গরীমাদীপ্ত ভূমিকা স্মরণযোগ্য। এ প্রতিষ্ঠানটির প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের সাধারণ লোক মানসে ইকবালের এক প্রোজ্বল ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে। ইকবাল একাডেমী আয়োজিত অনুষ্ঠানাদিতে দেশের পন্ডিত ও বিদগ্ধ সমাজ অংশগ্রহণ করে ইকবালের চিন্তা ও মানসকে জনগণের দুয়ারে সম্প্রসারিত করেছেন। এঁদের মধ্যে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুর্শেদ, বিচারপতি আব্দুল মং দুদ ও ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবের নাম উল্লেখযোগ্য।

এ সামগ্রিক প্রচেষ্টা ইকবালের বিশিষ্ট চিন্ত ও দর্শনের আলোকে আমাদের লোক মানসকে উজ্জীবিত করে তোলে। ইসলামী শরীয়তের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার যে আহবান ইকবাল পেশ করেছিলেন, তা দানা বাঁধতে শুর করে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার যে প্রত্যয়দীপ্ত স্বপ্ন তা ইকবালের চিন্তা ও দর্শনের মারফত রাজনীতিবিদ, পণ্ডিত ও বিগদ্ধ সমাজের কাছে এক প্রোজ্বল বিশ্বাসের দাবানল হয়ে দেখা দিয়েছে। অনাগত কালের মুসলিম মানসে ইকবালের এ আলোক বিচ্ছুরণ চলতেই থাকবে।

ইকবালের খূদী দর্শন

ইকবাল দর্শনের প্রত্যয়শীলতা মানুষের শাশ্বত জয়যাত্রার অভিজ্ঞান। নতুন দিনের কল্লোলিত জীবন ছন্দ তাঁর দর্শনের বীণায় মুখর হয়ে উঠেছে। পুরনো অতীতের নিবীর্যতাকে ভেঙ্গে ফেলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্নরঙিন চিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন।

ইকবাল মহাজীবনের কবি। তাঁর কবিতার সত্য যেমনি ভূগোলের সীমানাকে অতিক্রম করেছে, তেমনি আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষুদ্র বৃত্তকেও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। অন্ধকারের খরতরঙ্গ অতিক্রম করে তিনি মানবতার আলোঝলোমল মুক্ত পৃথিবীর জয়গান গেয়েছেন।

বিশ্বজ্ঞানের প্রসারে ইকবাল-দর্শন নক্ষত্রের আলোক বিচ্ছুরণের মতো। মানবতার জন্য তিনি যে অমরতার বাণী শুনিয়েছেন তা তাঁর অনিঃশেষ আশাবাদের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর দর্শন মানুষের অবিনশ্বর জীবনের ধারণার মধ্যে পূর্ণত্ব লাভ করেছে এবং একই কারণে স্থিতির নিন্দা ও গতির স্তুতিতে তাঁর কবিতা মুখর হয়ে উঠেছে।

ইকবাল-দর্শনের মর্মার্থ অনুধাবনের পূর্বে তাঁর এ বিশিষ্ট চিন্তার উৎসমূলে আলো ফেলবার প্রয়োজন। কারণ, তাঁর দর্শনের পশ্চাৎভূমি অনাবিষ্কৃত থাকলে এর প্রসার ও গতিময়তার ধারণা কুয়াশাচ্ছন্নই রয়ে যাবে।

ইকবাল যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন মুসলিম দুনিয়ায় চলছিল এক তিমিরাচ্ছন্ন যুগ। তাঁর স্বদেশভূমিতেও বৈদেশী আগ্রাসন হয়েছে প্রসারিত। পাক ভারত উপমহাদেশে দীর্ঘকাল রাজত্ব করবার পর মুসলমানরা হারিয়েছে তাদের আধিপত্য। ফলস্বরূপ মুসলিম সমাজ জীবনে বিস্তৃত হয়েছে নৈরাশ্য ও পরাজয়ী চারিত্র্য। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর সাথে মুসলিম দুনিয়ায় দেখা দিল নৈতিক বন্ধ্যাত্ব। এ জড়তা বেশী করে দেখা দিল ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে। স্বীয় ঐতিহ্যিক প্রেরণা বঞ্চিত হয়ে বিকাশমান জীবনের ধারণা থেকেও তারা বিমুখ হয়ে পড়লো। তারপর যখন তারা এমনি হতবুদ্ধি অবস্থায় উন্নততর পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এলো তখন তাদের মধ্যে এলো প্রতিক্রিয়া এবং এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো নিজেদের ভিতর থেকেই। নতুন সভ্যতার সাথে গা মিলিয়ে চলবার তাগিদ তারা অনুভব করলো ঠিক, কিন্তু ফলশ্রুতিতে স্বীয় ঐতিহ্যের জবাকুসুমের সাথে তাদের যোগাযোগও ছিন্ন হতে শুরু করলো। বিশ্ব ইসলামের ক্ষেত্রে জামালুদ্দীন আফগানী ও তাঁর যোগ্য শিষ্য মুফতী মোহাম্মদ আবদুহ, রশিদ রিযা, কাওকবী, ইবনে বাদিস প্রমুখেরা কাল ধর্মের এ চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেন। তারা ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যায়নে ব্রতী হন এবং প্রমাণ করেন ইসলাম প্রগতির অন্তরায় নয়, পক্ষান্তরে আধুনিকতার মেজাজের সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যপূর্ণ ঐতিহাসিক বিবর্তন এক আশ্চর্য ঘটনা। তারা বিভিন্ন সময় ইসলামের সাথে যে অনৈসলামী জঞ্জাল যুক্ত হয়েছে তার অপসারণে উদ্যোগী হন এবং ইউরোপের উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক দার্শনিক, প্রাচ্যবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক হেনরী ল্যামেনস, লর্ড ক্রোমার, রেনান প্রমুখের ইসলামবিরোধী অপপ্রচারের জওয়াব দিতে আরম্ভ করেন।

বিস্মৃতির উপত্যকা থেকে এমনি করে মুসলিম সমাজ জীবনে জাগরণের ঢেউ এসে দোলা দিতে শুরু করে। এ সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশেও কয়েকটি সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এখানেও মুসলিম সংস্কারকেরা অতীতের নির্বির্যতাকে মুছে ফেলে তাদের এগিয়ে চলার ডাক দেন তারা

গভীরভাবে অনুভব করেন মুসলমানদের এ অধোগতির জন্য দায়ী তাদের বিশ্বাসের অভাব এবং সেই কারণে তারা হারিয়েছে জীবনের উপর কর্তৃত্ব। তারা উপলব্ধি করেন কোরআনের শাশ্বত ব্যবস্থাদির আলোকে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের পুনর্গঠন প্রয়োজন। অন্যথায় জীবন সংগ্রামে তাদের পশ্চাৎপদতা অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। এ সময়ের সংস্কারকদের মধ্যে যার নাম প্রথম বিবেচনার দাবী রাখে তিনি হলেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। তাঁর একক প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় আলীগড় এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল মোহামেডান কলেজ যা পরবর্তী পর্যায়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো বিতরণের প্রয়োজন কত বেশী। তাঁর প্রতীতি জন্মেছিল একটি নতুন সমাজ বিনির্মাণে শিক্ষার ভূমিকা অতি ব্যাপক এবং এর মাধ্যমেই জনগণের নৈতিক পুনর্জীবন সম্ভব। নৈতিকতার উৎসমূল যদি গভীর না হয় তবে জাতির আত্মবিশ্বাসও ক্ষীণ হয়ে আসতে বাধ্য। স্যার সৈয়দ আহমদ ঔপনিবেশিক শাসনে ও শোষণে জর্জরিত মুসলিম সমাজে এই আত্মবিশ্বাসের অভাব বড় বেশী করে অনুভব করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদের পরে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন স্যার সৈয়দ আমীর আলী। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত 'দ্যা স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে ইসলামের কালজয়ী ও শাশ্বত মূল্যবোধকে তুলে ধরেছেন এবং এর গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের মিনারকে আলোকোজ্জ্বল দীপ্তিতে সমুন্নত করেছেন।

তার এ পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য ছিল দুটি। সমকালে পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম বিষয়ক ভ্রান্ত চিন্তার বিদূরণ, পাশাপাশি আত্মবিস্মরিত মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া যাতে কিনা তাদের নির্জীবন প্রক্রিয়ার অবসান ঘটে। কিন্তু এ সমস্ত সংস্কারকদের মধ্যে ইকবাল ছিলেন অগ্রগামী এবং অনেক বেশী প্রতিভামন্ডিত। তাঁর মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল চিন্তার নেতৃত্ব দেওয়ার অবিসংবাদী ক্ষমতা।

তাঁর অতুলনীয় মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মুসলিমের অতীত ইতিহাস এবং তিনি স্বজাতির এ অধোগতির কার্যকারণও বের করেছিলেন অসীম দরদের সাথে। তাঁর মতে মুসলমানদের বিপর্যয়ের প্রধানতম কারণ হলো–

(১) প্রকৃতিকে বশে আনবার ক্ষেত্রে অবহেলা ও অর্থনৈতিক প্রগতির প্রতি উদাসীনতা,

(২) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের অভাব।

ইকবাল মনে করতেন, কোরআনী চিন্তার মধ্যে মানুষের যে কর্মমুখর উপযোগিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর ইসলামের দ্রুত বিস্তৃতির ফলে কোরআনের এই বিশিষ্ট ধারণা ও চিন্তা গ্রীক দর্শনের সংস্পর্শে ঝাপসা হয়ে আসে। তাই ইকবাল কোরআন ব্যাখ্যায়নে একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন– যাতে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা অক্ষত থাকে।

গ্রীক দর্শনের সকল চিন্তাভাবনা গড়ে উঠেছে বিমূর্তকে নিয়ে। গ্রীক দর্শনের আদি পিতা সক্রেটিস কেবলমাত্র মানুষকেই বিবেচনাযোগ্য মনে করতেন, তাঁর কাছে বহির্বিশ্বের কোন মূল্য ছিল না। দার্শনিক প্লেটোও উস্তাদের অনুসরণ করেছেন। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির কোন তাৎপর্য ছিল না। তিনি মনে করতেন, এর থেকে শুধু মতামত লাভ করা যেতে পারে; প্রকৃত মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সত্য সুন্দর তার কাছে ছিল নেহায়েত ধারণার জগতের ব্যাপার। নিও-প্লাটোনীয় দর্শনও ছিল কল্পনাশ্রিত। এ দর্শনে পরম সত্যকে ধারণা করা হয়েছে স্থিতিশীলরূপে; দর্শন ও

ধর্মের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে ব্যবধান এবং চিন্তা ও অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াকে করা হয়েছে নিরুৎসাহিত।

মুসলিম দার্শনিক আল ফারাবী, ইবনে রুশদ প্রমুখ ছিলেন নিও-প্লাটোনীয় দর্শনের প্রবক্তা। তারা চেয়েছিলেন নবুওয়ত, ওহী, সৃষ্টি রহস্য প্রভৃতির এ দর্শনের আলোকে ইসলামী ব্যাখ্যা দিতে।

কিন্তু মুসলিম চিন্তার অগ্রপথিক ইমাম গায্যালী এ দর্শনকে উদ্ভট ও নিরর্থক বিবেচনা করেছেন এবং বলিষ্ঠভাবে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন– যুক্তি কখনো ওহীর স্থান পেতে পারে না। ইমাম গায্যালীই একমাত্র বিরল প্রতিভাধর মহৎ দার্শনিক যিনি ইসলামী দর্শনের উপর থেকে গ্রীক চিন্তার এই অশুভ মেঘকে সাফল্যজনকভাবে বিদূরণ করেন।

ইকবালের চিন্তাও অনুরণিত হয়েছে একইভাবে। ইমাম গায্যালীর বিশিষ্ট ভাবনার সাথে ইকবালের অভিন্নতা লক্ষণীয়। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর গতিশীলতার পুনরুজ্জীবন ঘটানো। চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দে ইমাম ইবনে তাইমিয়াও এ লক্ষ্যে ইসলামী চিন্তার পুনর্গঠন করতে চেয়েছিলেন। ইকবাল দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ এবং মানুষ হলো সৃষ্টিধর্মী ও ক্রমাগত বিকাশমান অস্তিত্ব যা অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে ছুটে যাবে। আল্লাহর পৃথিবী একটি রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষ নয়, সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে এ বিকশিত জীবনের কল্যাণময়তারই উজ্জীবন ঘটাবে।

ইকবাল তাই দর্শনের এই অপরিহার্য অংশকে স্বাভাবিক কারণেই পুনর্বিবেচনায় আনেন এবং মানব কল্যাণের বিপুল প্রসারিত দিগন্তের সূচনা করেন। তিনি ইসলামী শরীয়ার অচ্ছেদ্য অথচ অবহেলিত অংশ ইজতিহাদের রুদ্ধদ্বার কক্ষে করাঘাত করে আধুনিক কালে এর পুনরুজ্জীবনও দান করেন। ইকবাল দর্শনে যে গতিশীলতার ধারণা ব্যক্ত করা হয়েছে তা কোরআনী ধারণার সাথে সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছে। তাঁর খূদী এক বলিষ্ঠ প্রাণ প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন্ত মানসের প্রতীকে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইকবাল তাঁর সুবিখ্যাত **'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'** শীর্ষক গ্রন্থের 'ইসলামী কাঠামোতে গতিশীলতার নীতি' বক্তৃতায় ইসলামকে একটি জীবন্ত ও সদা বিকাশমান শক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা কিনা এই পৃথিবীর সর্বপরিবর্তনশীল ও বিকাশমান শক্তিসমূহের সাথেই তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম।

একই বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন, কোরআনীয় ধারণায় জীবন সদা পরিবর্তনশীল। তাই ইসলামের আইন পদ্ধতিও সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবর্তনের উপযোগী। কিন্তু এই পরিবর্তন কোন বল্গাহীন ধারায় চলতে পারেনা।

কোরআনে উল্লেখিত হয়েছে আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজেই নিজ অবস্থার পরিবর্তন করে।

সুতরাং পরিবর্তনটা হচ্ছে নিজের আভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। ইকবালের খূদী প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন গতিশীল শক্তি কিন্তু তা বাঁধনহারা জীবন ধারণার দ্বারা পুষ্ট নয়। কোরআনীয় নীতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাদির আলোকে জীবন বিকাশের অনুকূল এক কল্যাণকর হাওয়ায় তার বর্ধন।

এই খূদীর তাহলে লক্ষ্য কি? বিশ্বমানবতার জন্য খূদীর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি! ইউরোপে ইণ্ডিভিজুয়ালিজম বলে যে মতবাদের ধারণা প্রচলিত রয়েছে এই খূদীর সাথে তার কোন

সামঞ্জস্য আছে কি? অথবা জীবন সমস্যার সমাধানে কালে কালে দার্শনিকেরা যে আদর্শ মানবের উপমা হাজির করেছেন তার সাথেই বা ইকবালের সৌসাদৃশ্য কোথায়?

ইণ্ডিভিজুয়ালিজমের ধারণা প্রচার করেছিলেন সর্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক রুশো এবং ইংরেজ দার্শনিক জন লক। কালেক্টিভিজমের বিরুদ্ধে এ ছিল এক সুসমন্বিত তীব্র প্রতিবাদ। ইউরোপে মধ্য যুগে পোপের রাজত্বের অবসানের পর রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে স্বাধীন মতামত প্রকাশের এ ধারণা তীব্র হয়। ইভিভিজুয়ালিজমের এ ধারণার পোষকতাকারী তখন বলতে থাকেন, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে স্বতন্ত্র শক্তিমান সত্তা রয়েছে তার বিকাশের সুযোগ দিতে হবে, ফলশ্রুতিতে প্রত্যেকের স্বাধীন মতামতের মূল্যায়ন করতে হবে। ইভিভিজুয়ালিজমের এ ধারণা স্টুয়ার্ট মিল ও বেন্থামের হাতে আরো সম্প্রসারিত হয়। মানুষের যে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান বাইরের পৃথিবী থেকে আহরিত হয় তা দিয়েই সে তার একটি মানস সত্তা নির্মাণ করে এবং একটি বিশিষ্ট ধারণা ও মতামতের জন্ম দেয়। এ মতামত নির্মাণের সময় সে তার স্বাধীনতা প্রয়োগ করে থাকে। এখানে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হতে সে বাধ্য নয়।

কিন্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ কেবল আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকেই নিশ্চিত করতে পারে; মিল এই সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের নীতিকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং রুশো ও লকের ব্যক্তিক কল্যাণের পরিবর্তে প্রচুরতম লোকের কল্যাণের উপর জোর দিয়েছিলেন মাত্র।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের এমনি উদাহরণ পাওয়া যায় গীথের UBERMENSCH, শপেন হ্যায়ারের GENIUS, মৌলারের KARLMOOR, স্পীনোজার CONSTUS PRESERVANDI, বার্গসঁর ELAN VITAL এবং নীটশের SUPERMAN চিন্তাধারার মধ্যে।

ডারউইনের Theory of Evolution এ বিবর্তনকে যদিও জীবন্ত পৃথিবীর ধর্ম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে ইচ্ছাশক্তির কোন স্থান নেই। এ মতামত অনুসারে মানুষের নিয়তির পরিবর্তন নিয়তির উপরই নির্ভরশীল।

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের ইউরোপীয় ধারণাসমূহের সাথে ইকবালের খূদীর সাদৃশ্য বহিরাংগিক; অন্তরংগের দিক দিয়ে পার্থক্যটাই নজরে আসে বেশী।

যেমন নীটশের কল্পিত ব্যক্তিমানসের চেয়ে ইকবালের খূদী দর্শন অনেক বেশী উজ্জ্বল। ইকবাল মানব জীবনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন–

১. ব্যক্তিত্বহীন আত্মচেতনা বর্জিত শূন্য বাল্যাবস্থা;

২. আত্মচেতনায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মানব অবস্থা;

এই অবস্থায় মানুষ কোন বাধাকে মানতে চায়না। নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশমান করবার জন্য সে খোদায়ী অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে। নীটশে এ কর্মটিই করেছেন।

৩. এ স্তরে মানুষ নিজের মধ্যে খোদার অস্তিত্ব অনুভব করে। স্বীয় বৃত্তিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে কল্যাণময় জীবন বিকাশের উপযোগী খোদায়ী নির্দেশের বাস্তবায়নে সে অগ্রসর হয় এবং পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধিত্ব কায়েম করে। দার্শনিক নীটশে এ ধারণার ব্যাপারে সুপরিজ্ঞাত ছিলেন না।

নীটশে মনে করতেন, জ্ঞান আহরণ জীবনের লক্ষ্য নয়; মাধ্যম। জ্ঞান হল জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার বর্ম বিশেষ। নীটশের বিশ্বাস ছিল জীবন যুদ্ধে একমাত্র শক্তিশালী ব্যক্তিই টিকে থাকতে

পারে। তার Superman বা অতিমানব হিটলার বা মুসোলিনীর নাৎসী ধারা থেকেই অস্তিত্বলাভ করতে পারে বলে মনে হয়। ধর্মের প্রতি তার আস্থা ছিল না। পাশ্চাত্যের সামাজিক অস্থিরতাই তার এই অতিমানব সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

ইকবালের খূদীর অর্থ ছিল মানবজীবনে খোদায়ী হুকুমের আলোকে ঐশী গুণাবলীর বিকাশ, পক্ষান্তরে নীটশের অতিমানব এক অতিপাষণ্ড ধর্মহীন কর্তৃত্ববান ব্যক্তিত্ব– The characteristics of Superman, hardness and strength, pity, humility and justice cripple action.

ইকবালের কথায় নীটশীয় চিন্তার স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে অধিকতর তীক্ষ্ণভাবে–

Neitzsche had a glimpse of the ideal but his atheism and aristocratic prejudice marred his whole conception.

ইকবাল মনে করতেন, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনা জ্ঞানের সকল উৎস হতে পারে না। বোধির (Intuition) অপরিহার্যতাকে তিনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। ইকবালের খূদীর বিকাশে বোধির তাৎপর্য অপরিসীম। নীটশের কাছে এসবের কোন গুরুত্ব নেই।

ইউরোপের চিন্তা জগতে বেকন যে যুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছেন এবং যুক্তি দিয়ে সবকিছু মূল্যায়নের ধারা সৃষ্টি করেছেন সেই পথ ধরেই দেকার্তে, স্পীনোজা লিবিনৎজ, লক, ডিওয়ে, কিলপাট্রিক প্রমুখ সবাই ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানরাজ্যকেই প্রসারিত করেছেন। কেয়ারকেগার্ড ও বার্গসঁ হলেন ব্যতিক্রম। কেয়ারকেগার্ড ইন্দ্রিয়লব্ধ চেতনার স্তর অতিক্রম করে গেছেন এবং জ্ঞানরাজ্যের নতুন গৃহে প্রবেশ করেছেন। কেয়ারকেগার্ড হলেন অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের পুরোধা এবং বিশ্বজ্ঞানের প্রসারে তিনি বোধির ধারাকে উপযুক্ত স্থান দিয়েছেন। ইকবালের সাথে কেয়ারকেগার্ডের এদিক দিয়ে সৌসাদৃশ্য রয়েছে।

কেয়ারকেগার্ডের পর যার নাম করতে হয় তিনি বার্গসঁ তার ধারণা পার্থিব সম্পর্ক সত্য ও মৌলিক। সুতরাং বর্তমান অতীতের বোঝা কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যায়। উইলিয়াম জেমসেরও ধারণা– চেতনা হচ্ছে এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ যাকে বিভক্ত করা যায়না কিংবা যার মধ্যে কোন বিচ্ছেদ আনা সম্ভব নয়। বার্গসঁর মতে অতীত বর্তমানের দরজা দিয়ে ভবিষ্যতের রাজ্যে ঢুকে পড়ে। বর্তমানকে তিনি বিশ্লেষণ করেন গতিহীন এক অস্তিত্বরূপে, কারণ সব পরিবর্তনের মূল কার্যকারণই হলো অতীত। কেননা, মানুষের ঐতিহাসিক পরম্পরা এমনিভাবে রক্ষা করা হয়েছে। ইকবাল এখানে বার্গসঁর সাথে একমত হয়েছেন।

বার্গসঁর E'lan Vital মতবাদের উদ্ভব এমনি প্রেক্ষাপটে। তিনিও মনে করতেন জীবন এক অনন্ত প্রবাহ যা নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে–

The most significant characteristic of E'lan Vital is perpetual change (Guide to Modern Thought, C.E.M. Joad)

কারণ– Life is an original impetus; it has within it, the tremendous push, which is destined to carry man to the highest pinnacle of achievements (Henry Bergson : The Philosophy of Change, H. Wildon Carr)

বার্গসঁর চিন্তার সমীকরণ করলে দাঁড়ায়–

Bergson believes that the fundamental impulse in life is tension and this

tension is the momentum behind thought and action. (Henry Bergson : The Philosophy of Change. H. Wildon Carr)

বার্গসঁর এই বিবর্তনমূলক গতিচিন্তার সাথে ইকবালের ঐক্যটাই বেশী বলে মনে হয়। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যেসব নেতিবাচক চিন্তাধারা বিবর্তনের সম্ভাবনাকে ঋণাত্মক বলে উড়িয়ে দিয়েছে ইকবাল তার ঘোর বিরোধী। বার্গসঁ, ডারউইন ও ল্যামার্কের জীবজগতের বিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন, তারা বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের বহিরাংগিক চিত্রটি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, কিন্তু এর পশ্চাতে যে বিপুল প্রাণবান শক্তি বর্তমান, যার ধর্মই হচ্ছে নিত্য নতুন নব নব সৃষ্টি করে চলা তার প্রতি তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

কালকে তাই বার্গসঁ বলেছেন বিশ্বসত্তা। কারণ কাল অখণ্ড এবং নিয়ত গতিশীল; কালের নেই কোন স্থিতি। পৃথিবীতে স্থিতিশীল বলেও কিছু নেই। কালের ধর্ম গতিশীলতা হলেও তাতে কোন লক্ষ্য নিবদ্ধ নেই; কারণ কাল বা বিশ্বসত্তা সম্মুখে ছুটে চলেছে ঠিক, কিন্তু কোন আদর্শের বাস্তবায়নে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ইকবালের, বার্গসঁর এ গতিশীলতার ধারণার সাথে ঐকমত্য থাকলেও তিনি বার্গসঁ প্রদত্ত কালের লক্ষ্যহীন যাত্রার ধারণার সাথে একমত হতে পারেননি। ইকবাল মনে করেন, পৃথিবীতে কোন কিছুই তাৎপর্যহীন ঘটনা নয়, ক্ষুদ্র কণিকার মধ্যেও বিরাট অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। ক্রমবিকাশের ধারার পরিণতি হচ্ছে মানব সৃষ্টি ও তার মাধ্যমে জীবনের মহৎ মূল্যমানের অনুসন্ধান করা। বিশ্ব প্রকৃতিতে মানব সৃষ্টি এক বিরাট ঘটনা। কোরআনী পটভূমি অনুসারে মানুষ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। খলিফার দায়িত্ব হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করা। সুতরাং আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকল্পেই এ ক্রমবিকাশের গতিশীল ধারা এগিয়ে চলেছে এবং তা মানুষের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হবে।

ইকবালের খূদী চিন্তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে ফারসী মহাকবি জালালুদ্দীন রুমীর অহম চিন্তার আলোচনা প্রয়োজন। কারণ ইকবাল তাঁর আসরার-ই-খূদীর এক জায়গায় রুমীকে মুর্শিদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন রুমীর প্রতিভা তাঁর অনুভূতিকে জাগ্রত করেছে–

রুমীর প্রতিভা-দীপ্তি উদ্দীপিত করেছে আমাকে,
রহস্যের গ্রন্থ হতে আজ আমি গেয়ে যাই গান,
আত্মা তার অগ্নিকুণ্ড, জ্বলন্ত, উজ্জ্বল,
আমি শুধু অগ্নিকণা প্রাণ পাই মুহূর্তের তরে।
পতঙ্গের মত মোরে গ্রাস করিয়াছে তার দীপ্ত অগ্নিশিখা
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায়, কানায়,
স্বর্ণ মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী,
প্রজ্বলিত অগ্নিকুন্ড করেছে সে মোর বিভূতিরে,
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য, বিভা কেড়ে নিতে বালুকণা উঠে এল
মরুভূমি থেকে। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

রুমীর অহমবাদ হচ্ছে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের আত্মবিলোপন চিন্তার এক মর্মান্তিক প্রতিবাদ। গ্রীক চিন্তার সূচনা হচ্ছে থেলিস থেকে এবং প্লেটোর দর্শনের মধ্যে তার পরিণতি। এরিস্টটল, গুরু প্লেটোর চিন্তার সামঞ্জস্য ও সংহতি এনেছেন। প্লেটোর কাছে নির্বিশেষই ছিল চূড়ান্ত– বিশেষের কোন তাৎপর্য ছিল না। প্লেটো মানবাত্মার অমরত্বকে নির্বিশেষের মধ্যে নিমজ্জিত

করেছেন এবং বলেছেন, মানবাত্মা নির্বিশেষের সাথে ঐক্য স্থাপন করবার জন্য অধীর আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষা করে আছে। এরিস্টটল নির্বিশেষকে বিশেষের মধ্যে স্থান দিলেও শেষ পরিণতিতে তার কাছে নির্বিশেষই উচ্চস্থান লাভ করেছে।

ভারতীয় দর্শনে শংকরাচার্য যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাও গ্রীক দর্শনের অনুরূপ। শংকারাচার্য ব্রহ্মকেই স্থিতি জ্ঞান করেছেন এবং বলেছেন, মানবাত্মা জ্ঞানের মাধ্যমেই স্থিতি লাভ করবে; এতেই তার মোক্ষ লাভ ঘটবে। এসব দর্শনের মৌল কথাটিই হলো, মানবাত্মা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পরমাত্মার মধ্যে নিমজ্জিত হবে। রুমী এসবের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলেছেন, মানবাত্মা হচ্ছে এক ও অবিভাজ্য এবং তাকে খণ্ডিত করে দেখা অর্থহীন। তিনি এক কবিতায় কি বজ্র গম্ভীর স্বরে ডাক দিয়েছেন মানবাত্মাকে তার চরম প্রয়োজন পরিপূরণ করতে–

মৃত্তিকার অন্ধকার তলে
আমার সত্তা ছিল মিশে
প্রস্তর আর লৌহ পিণ্ড সাথে
স্তব্ধবাক বর্ণ গন্ধহীন
তারপর একদা প্রভাতে
প্রাণের স্পন্দন এলো
মাটির আঁধারে
আমার সত্তা পেল রূপরস প্রাণ
বিচিত্র রঙের ফুলে হেসে উঠলাম
প্রাণ পেল গতি তার
মাটির বাঁধন গেল টুটে
শুরু হল ভ্রাম্যমাণ জীবনের
পথ পরিক্রমা
সন্তরণ, উড্ডয়ন
হামাগুড়ি আর পায়ে চলা
শেষ হলো
শুরু হলো আরেক জীবন
আমার সত্তা পেল নবতর রূপ
দৃষ্টি পেল যে দৃষ্টিতে এসে
বিশ্বের রহস্য দিল ধরা,
এই দৃষ্টি মানুষের
আমি সেই দ্রষ্টা মানুষ
এই দূর আকাশের পাড়ে
মৃত্যুহীন ফেরেশতার লোকে
আরো দূরে রাত্রিদিন
জন্ম আর মরণের বাহিরে
দৃশ্য অদৃশ্য আর
সকল অস্তিত্ব যেখানে
একাকারে লীন হয়ে গেছে
আমার গন্তব্য সেই
মৃত্যুহীন অমৃতের লোক।

রুমীর এ দর্শনের ভিত্তিতে ইকবাল তাঁর খূদীতত্ত্ব প্রচার করেন। যে সত্তা লুকিয়েছিল মৃত্তিকার অন্ধকার তলে বিবর্তনের ধারায় বিশ্ব রহস্য যার কাছে ধরা দিয়েছে এবং পরিণতিতে এই সত্তা নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে বিশ্বের আদিম ও মূলীভূত সত্তার সাথে অভেদ মনে করার মতো বলিষ্ঠতা প্রকাশ করেছে। ইকবালও সে সত্তার সাথে মানবাত্মার কোন বিভাজন রেখা টানেননি। এ চিন্তার সাথে ইউরোপীয় ইন্ডিভিজুয়ালিজম বা সুপারম্যান মতবাদের আপাতঃ সাদৃশ্য থাকলেও ব্যষ্টিবাদের সুখসুবিধা অর্জন কিংবা অতিমানবের অন্যের উপরে আধিপত্য বিস্তারের মানসিকতা থেকে খূদী দর্শন মুক্ত।

ইকবালের চিন্তার মৌল কাঠামোটি গড়ে উঠেছে আত্মস্বরূপ উন্মোচনের মধ্যে বিশ্ব পরিচয় লাভে। ইকবালীয় ধারণায় এ আত্মপরিচয় লাভ সম্ভব কোরআনী ব্যবস্থাসমূহের সুষ্ঠু প্রতিপালনের মধ্যে। ইকবালের আসরার-ই-খূদী যা তাঁর জীবন দর্শনের চিত্ররূপময় কারুকাজ তা মূলত কোরআনুল হাকীম হতেই উৎসারিত।

উপমহাদেশে যে ধারণা ছিল মানবতার নির্জীবনের জন্য ক্রিয়াশীল, জ্ঞানকে যেখানে মনে করা হতো মায়া, মানুষকে তার তকদীরের উপর নির্ভর করে বানানো হয়েছিল কর্মস্পৃহাচ্যুৎ, সেখানে ইকবাল আনলেন জাগরণের বাণী, কর্মের বাণী, উন্মুখর প্রত্যয়ের বাণী–

দুর্বার তরংগ এক বয়ে গেল তীর তীব্র বেগে
বলে গেল ঃ আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান
যখন হারাই গতি সে মুহূর্তে আমি আর নাই। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

ইকবাল তাঁর আসরার-ই-খূদীর উপক্রমণিকায় খূদীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন। উর্দূতে খূদীর শাব্দিক অর্থ করলে দাঁড়ায় স্বার্থপরতা, কিন্তু ইকবাল এটিকে ব্যবহার করেছেন আত্মচৈতন্য, আত্মবিকাশ, আত্মোপলব্ধি অর্থে। জীবনের উদ্দেশ্য হলো একে এমনভাবে শিক্ষিত ও পরিশীলিত করে তোলা যে মানুষ হিসেবে যেসব গুণাবলীর বিকাশ হওয়া উচিত সেসবের পরিপূর্ণতা যেন অর্জিত হয়।

ইকবাল তাঁর 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' বক্তৃতামালার চতুর্থ বক্তৃতায় খূদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন প্রত্যেকটি খূদী একটি একক ও অবিভাজ্য সত্তা– আমার অনুভূতি, আমার ঘৃণা ও ভালোবাসা, বিচার ও মনোভঙ্গি একান্তভাবে আমার নিজস্ব।

এই আমি'র স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে ইকবাল ইসলামী দার্শনিক ইমাম গাযযালী, কান্ট, লায়ার্ড, উইলিয়াম জেমস প্রমুখের ধারণাবলীর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আমার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব বস্তু নয়, কর্ম। এমন কতকগুলি কর্মপরম্পরা যা একে অপরের সাথে যুক্ত এবং একটি নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যের একত্বে পরস্পর গ্রথিত।

আসরার-ই-খূদীতে ইকবাল খূদীর প্রকৃতি সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। একই স্থানে তিনি মানব খূদী সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ধারণাও ব্যক্ত করেছেন। প্রাচ্যে সাধারণত খূদী বা অহমকে মনে করা হয় ভ্রান্তি এবং তাকে অস্বীকার করার মধ্যে রয়েছে মুক্তি। হিন্দু দার্শনিকেরা অহংকে কর্মের সাথে যুক্ত করেছেন। ইকবাল মনে করেন, এটি তাদের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। কিন্তু শেষ পরিণতিতে হিন্দু চিন্তা-নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, মানুষকে তার কর্মের পাপাত্মক রূপ থেকে রেহাই পেতে হলে অহংকে বর্জন করতে হবে। ইকবাল বলেছেন, এ হলো

মানব ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থী এবং ইসলামের গতিবান শিক্ষা ও মর্মবাণীরও বিরোধী। কারণ ইসলাম জোর দিয়েছে কর্মের উপর। ইসলামী দৃষ্টিতেও মানব অহং সৃষ্টবস্তু কিন্তু অবিরাম কর্মশীলতার মধ্যে তারও অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। আসরার-ই-খূদীতে এ প্রচণ্ড গতিময়তার স্বরূপ কেমন ধরা পড়েছে–

গোলাব তুলেছো তুমি ইরানের শত গুলবাগে,
দেখেছো ইরানে, হিন্দে অপরূপ সৌন্দর্য বিথার,
মরুভূর খরোত্তাপ অনুভব কর একবার।
প্রাচীন খর্জুর সুরা একবার কর তুমি পান,
তোমার শিয়রে তার তপ্ত বক্ষ হোক উপাধান,
সমর্পণ কর তনু আজ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়
রেশম-বিলাসী তুমি, ঠাঁই নাও অমসৃণ কার্পাস শয্যায়।
পুষ্পের কোমল পর্ণে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশ পরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন করেছ তুমি ওগো, রক্তাধরা,
জ্বলন্ত বালুর পরে ছুড়ে ফেল আজ আপনারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎসধারে।
বুলবুলের মত তুমি কেঁদে যাবে কতকাল কান্না ব্যর্থতার?
কতকাল রবে তুমি বিলাসী বাসিন্দা বাগিচার?
**　　**　　**
বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে,
বিদ্যুৎ বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড়
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বস্তরে,
যেন যোগ্য হতে পারো জেহাদের– এই জিন্দেগীর;
তোমার তনু ও আত্মা দগ্ধ হতে পারে যেন
এই প্রাণবহ্নির উপরে। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

কবির আসরার-ই-খূদী হলো তাঁর দর্শনচিন্তার সুবিন্যস্ত গীতিমালা। এখানে তিনি খূদীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, জীবনের সৌকর্য ও প্রকৃত গুরুত্ব ফুটে ওঠে খূদীর শক্তির মধ্যে। দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রবল প্রত্যয় হলো পরিবর্তন ও সৃষ্টির একমাত্র কার্যকারণ। জিন্দেগীর কামিয়াবীও আসে এ পথ ধরে। তা হ'লেই বিশ্বপৃথিবীর উপর মানব আধিপত্য সংহত হতে পারে। ইকবাল দর্শনের মৌল দিকটি সম্প্রসারিত হয়েছে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্রমাগত আলোকরশ্মি বেয়ে। স্থিতি ইকবালের মতে মানুষের দৈহিক ও আত্মিক মৃত্যু। কিন্তু এই পরিবর্তন সূচিত হয় মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে এবং এ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে উপ্ত হয় মানুষের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সাধনা। ইকবালের এ পরিবর্তনমূলক জীবন চেতনার উৎস হচ্ছে কোরআনুল হাকীম। সুতরাং খূদীর বিকাশ ও উন্নয়ন– আত্মপ্রত্যয়, আত্মআকাঙ্ক্ষা ও আত্মচৈতন্য জাগরণের উপর নির্ভরশীল। ইকবালের এ ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তার সুবিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতায়–

If man does not take initiative, if he does not evolve the inner richness of being, if he ceases to feel the inward push of advancing life, then the spirit within him turns into stone and he is reduced to the level of dead matter.
(The Reconstruction of Religious Thought in Islam)

ইকবালের মতে, জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ফুটে ওঠে এ সৃষ্টিশীল গীতিকার মধ্যে যা কিনা নিরন্তর সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কামিয়াবী অর্জন করে–

He can not live a life to forget life. Action, movement, restlessness, love and a courageous sense of the importance of the self are the qualities which are required of one acting against the environments.

(A Note on Iqbal, Sadat Ali Khan)

ইকবালের খূদী চেতনার বিকাশে যে উন্মুখর সংগ্রাম তার আলেখ্য নির্মাণ করেছেন প্রখ্যাত প্রাচ্য তত্ত্ববিদ আর, এ নিকলসন–

For Iqbal, self conscionsness, individuality is all in all. He never tries of preaching the gospel of self knowledge, self affirmation and self developme.it. The pith of life is action, its end is spiritual and moral power which grow from obedience and self control.

(Iqbal's Message of the East, R. A. Nicholson)

এ সম্পর্কে তাঁর নিজেরই উচ্চারণ–

প্রত্যেক বস্তুই আত্মবিকাশের জন্য উন্মুখ
প্রতি অণু মহত্ত্ব লাভের প্রয়াসী;
জীবন এই গতিবেগ ব্যতীত সূচনা করে মৃত্যুর ঃ
ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা দ্বারা মানব হয় খোদায়ী গুণসম্পন্ন।
সত্তার শক্তিতে সম্প পরিণত হয় পর্বতে,
সত্তার দুর্বলতা
পর্বতকে পরিণত করে সম্পকণায়।
কেবল তুমিই বাস্তব এই ধরিত্রীর বুকে
আর সবকিছু মরীচিকা। (বালে জিবরীল, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

খূদীর পূর্ণ পরিণতি অর্জনের গতিপথ তাই মানব জীবনে আদিগন্ত ও বহু বিস্তৃত। মানবের বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তি অর্জনে ইকবাল সে পথের চিত্র সপ্রকাশ অবলোকন করেছেন। কবি আসরার-ই-খূদীর বিভিন্ন স্থানে এ নিয়ে আলোচনার অবতারণা করেছেন এবং পূর্ণতর ও বলিষ্ঠতর ব্যক্তিত্ব অর্জনে বিবর্তনের সংহত ও অন্তর্নিহিত অর্থ উদঘাটন করেছেন। যেমন–

বিশ্ব জীবন যতো বেশী করে আসে
আত্মশক্তি থেকে
জীবন ততোই এই শক্তির সাথে রাখে সামঞ্জস্য;
একটি জলবিন্দু যখন লাভ করে আত্মার শিক্ষা
তার অন্তরে,
সে তার মূল্যহীন সত্তাকে ক'রে তোলে একটি মুক্তা।
* * * * * *
তৃণ যখন পেলো তার আত্মার ভিতরে
বর্ধনের শক্তি
তার আকাঙক্ষা বিদীর্ণ করে দিলো বাগিচার বুক

**　　**　　**

যেহেতু বিশ্ব রয়েছে দৃঢ়রূপে স্থিত
তার আপন ভিত্তিতে
বন্দী চন্দ্র ঘু'রে চলে তার চারদিকে
নিরবচ্ছিন্ন গতিতে।
সূর্যের সত্তা বলিষ্ঠতর
পৃথিবীর চেয়ে
বিশ্ব তাই আপন ভোলা
সূর্যের আখির আলোয়।

**　　**　　**

জীবন যখন শক্তি সঞ্চয় করে
আত্মা থেকে,
জীবন তটিনী বিস্তার লাভ করে
সমুদ্রের মহত্ত্বে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

বিশ্বপৃথিবীতে মানবই একমাত্র জীব যার স্বাতন্ত্র্যবোধ সবচেয়ে বেশী ক্রিয়াশীল এবং স্বীয় আত্মন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী সচেতন। মানব ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইকবালের ধারণা এত প্রচন্ড যে তিনি নিঃসংকোচে সূফীদের নির্বাণ, আদর্শ সমন্বয়, অসীমের সাথে আত্মবিলোপনের আকাঙ্ক্ষার ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সসীম সত্তা তার ব্যক্তিত্বের অপরিবর্তনীয় ঐক্যের দ্বারাই স্বীয় অতীত কার্যকলাপের ভার পৃষ্ঠে নিয়ে অসীম সত্তার সম্মুখীন হবে। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে তিনি এর সমর্থন পেয়েছেন। ইসলামী শরীয়তের বিবেচনায় মানবত্মার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও অতুলনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং সসীম আত্মার নিজস্ব সত্তাকে সীমাহীন পরমাত্মায় বিলীন করে দেয়া নয় বরং সসীমের প্রেমালিংগনের মধ্যে অসীমের গতিপথ নির্মাণ করা হয়েছে। ইকবাল তাই সচেতন আত্ম অস্বীকৃতির এই ইসলামবিরোধী চেতনা সম্পর্কে এবং একই কারণে তিনি ইরানীয় অ-ইসলামী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ সূফীবাদকে মুসলমানদের অবনতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সূফীবাদ থেকে জন্ম নিয়েছিল কর্মবিমুখতা, ঐশীপ্রেমে (মত্ততা) আত্মবিলোপন, দেহ ও মনের মধ্যে পার্থক্যের ধারণা এবং শেষ পরিণতিতে দেহ ও বস্তুকে ভ্রান্তি কল্পনা করা। এই অনৈসলামী সূফীবাদ মুসলিম জগতের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল। এই ধারণাই ইসলামী চিন্তার ক্রমবিকাশে সর্বেশ্বরবাদ নামে পরিচিত এবং এটি সবকিছুকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিলোপ করে দেয়ার শিক্ষা দেয়। এ থেকে ইসলামী চিন্তা-ভাবনা ও মূল্যমানের মধ্যেও ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করতে শুরু করে। এই ভাবধারাকে সংস্কার করবার লক্ষ্যে তিনি কোরআনী শিক্ষা ও মূল্যমানকে সুদূরপ্রসারী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন হিসাবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। সূফীদের নিষ্ক্রীয়তার বিরুদ্ধে তিনি কোরআনে উল্লেখিত কর্মশীলতাই ব্যক্তির কল্যাণময় উজ্জীবনের একমাত্র পথ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে আজীবন প্রচার করে গেছেন নিরন্তর কর্ম ও সংগ্রামী প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই অর্জিত হয় সাফল্য ও শক্তিমান ব্যক্তিত্ব; একই সাথে প্রকৃত শিক্ষার সংযোগে উজ্জীবিত হয় পরিপূর্ণ মানব ইনসান-ই-কামিল।

সূফীদের ধারণা তাই তাঁর কাছে অত্যন্ত গর্হিত, কেননা তারা সাহিত্যে ও কাব্যে মানবাত্মার অসহায়ত্বের কথা করুণ আর্তচিৎকারে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এ ক্ষেত্রে ফারসী কবি হাফিজের

ভূমিকা ছিল সর্বাধিক। ইকবাল তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন–

মদ্য ব্যবসায়ী হাফিজ থেকে সাবধান হও,
তার পাত্রে মারাত্মক বিষ ছাড়া আর কিছুই নেই
এই মাতালদের রাজা আসলে এক মেষ বটেন।
তার গানের সুরে রয়েছে মানুষকে সম্মোহিত
করবার ছলাকলা।
তার মদের পেয়ালা ছুড়ে ফেলে দাও,
ওতে বিষ ছাড়া আর কিছু নেই।

একই কারণে প্লেটোকেও তিনি মেষপালের বৃদ্ধ দার্শনিক হিসেবে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারণ বহুমুখী শক্তি ও প্রকৃতির বিশ্বে তিনি কর্মমুখর জীবনকে অবহেলা করেছেন এবং মানুষের মতো এই প্রকৃতিকে তিনি অতিক্রমের চেষ্টা করেননি। পক্ষান্তরে তিনি কেবল ধ্যানমগ্নতা ও সচ্চিন্তার পথকেই অবলম্বন করেছেন। তার এ পথ কেবল মুক্ত নাগরিকদের জন্যই নির্ধারিত ছিল। ইকবাল তাই এ পথকেও পরিহার করলেন–

প্লেটোর চিন্তাধারা ক্ষতিকে মনে করতো লাভ
দর্শন তাঁর সত্তাকে প্রচার করেছিলো
অসত্তা বলে।

ছিলোনা তাঁর কোন কর্মস্পৃহা
আত্মা তাঁর আনন্দ লাভ করতো
অনস্তিত্বকে নিয়ে।
তিনি অবিশ্বাস করতেন এই বাস্তব বিশ্বকে,
হয়েছিলেন স্রষ্টা অদৃশ্য কল্পনারাজির।
মধুর এই দৃশ্যমান জগৎ
জীবন্ত আত্মার কাছে,
প্রিয় সেই কল্পজগৎ মৃত আত্মার কাছে।

সন্যাসীর আমাদের পলায়ন ছাড়া ছিল না উপায়,
বিশ্বের কল কোলাহল
পারতেন না তিনি সহ্য করতে।

মানবজাতি বিষদুষ্ট হয়েছিলো
তাঁর নেশায়;
তিনি ছিলেন তন্দ্রাতুর,
আনন্দ পেতেন না কোন কর্মে। (আসরার-ই-খুদী, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান

সমকালে মুসলিম জাতির জিল্লতি ও বেদনার্ত চিত্রের প্রেক্ষাপটেই ইকবালের চিন্তা এত প্রচণ্ডভাবে ব্যক্তিত্বের মতবাদের উপর দৃঢ়ীভূত হয়। তিনি লক্ষ্য করেন মুসলিম জাতির পরাজয়, হতাশা কিংবা জাতীয় জীবনে অনগ্রসরতার পশ্চাতে সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে তাদের আত্ম-অস্বীকৃতির পথ অবলম্বনের জন্য ক্রিয়াশীল। সুতরাং ইকবালের চিন্তা কেন্দ্রীভূত হয়

কর্মমুখর এই পৃথিবীতে আত্মস্বীকৃতির ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচার করা। যাতে মুসলিম জাতির মধ্যে নবচেতনার সঞ্চার হতে পারে। জড় শক্তি ও কর্মমুখর এই বিশ্বকে মানবতার কল্যাণ বর্ধনের জন্যই কাজে লাগানো প্রয়োজন। কোরআনের শিক্ষা অনুসারে চারিদিকের পৃথিবীর বাধা বিঘ্ন, আনন্দ বেদনা অতিক্রম করে সাফল্যের মনজিলে মকসুদে হাজির হবে। তবেই আত্মার ক্রমসমৃদ্ধি ও মানব ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভের সুযোগ উন্মোচিত হবে এবং তার জন্য নির্ধারিত হয়েছে মানব জীবনের অব্যাহত পুরস্কার। ইকবালের ধারণায় আত্মা এক অনাবিষ্কৃত শক্তি। এক গোপন রহস্য যা সর্বপ্রকার বাধাসৃজনকারী নবনব অভিজ্ঞতার সম্মুখ দিয়ে ক্রমপরিণতি লাভ করে। এই বাধাবিঘ্নপূর্ণ সংগ্রামের পৃথিবী থেকে পিছিয়ে আসলে ব্যক্তিত্ব সংকুচিত হয়ে আসবে এবং সম্ভাবনাপূর্ণ বিরাট পৃথিবীর দুয়ার তার জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। ইকবাল চেয়েছিলেন মানুষকে নবরূপে গড়তে। তিনি তাই মানুষকে নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হবার তাগিদ দিলেন। এমনকি নিয়তি স্রষ্টার বিরুদ্ধেও। তাঁর হাতিয়ার হলো মানব মর্যাদা–

আমার দিগন্ত বিস্তারী উন্মত্ত তাড়নার সম্মুখে
ফিরিশতা জিবরাঈল একটি সামান্য শিকার মাত্র।
হে মর্যাদাদৃপ্ত মানুষের শক্তিময় প্রকাশ!
তোমার ফাঁস দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ বেষ্টন
করে ধরো।

আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে নিজের অধিকারের দাবিতে নিজ স্রষ্টার মুখোমুখী দাঁড়াতে ইকবাল তাই মানুষকে ডাক দিলেন। পরাধীন জাতি শুনলো সে প্রবাহমান স্বাধীন জীবনের সঙ্গীত–

তোমার মর্যাদাকে এমন উত্তুঙ্গ আসনে অধিষ্ঠিত করো
যাতে নিয়তির ছাপ ফেলবার পূর্বেই
শক্তিধর স্রষ্টা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হন ঃ
হে জীব বলো, তোমার কি ইচ্ছে।

আমিত্বের এই ধারণা আরও বলিষ্ঠভাবে কেমন উজ্জীবিত হয়েছে–

যদিও কণিকা আমি তবু জানি খরপ্রভাব সূর্য সে আমারি,
শত প্রভাতের বহ্নি সংগোপন মোর বক্ষ মাঝে,
জামশীদের পাত্র হতে উজ্জ্বল আমার ধূলি জানে সেই নাম
জন্ম যে নেয়নি আজও ধূলিম্লান ধরিত্রীর বুকে,
হরিয়া এনেছে মোর চিন্তাধারা সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি ছুটে যে আজিও অনস্তিত্ব অন্ধকার হতে। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

আসরার-ই-খূদীর ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় আমিত্বের দুর্জয় ও দুর্নিবার প্রকৃতিকে তিনি নির্ধারণ করেছেন এমনিভাবে–

জীবন হলো একটি আত্মস্থকরণমূলক সম্মুখ গতি। সব বাধাকে আত্মস্থ করে এ নিজের পথ পরিষ্কার করে নেয়। এর অন্তর্নিহিত ধর্ম হলো ঃ অনবরত ইচ্ছা ও আদর্শ সৃষ্টি করে চলা।

আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্যে এ নিজস্ব উপাদান দিয়েই কতকগুলি হাতিয়ার উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন করেছে– যেমন ঃ ইন্দ্রিয়াবলী বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি। এগুলোর সাহায্যেই সে পথের বিঘ্নাবলী আত্মস্থ করে নেয়। জীবনের যাত্রাপথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো বস্তু ও নিসর্গ; কিন্তু তবুও নিসর্গ

(প্রকৃতি) পাপাত্মক নয়। কেননা, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জকে প্রকাশ করে তুলবার বেলায় এর ভূমিকা হলো সহায়ক।...

খূদী তার পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করেই অর্জন করে স্বাধীনতা। খূদী কিছুটা বিমুক্ত; কিছুটা নির্ধারিত। তার পূর্ণতর স্বাধীনতা লাভ হয় পরিপূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্ব স্বরূপ আল্লাহর নিকটতর হয়ে। এক কথায়, জীবন হলো খূদীর স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টা।

জার্মান কবি গ্যাটের একই নামের কবিতার উত্তরে মানুষের জীবনের এই বিরামহীন কামনা, বাসনা, প্রচেষ্টা ও যাত্রার উল্লেখ করেছেন কবি–

আমি কি করতে পারি, যদি আমার প্রকৃতি গৃহের প্রতি
বিমুখ হয়।
আমার আত্মা যদি ভোরের বাতাসের মতো চঞ্চল হয়,
যখন তা ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়?
যখন কোনো প্রেমিক আমার সামনে দাঁড়ায়
আর তার রূপলাবণ্য দিয়ে আমাকে মোহিত করে,
তখনও আমার অন্তর সন্ধান করে ফেরে
অধিকতর লাবণ্যময়ী প্রিয়ার।
স্ফুলিঙ্গের মধ্যে আমি খুঁজি তারকাকে,
তারকাবলীর মধ্যে সূর্যকে–
আমার যাত্রাপথে নেই কোনো সীমা, নেই কোনো যতি,
ইতস্তত তার মানে হলো আমার মৃত্যু।
এক বসন্তের সঞ্চিত সুরাপাত্র ভরে যখন আমি অধরে ধরি,
অনাগত বহু বসন্তের কথা তখন জেগে ওঠে আমার মনে,
তাতে বদলে যায় আমার সঙ্গীতের সুর ও দ্যোতনা–
এবং অশান্ত নয়ন মেলে, অপ্রতিরোধ্য অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
আমি খুঁজে বেড়াই
যার পরিপূর্ণতা নেই তার পরিপূর্ণতাকে। (হুরী ও কবি, পায়াম-ই-মাশরিক)

তার মতে সংগ্রামই হলো জীবন, সংগ্রামের মধ্যেই আসে পরিণতি। প্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের কিংবা আশার আকাশ দিগন্তে উড্ডয়নের নামই জীবন। সুতরাং নিরাপদ নীড় সন্ধান জীবনের স্বভাববিরুদ্ধ। এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

শরগ্রহণযোগ্য বুক থাকলে এ দুনিয়াতে বাজ পাখীর মতো মর আর বাঁচ
জীবনের রীতি নীতিই বা কি?
মুহূর্তের সিংহজীবন শতযুগের ছাগজীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান
তুমি জীবন্ত! তাই আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হও!
যে জগত তোমার অনুকূল হয় না, তাকে চুরমার করে দাও
সৃষ্টিশীল হও, দিগ্বিজয়ী হও,
তোমার পসন্দ মতো জগত সৃষ্টি করো।
সত্য পুরুষ! তীক্ষ্ণ তরবারীর মতো হও!
তুমি নিজেই তোমার জগতের অদৃষ্ট হও।

ইকবাল এসব উৎসাহী বাণী বিভিন্ন উপমা ও উৎপ্রেক্ষার আবরণে তাঁর জাতির নিস্তরঙ্গ কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিয়েছেন, যাতে তাদের জীবনের জড়তা কাটতে পারে। তিনি তাঁর জাতিকে শাহীনের মতো উর্ধাকাশে বিচরণের তাগিদ দিয়েছেন। কারণ এ মৃত্তিকা পিন্ডে খড়কুটা সন্ধানে কি লাভ। জাতিকে তিনি তীক্ষ্ণ তরবারীর সাথে তুলনা করেছেন। তাই তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছেন কোষমুক্ত হয়ে নিজ শৌর্য প্রদর্শন করতে। তার এক কবিতায় শাহবাজ শাবককে উপদেশ দিচ্ছে–

বীর বিক্রমশালী হয়ে বেঁচে থাকো!
ভূপৃষ্ঠস্থ ক্ষুদ্র শস্যকণা সন্ধান করা তোমার জন্য অপরাধ–
কেননা আমাদের খোদার দেওয়া রাজ্য সীমা এ নভোমন্ডলব্যাপী।

আর এক কবিতায় সিদ্ধপুরুষ খিযির, সিকান্দার বাদশাহর কাছে জীবনের গুরুত্ব বিবৃত করছেন বিরামহীন সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে–

সিদ্ধপুরুষ খিযির সম্রাট সিকান্দরকে এক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দানচ্ছলে বলেন ঃ

জল ও স্থলের সকল আবেগ অনুভূতির তুমি সাথী হও,
এ যুদ্ধ-দ্বন্দ্ব তুমি সাগরপারে বসে অবলোকন করছ:
তা ঠিক নয়– বরঞ্চ তুমি রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়,
প্রাণ দিয়ে দাও এবং বেঁচে ওঠো!
তুমি সমুদ্র সৈকতে মঞ্চ নির্মাণ করো না– যাতে জীবনের ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে যায়;
সমুদ্র বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়, উত্তাল তরঙ্গের সাথে মিশে যাও
অনন্ত জীবন নিহিত রয়েছে বিরামহীন সংগ্রামে।

সংগ্রাম ছাড়া জীবনের মহৎ লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয় না এবং যে ব্যক্তির সামনে আশা আকাঙক্ষার উজ্জ্বল দীপমালা মনোরম আলো ছড়ায়না সে জীবিত নয়– সে জীবনমৃত। দৃষ্টিতে যার আদিগন্ত প্রসারতা ডানা মেলে অন্তরে যার সামুদ্রিক স্বপ্ন বিচরণ করে, বাসনা যার নীহারিকার কক্ষপথ অতিক্রম করে সেই বিকশিত মানবের জয়গানে মুখরিত ইকবাল দর্শন–

হে বাজপাখী! তুমি পুষ্পকাননে নীড় প্রস্তুত করেছ,
এতেই তো আমি শঙ্কিত।
কেননা, বাগানের স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহ তোমার উড্ডয়নশক্তি হ্রাস করে দেবে।
তুমি ধূলিকণা হয়ে আছ, এহেন আরাম আয়েশ তোমার নয়
প্রভাত সমীরণের সাথে মিশে যাও, পথপ্রান্তে বসে থেকোনা
নীহারিকার কক্ষপথ অতিক্রম করে যাও,
এমনকি আকাশের নীল ছাউনিটাও পার হয়ে যাও।
মনযিলে বসে থাকলে মনের মৃত্যু হয়– হোকনা সে মনযিল চন্দ্রলোক।

এখন দেখা যাক, ইকবালের খূদী শিক্ষায়তনের কি কি স্তর রয়েছে এবং কি কি গুণাবলী সমন্বিত হয়ে খূদী তার পরিপূর্ণ চেতনার অগ্নিতে ভাস্বর হয়ে উঠতে পারে। আসরার-ই-খূদীতে বর্ণিত হয়েছে মানব চরিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যা খূদীর উন্নয়ন ও বিকাশে গতি সঞ্চার করে থাকে। খূদীর সংহতি আনয়নে এই প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো হচ্ছে–

(১) ইশক (প্রেম)
(২) ফকর (বস্তুবাদী আকর্ষণের প্রতি অনাগ্রহ) এবং
(৩) সাহস ও সৃষ্টিশীল উন্মুখরতা

এটা বলা আবশ্যক ইকবালের বিশিষ্ট চিন্তা ইসলামী দর্শনের আধুনিক পটভূমিতে সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব এবং দর্শনের বিস্তীর্ণ রাজপথে এই খূদী চিন্তার তুলনীয় এবং সমার্থক ভাবনা নেই বললেই চলে। খূদী নিছক প্রকৃতির দান নয়। উপরন্তু এটি অর্জিত হয় মানবের নিরন্তর প্রচেষ্টা, বিরাম হীন নিয়মানুবর্তিতা ও চারিত্রিক স্থৈর্যতার মধ্য দিয়ে। খূদী শিক্ষায়নের এই স্তরগুলো হচ্ছে–

(১) কানুনের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য
(২) আত্মসংযম এবং
(৩) আল্লাহর প্রতিভূত্ব।

আনুগত্যের মর্মার্থ হলো ঃ ইসলামী জিন্দেগীর সুসমন্বিত অনুশাসনের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ। এই সমর্পণের মধ্যে মানুষ নিসর্গকে জয় করবে এবং পার্থিব আকর্ষণ শূন্য হতে পারবে। তাঁর ভক্ষায়–

বশ্যতা অপদার্থ মানুষকে যোগ্যতায় উন্নীত করে
অবাধ্যতা তার অগ্নিকে ভস্মে পরিণত করে।
সূর্য এবং তারকারাজির উপর যিনি আধিপত্য করবেন,
তিনি যেন গ্রহণ করেন কানুনের বন্দিত্ব।

আত্মসংযম অর্জিত হয় ভীতিকে জয় করে এবং লালসাকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং সর্বশেষে আল্লাহর প্রতিভূত্ব হলো মানুষের বিবর্তনের শেষ পর্যায়। এ স্তরে মানুষ নিজের মধ্যে আল্লাহর গুণরাজিকে অবলোকন করে। মানুষ যখন আল্লাহর প্রতিভূত্ব অর্জন করে তখন সে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি এবং এ ক্ষমতাবলে সে সমস্ত পার্থিব জগতের উপর কর্তৃত্ব করবার দাবীদার। তিনি হচ্ছেন পরিপূর্ণ খূদী, মানুষের বিকাশমান জীবনের উন্নততর অভিব্যক্তি। মানবতা বৃক্ষের তিনি হচ্ছেন পরিণত ফল। তার মধ্যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের মানসিক দ্বন্দ্বসমূহ অনুপস্থিত। কারণ বিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তর তিনি অতিক্রম করে গেছেন নির্দ্বিধায় এবং চিন্তায়, কর্মে, মননে ও বোধিতে তিনি উৎকর্ষতার শীর্ষে পৌঁছিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন মানুষের প্রকৃত শাসক; তার রাজ্য আল্লাহর পৃথিবী। তিনি ক্রমাগতভাবে নিজের অন্তর সম্পদকে বিতরণ করে চলেছেন, পাশাপাশি নিজের জন্য তিনি যে পৃথিবী নির্মাণ করেছেন তার কাছে অন্যকেও ক্রমাগতভাবে আকর্ষণ করে চলেছেন। আমরা যতই বিবর্তনের পথ ধরে অগ্রসর হই ততই তার নিকটতর হতে থাকি। এই নিকটবর্তী হওয়ার সময় আমরা জীবনের কল্যাণপ্রদ ও উন্নততর চিত্রের সাথে পরিচিত হই।

ইকবালের একটি বড় কথা হলো খূদীর বিকাশে প্রেমের (ইশক) অবিসংবাদী ভূমিকা। প্রেমের মাধ্যমে খূদী শক্তি অর্জন করে। প্রেম হলো জীবনের শিখা। যে ব্যক্তি প্রেমে পরিণতি লাভ করে তার সম্মুখ থেকে সকল বাধা-বিঘ্ন সরে যেতে থাকে, পার্থিব শক্তিসমূহ তার আয়ত্তাধীন থাকে এবং অস্তিত্বের রহস্যাবলী তার সামনে উন্মোচিত হয়। তার নিকট প্রেম হলো এমন একটা অস্তিত্ব যা বিশ্বজগতের মূলীভূত সব কার্যকারণকে প্রকাশিত করে যেটা স্বাভাবিকভাবে যুক্তির আশ্রয় সম্ভব নয়। প্রাচ্যবিদ নিকলসনের কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি ইশকের গুরুত্ব বিবৃত করেছেন–

This word is used in a very wide sense and means a desire to assimilate, to absorb. Its highest form is the creation of values and ideals and the

endeavour to realize them. love individualizes the lover as well as the beloved.

তাঁর নিজের ভাষায়–

সেই উজ্জ্বল বিন্দু–যার নাম হলো খূদী
এই হলো আমাদের ধূলি দেহাভ্যন্তরের প্রাণ স্ফুলিঙ্গ।
প্রেমের দ্বারা খূদী আরও শক্তিমান হয়,
জীবন্ততর হয়, উজ্জ্বলতর হয়, জ্বলন্ততর হয়।
প্রেম থেকেই আসে এর অস্তিত্বের উজ্জ্বলতা,
এবং এর অজ্ঞাত সম্ভাবনাবলীর বিকাশ।
প্রেম ভীত নয় তলোয়ার বা খঞ্জরের সামনে,
প্রেম সৃষ্ট নয় আব-খাক-বাত-এ।
প্রেমই পৃথিবীতে আনে যুদ্ধ ও শান্তি
প্রেমই হলো আব-ই-হায়াত,
প্রেমই হলো মৃত্যুর ঝকমকে তলোয়ার।

ডঃ শিলা ম্যাকডোনফের ভাষায় ঃ ইকবাল ইশক্কে বোঝাতে চেয়েছেন শক্তিধর দুঃসাহসী ক্ষমতার, আল্লাহর নির্দেশের এবং জীবনের স্বাস্থ্য স্পন্দনের প্রতীকরূপে। সৃষ্টির সর্ব-অভিব্যক্তির কার্যকরী জীবনী শক্তি আসে এই ইশ্ক থেকে। ইকবালের দৃষ্টিতে এই ইশ্কই হলো অনাবিল মানব ব্যক্তিত্বে নিহিত শক্তিমত্তা। অন্যকথায়, যে পর্যন্ত কোন ব্যক্তি আত্মস্বার্থ চিন্তা এবং আত্মচেতনামূলক আশঙ্কাবলী নিয়ে পঙ্গু থাকবে, সে পর্যন্ত সে কোন সৎকার্য সাধন করতে পারবে না। সৃষ্টিধর্মী মানুষ হলো আত্মচেতনামুক্ত মানুষ। সে নিজ পরিধির বাইরেকার সত্যকে গ্রহণে সক্ষম এবং সেই বহিরাগত সত্যের চ্যালেঞ্জে বীরদর্পে সাড়া দেয়। ইশক হলো পঙ্গুতা সৃষ্টিকারী শঙ্কা ও অস্থির আত্মচেতনার বিপরীত।

নিম্নোক্ত কবিতাটিতেও ইকবালের এ ক্ষুরধার ধারণার পরিচয় মিলে–

ইশ্ক হলো জিব্রাইলের নিঃশ্বাস, মুহম্মদের প্রত্যয়পুষ্ট হৃদয়।
ইশ্ক হলো আল্লাহর দূত, আল্লাহর বাক্য,
আমাদের মরণশীল কর্দমও জ্বলে ওঠে ইশ্ক-এর উন্মাদনায়
ইশ্ক হলো নতুন নিংড়ানো সুরা। রাজন্যদের সুরা পাত্র
ইশ্ক হলো জীবনের উষ্ণতা।

ইকবালের বিবেচনায় খূদীর অনির্বাণ ও শাশ্বত চিত্র উন্মোচিত হয় প্রেমের অগ্নিস্পর্শে। প্রেম হচ্ছে এক জীবন্ত কুসুম যা হৃদয়ের জোয়ারে তুফান আনে কিন্তু মানুষকে দেয় অমরত্ব। এটি মানবীয় আবেগকে পরিশীলিত করে উন্নততর জীবন গীতিকার মালা গাঁথে। প্রেম মন্দাকিনীর গভীরতা যত ব্যাপক হবে জীবনের উদ্দেশ্য তত পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। ইকবালের কথায়–

ইশ্ক ফকীরকে পরিণত করে বাদশাহে।

ইকবাল বর্ণিত খূদীর এই গুরুত্বপূর্ণ উপকরণটি নিছক সন্যাসীর দেবপূজার মত নয় কিংবা জৈবিক সুখভোগের আকারে এর অস্তিত্বলাভ ঘটেনি। ইকবালের কাছে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা মানবতাকে সীমাহীন কর্মমুখরতা ও সৃষ্টিশীল আত্মপ্রত্যয়ে উদ্দীপ্ত করে।

ফকর হচ্ছে দ্বিতীয় উপকরণ যা খূদীর বলিষ্ঠতা আনয়ন করে। ইকবালের কাছে ফকর হচ্ছে প্রত্যেক সৎকর্মের পশ্চাতে গতিদীপ্ত এক গৌরবময় শক্তি। সচরাচর উর্দূ কিংবা ফার্সী ভাষায় ফকরকে চিহ্নিত করা হয় এভাবে– জাগতিক আকাঙ্ক্ষা, ঐশ্বর্য কিংবা বস্তুনিচয়ের জাগরণ, পুঞ্জিভূতকরণ ইত্যাদি। ইকবাল প্রচলিত অর্থকে অস্বীকার করে শব্দটির নতুন তাৎপর্য আরোপ করেছেন। পার্থিব ঐশ্বর্যকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, কিন্তু সূফীদের মত জীবন বিমুখ ধারণাকেও গ্রহণ করেননি। জাগতিক বস্তু সমাহারকে প্রত্যাখ্যান নয় বরং এর আকর্ষণকে জয় করবার কথা বলেছেন তিনি। তার ধারণা মানুষ যখন বিশ্ব জয়ের ধারণায় উন্মত্ত তখনও তাকে পার্থিব সম্পদের প্রতি অনাগ্রহ পাশাপাশি তার উপর আধিপত্য বিস্তার করবার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাহলেই জড় সম্পদের দাস হয়ে আত্মার বন্দিত্ব ডেকে না এনে সে এর ক্রমসম্প্রসারণশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং মানুষকে শোষণের যন্ত্রের উপকরণ না বানিয়ে মানবতার এক শান্তি সুখের নীড় নির্মাণ করবে। সে নিজে হবে মানবতার খেদমতগার। এ অবস্থায় ফকর তার কাছে সুদৃঢ় বর্মের মত প্রতিভাত হবে, প্রতি পদক্ষেপে দুর্নীতি, লালসা ও মিথ্যা মোহ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে রাখবে। ক্ষমতার অধিকারী মানুষকে নিবৃত্ত করবে ঔদ্ধত্য ও মদমত্ততা থেকে। পরাধীনতার জিন্দেগী যারা নির্বাহ করছে তাদেরকে রক্ষা করবে অসৎবৃত্তি, পলায়নী চরিত্র ও প্রলোভন থেকে। কেননা, আগ্রাসী ও শাসক সম্প্রদায় শাসিত জাতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে ফেলে। ইকবাল ফকরকে বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বিভিন্ন ধর্মের সন্যাসকে উপমা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, যেহেতু এগুলো মানুষের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি জন্ম দেয়–

জড় বিশ্ব থেকে অপসারণ
লক্ষ্য নয় সত্যিকার সন্যাসের:
লক্ষ্য তার বিজয়
কর্দম ও আলোর সকল সত্তার উপর।
বর্জন করি আমি তোমাদের এ ফকর,
হে কঠোরব্রতী তাপস!
তোমাদের এ ফকর
আর কিছু নয় দারিদ্র্য ও দুঃখ ছাড়া।
যে জাতি হারিয়ে ফেলে
তাইমুরের শৌর্য সম্পদ–
সমভাবে অযোগ্য তারা
ফকর ও সাম্রাজ্যের। (বালে জিবরিল, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইসলামের ইতিহাসে ফকরের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে, যা পার্থিব প্রলোভন, কল্যাণহীনতা ও দুর্নীতিবাজ জীবন বিলাস থেকে মুক্ত–

এক জাতীয় ফকর
শিক্ষা দেয় ধূর্ততা শিকারীকে
অপর জাতীয় ফকর
প্রকাশ করে আধিপত্যের রহস্য;
এক ফকর জাতিকে করে দেয় অবনমিত ও অধঃপতিত,
আর এক ফকর

মৃত্তিকাকে দান করে সুবর্ণের প্রকৃতি।
হোসায়নের স্বভাবসুলভ ফকর
উৎসমুখ আত্মিক ঐশ্বর্যের;
হোসায়নের এই ঐশ্বর্য
মুসলিমের উত্তরাধিকার। (বালে জিবরিল, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

সুতরাং ইকবালের মতামত লক্ষ্যণীয়–

ফকীর যার ফকর হোতে চায়
আলীর ফকরের তুল্য
শ্রেষ্ঠ সে দারা ও সিকান্দার অপেক্ষা। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এই জাতীয় ফকর তৈরি করে চারিত্রিক স্থৈর্য্য ও দৃঢ় মনোবল। ব্যক্তির মধ্যে জন্ম দেয় কর্মোন্মাদনা ও বিশুদ্ধ ভাবনার। এই সকল মানুষের চরিত্র কালিমার উর্ধে থাকে এবং ফক্‌রের গুণে সে সকল মানবিক গুণাবলীতে শক্তিমান হয়ে ওঠে–

জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিশুদ্ধতা
ফকরের লক্ষ্য বিশুদ্ধতা অন্তর ও দৃষ্টির,
আত্মার অসি যখন শানিত হয়
ফক্‌রের শান পাথরে
একটি মাত্র সৈনিকের শক্তি
অর্জন করে বল একটি বাহিনীর। (বালে জিবরিল, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ফকর হচ্ছে ঐশর্যশালী ও শক্তিমানের গৌরব রক্ষার বাহন তেমনি ঐশ্বর্য ও শক্তি যখন নৈতিক অধঃপতনের জন্ম দেয় তার থেকে মুক্তিরও রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করে–

যদি তুমি হও দুনিয়ার অধিপতিদের অন্যতম,
ভুলে যেয়োনা ফকরের মহীমা,
বহু মানুষ–
যারা উপলব্ধি করে সত্যকে
আর রয়েছে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি
তারও দুর্নীতিগ্রস্ত হয় ঐশ্বর্যের আতিশয্যে:
ঐশ্বর্যের আতিশয্য
হরণ করে করুণা অন্তর থেকে
আর এনে দেয় অহংকার
বিনয়ের পরিবর্তে। (জভিদনামা, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের এই বিশিষ্ট মতবাদের তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি যখন আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে পর্যবেক্ষণ করি। কেননা, পৃথিবীতে প্রত্যেকটি মহৎ ও যুগান্তকারী ঘটনার পশ্চাতে আত্মত্যাগ ও ভোগবিমুখতাই ক্রিয়াশীল, বস্তুবাদী কার্যকারণ সেখানে অনুপস্থিত।

তৃতীয় উপাদান হলো সাহস যা জন্ম দেয় বিরামহীন সৃষ্টিশীলতার। প্রকৃতিকে বশে আনবার এ হলো শাণিত অস্ত্র। ইকবালের আত্মচেতনাপূর্ণ মানুষ সাহসী জীবনের প্রত্যয়ে দীপ্ত। কিন্তু এই

প্রত্যয় আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পিত। ইকবালের বিবেচনায় মানুষের জীবনের এই সাহসী কার্যকারণ অবশ্যই শরীয়তের আওতাধীন থেকে, নিয়মানুবর্তিতার কঠোর অনুশাসন ও স্তরগুলি অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হবে কিংবা এটি হবে ভোগ ও শক্তিমত্তার দাবা খেলা। সুতরাং ইকবালের খূদী যে শক্তির সে পরিপূর্ণ হবে তার উৎসমূল শরীয়তের দোর গোড়া স্পর্শ করবে।

ইকবালের ভাষায়–

সাহসী জিন্দেগীর অর্থ হলো
সর্ব অবস্থায় হককে বুলন্দ করা (বালে জিবরিল)

এমনিভাবে ইশ্ক, ফকর ও সাহসী জীবনের সমন্বয়ে খূদী হয়ে উঠবে সমৃদ্ধশালী, কর্মমুখর। এই সমৃদ্ধিশীলতা যদি না থাকে তবে হবে খূদীর মৃত্যু। মানুষের মধ্যে যে স্বর্গীয় দীপ্তির জাগরণ ঘটে তা এই খূদীর সমৃদ্ধিশীলতার জন্যই।

খূদী হলো তাই মানুষের জীবনের কর্মোদ্দীপনা, সাহস ও শক্তির বীনা। এ হলো জীবন বিহীন অকর্মন্য পৃথিবীর সঞ্জীবন সুরা। পক্ষান্তরে দারিদ্র্য, ভীতি এবং দাসত্ব হলো খূদীর ঘাতক যা কি-না জীবনে পরাজয়ী মনোবৃত্তির জাগরণ ঘটায় এবং পরিণতিতে জাতীয় বিপর্যয়েরও সূচনা করে। তিনি এক কবিতায় (মারগ-ই-খূদী– আমি'র মৃত্যু) উল্লেখ করেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অধঃপতনের পশ্চাতে একমাত্র কারণ হলো খূদীর মৃত্যু–

আমি'র মৃত্যুতে হোল অন্ধকার পাশ্চাত্য হৃদয়,
আমি'র মৃত্যুতে সারা প্রাচ্যদেহ কুষ্ঠব্যাধিময়।
আমি'র মৃত্যুতে আত্মা আরবের নিস্তেজ শীতল,
ইরাক ও আজমের পক্ষাঘাত সে মৃত্যুর ফল।
ভারতের পাখা আজ ছিন্ন ভিন্ন আমি'র মৃত্যুতে,
পিঞ্জরে সে সুখী, তাই মুক্ত নীড় দেখে না উঁচুতে।
কাবার সর্দার হায় আমি'র মৃত্যুতে হোল খাক,
বেচা কেনা করে খায় মুসলিমের মাহাত্ম্য পোশাক। (যরবে কলীম)

কবিতাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য পুরো রাজনৈতিক এবং তিনি বিশ্বাস করেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত খূদীর কার্যকারিতা থাকে না। খূদীর প্রকাশ শক্তিতে এবং তা অনিবার্যভাবে রাজনীতির সাথেই জড়িত। ইকবাল বিশ্বাস করেন শক্তি হলো দিব্যদৃষ্টির মতো তাৎপর্যময় এবং মূল্যবান। কেননা শক্তি ব্যতীত দৃষ্টির সীমা প্রসারিত হয় না।

ইকবাল দর্শনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উল্লেখ করেছি। তমসাচ্ছন্ন এই পরাধীন যুগে খূদীর প্রচণ্ড গতিময়তার প্রয়োজন হয়েছিল বড় বেশী এবং তাঁর দর্শনের জাগরণী বাণীতে তাঁর দেশবাসী সকল দ্বিধা কাটিয়ে, সকল হতাশামুক্ত হয়ে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইকবাল নিজেই ছিলেন তাঁর পরিকল্পিত পরিপূর্ণ মানব ইনসান-ই-কামিল। কবির ভাষায় তিনি নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন নবোদিত এক গৌরবোজ্জ্বল সূর্যরূপে–

আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি এক নতুন সূর্যরূপে
আমি আমার চালচলন ও ধরন-ধারণ শিক্ষা করিনি আকাশ থেকে।
আমার প্রত্যুষ পূর্ব গগনে দেখা দিয়েছে এবং রাত্রিকে পরাভূত করেছে–

পৃথিবীর গোলাবের ওপর একটি তাজ। শিশির বিন্দু দেখা দিয়েছে
আমি সে সব ভক্ত জনের অপেক্ষা করছি যারা প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করে–
আহা! তারাই সুখী যারা করে আমার অগ্নির উপাসনা
আজকের শ্রোতায় আমার কোনো প্রয়োজন নেই–
আমি হলেম আগামী কালের কবি কণ্ঠ।
আমার গান অন্য এক পৃথিবীর– এদের পৃথিবীর নয়।
এ ঘন্টাধ্বনি ডাকছে অন্য জগতের পথ যাত্রীদেরকে।

ইকবাল ছিলেন ইতিহাসের নায়ক। ইতিহাসের গতিকে তিনি টেনে ধরেছিলেন এবং সেই ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়েও ধরেছিলেন। তার দর্শন মুসলিম মানসে নতুন সৃষ্টির জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। পার্থিব জগতের শক্তিসমূহকে নিজের কর্তৃত্বে এনে তার উপর আপন মহিমার অনুপম স্বাক্ষর রাখবার মতো জাগ্রত মানবের উজ্জীবন তিনি কামনা করেছিলেন যার খূদী হবে শক্তিমান, মহিমান্বিত ও আল্লাহকে উদ্দেশ্য করেই শোনাতে পারবে স্বীয় অস্তিত্বের গান। ইকবাল এই গৌরবদীপ্ত মানবের অভিনন্দন বাণী রচনা করেন এমনিভাবে–

তুমি তৈরী করেছ রাত্রি, আমিতো
জ্বেলেছি আলোক
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম
পান পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি, পর্বত অরণ্য,
আমার হল তৈরী ফুলের কানন,
গোলাপ, ফলের বাগান।
আমি সে, যে পাথরকে করে দেয় আয়না
বিষ হতে যে বানায় মধু। [অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী]

এই প্রচন্ড গতিশীলতা, মরমী দৃষ্টি এবং সৃষ্টিশীলতার মিশ্রণে তিনি যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করলেন মানবিকতার আসমান জুড়ে তা এক কল্যাণপ্রদীপ হয়ে জ্বলছে।

ইকবালের ইনসান-ই-কামিল

ইকবাল দর্শনের যে উন্মুখর চেতনা তার সম্পূর্ণ অবয়ব তাঁরই পরিকল্পিত ইনসান-ই-কামিলের মধ্যে অস্তিত্বলাভ করেছে। এক দুর্জয় মহাসামুদ্রিক বলিষ্ঠতাকে লালন করে ইকবাল তার অভূতপূর্ব জীবন দর্শনের চিত্রাবলী মানবতার সামনে হাজির করেছেন। সংশয়-সংক্ষুব্ধ এবং নৈরাজ্য কবলিত পৃথিবীতে ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে এক কল্যাণ সূর্যের স্পন্দন। ইকবালের পরিপূর্ণ মানবের ধারণার উৎস হচ্ছে মহাগ্রন্থ আল-কোরআন। কেননা ইসলাম বিশ্বাস করে মানুষের মধ্যে রয়েছে অপরিসীম সৃষ্টিশীলতা, অগ্রসরমান জীবন চেতনা এবং সীমাহীন কল্যাণ ভাবনা। মানুষ হচ্ছে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি; তারই মধ্যে রূপ লাভ করেছে বুদ্ধিবৃত্তি ও আধ্যাত্মিকতার নীলা পাথর। আল্লাহ তাই তাকে মনোনীত করেছেন পৃথিবীর খলিফা হিসেবে। মানুষের এই খেলাফত প্রাপ্তির মধ্যে যে মহান দায়িত্ব ও অভূতপূর্ণ সম্মান নির্ধারিত হয়েছে ইকবালের ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে তারই সমন্বয়। তার এক কবিতায় তিনি বলেছেন–

মুমিনের রহস্য হচ্ছে শোন
যদিও তাকে মনে হয় নিছক কোরআনের হেফজকারী
কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে-ই হচ্ছে জীবন্ত কোরআন।

পরিপূর্ণ মানবের ধারণা মুসলিম দার্শনিকদের চিন্তা জগতে নবোদিত চন্দ্রের কিরণচ্ছটার মতো সর্বদা জ্বলজ্বল করেছে। এদের মধ্যে আব্দুল করীম আল জিল্লী এবং মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীর অভূতপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক ধারণাসমূহ মুসলিম দর্শনকে গৌরবোজ্জ্বল স্থানে উন্নীত করেছে। জিল্লী ও আরাবী উভয়ই ছিলেন সর্বেশ্বরবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী। জিল্লী তাঁর গ্রন্থ 'আল ইনসান আল কামিল ফি মাআরফাতিল আওয়াখির ওয়াল আওয়ায়েল'-এ এই ধারণা বিবৃত করেছেন মানুষ হচ্ছে এক নিজস্ব সত্তা এবং প্রকৃতিগত ভাবে সে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ও বিশ্বজগতের মূর্তিমান প্রতিচ্ছবি। সে হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টা ও পার্থিব জগতের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র বন্ধন। ইউসুফ হুসায়েন খান জিল্লীর এ ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে–

Man is an entity by himself and is a manifestation of both God and Universe. Man is the main objective behind the creation of the entire Universe, because no other creation has the requisite qualities to mirror the truly divine characteristics. The Holy Prophet is the supreme example of the perfect man and anybody treading the path of life in the light of his character is sure to achieve the highest ideal which life is capable of bestowing upon man. (Ruh-i-Iqbal, Yousaf Hussain Khan)

একইভাবে মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবীও বিশ্বাস করেন মানুষের মধ্যে স্রষ্টার অনুভূতিই তাকে পরিপূর্ণ মানবে রূপান্তরিত করতে পারে। সমভাবে পরিপূর্ণ মানবের মধ্যে খোদা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও অনুধাবন করেন। এ. ই. আফিফী ইবনুল আরাবীর দর্শনের এমনিতর পরিচয় দিয়েছেন–

Ibn-i-Arabi's Pantheism is not a materialistic view of reality. The external world of Sensible objects is but a fleeting shadow of the Real (al-Haqq), God. It is a form of a cosmism which denies that the phenomenal has being or

meaning apart from and independently of God. It is not that cold blooded pantheism in which the name of God is mentioned for sheer courtsey; or, at the most, for logical necessity or consistency. On the contrary, it is the sort of pantheism in which God swallows up every thing and the so called other than God is reduced to nothing. God alone is the all embracing and eternal reality. (A.E. Affifi in a History of Muslim Phliosophy Vol-I edited by M. M. Sharif)

ইবনুল আরাবী রাসূল (সঃ)-কে পরিপূর্ণ মানব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাঁর ধারণায় রসূল জাগ্রত হয়েছেন এভাবে–

The entity Mohammad combining in itself both the spirit of Muhammad and Muhammad the man, is for Ibn Arabi the link between the eternal and the temporal, the real and the phenomenal. While Muhammad the man was born, was active and died in time, the spirit of Muhammad exists in all eternity. (Tom Landau, The Philosophy of Ibn Arabi)

ইকবাল সূফীবাদের এই গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করেছেন কিন্তু মানবজীবনের জন্য এটি কোন কার্যকর উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেননি। রাসূল (সঃ)-কে তিনি মূর্ত করেছেন এক শক্তিমান সৎকর্মশীল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর কল্পিত পরিপূর্ণ মানব হচ্ছে এক মুমিন যে তার আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রক এবং পরিপূর্ণতার শীর্ষে পৌঁছনোর চেষ্টায় অবিরত মগ্ন। ইকবালের মুমিন কোন আধ্যাত্মিক চরিত্র নয়। তিনি তাকে খোদায়ী চেতনা ও বৈশিষ্ট্যে নিমজ্জমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করেননি। তিনি মনে করেন, প্রকৃত বিশ্বাসী ব্যক্তিত্ব এই ধারণা পোষণ করেন আধ্যাত্মিক ও মানবিক উন্নতির দুয়ার উন্মোচিত হয় কেবলমাত্র খোদায়ী ইচ্ছার প্রতিপালনের মধ্যে। এই ধারণার সমর্থন মেলে কোরআনুল হাকীমে, যেখানে রাসূল (সঃ)-কে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর দাস হিসেবে। ইকবাল তাই বলেন–

তোমার অস্তিত্বকে তুমি বিকিয়ে দিয়োনা
খোদার মহিমার কাছে ।।

উপরোক্ত কবিতার অর্থ হলো পরিপূর্ণ মানব খোদায়ী জাতকে অর্জন করবে কিন্তু কখনো খোদার মধ্যে নিজের স্বাধীন অস্তিত্বকে মিশিয়ে দেবেনা। ইবনুল আরাবীর সর্বেশ্বরবাদী চিন্তার সাথে ইকবালের এখানেই পার্থক্য। তাঁর আর এক কবিতায় তিনি মুমিনের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছেন। প্রকাশের ভঙ্গি এত চিত্তাকর্ষক ও মনোগ্রাহী যেন কোন নিপুণ চিত্রকর তার তুলির আঁচড়ে টেনে আনছেন অমলিন সৌন্দর্যের বিভা–

মোমিনের হস্ত–
সেতো আল্লাহরই হস্ত–
আধিপত্যশীল, সম্পদশালী, সৃষ্টিধর্মী,
সাফল্য আনয়নকারী;
মৃত্তিকা থেকে জাত
তবু সে জ্যোতির্ময় প্রকৃতিতে,
সৃষ্টি সে স্রষ্টার গুণে সমৃদ্ধ।
উদাসীন তার অন্তর
উভয় বিশ্বের সম্পদে;

আকাঙ্ক্ষা তার অতি অল্প,
কিন্তু উদ্দেশ্য তার বিরাট,
পথ তার মহিমাময়,
আর দৃষ্টি মুগ্ধকর;
বাক্যে সে মৃদু আর উষ্ণ অনুসন্ধানে,
অন্তর ও মন তার
যেমন বিশুদ্ধ সংগ্রামে
তেমনই শান্তিতে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবাল দর্শন পাঠে আমাদের মধ্যে ইনসান-ই-কামিলের একটি ধারণা চিত্ররূপময় হয়ে ওঠে, পাশাপাশি ইনসান-ই-কামিলের মধ্যে কি কি গুণের সমাবেশ হওয়া প্রয়োজন তারও একটি ধারণা আমাদের মনের মুকুরে অস্তিত্ব লাভ করে।

প্রথমত মুমিনের জীবনকে তিনি বিবেচনা করেছেন গতিশীল ও কর্মপ্রবণতার আলোকোজ্জ্বল রশ্মি হিসেবে। কর্মবিমুখ, নিশ্চল এবং সংগ্রামবিহীন জীবন তার কাছে অর্থহীন। এই কর্মশীলতার প্রকৃতি হবে সৃষ্টিধর্মী ও মৌলিক। কারণ মানুষের সৃষ্টিশীল চেতনা তাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং অসম্পূর্ণ বিশ্বকে সমৃদ্ধশালী করে তোলে। প্রকৃত মুমিন তার জিন্দেগী নির্বাহ করে পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ রেখে এবং স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকে দেয় নবতর গতিশীল রূপ। আসরার-ই-খূদী কাব্যে কবি হযরত আলীর (রাঃ) নামসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি ইনসান-ই-কামিলের সক্রিয় গুণরাজির একটি রেখা চিত্র অংকন করেছেন–

এই বিশ্বের বুকে যে কেহ হোতে পারে বু তোরাব,
ইংগিতে তার সূর্য উদিত হয়
পশ্চিম গগন থেকে;
আত্মজ্ঞান দ্বারা
তিনি কর্ম করে যান আল্লার হস্তের,
আর আল্লার হস্ত হয়েই
শাসন চালিয়ে যান সকলের উপর।
যদি তুমি পান কর স্বচ্ছ সুরা
তোমার আপন দ্রাক্ষা থেকে,
তোমায় প্রভুত্ব করতেই হবে
তোমার আপন মৃত্তিকার উপর।
কমনীয় তুমি গোলাবের মতো,
কঠিন হয়ে ওঠ প্রস্তরের ন্যায়,
যেন তুমি হোতে পার জান্নাতের প্রাচীর ভিত্তি।
তোমার কর্দমকে পরিণত কর একটি মানবে,
তোমার মানবকে পরিণত কর বিশ্বে।
যদি তুমি নির্মাণ না কর প্রাচীর অথবা দ্বার
অপর কেহ নির্মাণ করবে ইষ্টক
তোমার মৃত্তিকা থেকে।

জাগ্রত হও, সৃষ্টি কর নতুন জগৎ
আবৃত কর আপনাকে অনল শিখায়
হয়ে ওঠ ইবরাহীমের মতো।
এই বিশ্বের সাথে তাল রেখে চলা–
যে ভালোবাসেনা তোমার সংকল্পকে–
সে শুধু নিক্ষেপ করা বর্ম
সমরক্ষেত্রের মধ্যে।
সবল চরিত্র মানব–
যে প্রভু তার আপনার,
লাভ করে সৌভাগ্য অপরিমাণ।
যদি বিশ্ব না মেনে নেয় তার খেয়াল,
সে পরীক্ষা করবে যুদ্ধের দুর্ঘটনাকে
স্বর্গের সাথে।
তার আপন শক্তিতে
সে সৃষ্টি করবে একটা নবীন বিশ্ব
যা' চলবে তার খুশীতে।
যে বেঁচে থাকতে পারেনা এই বিশ্বের বুকে
মানুষের মতো,
তার বীরের মতো মৃত্যুবরণই শ্রেয়।
জীবনের কাছে একটি মাত্র নিয়ম
জীবন শক্তির প্রকাশ–
আর তার মূল উৎস বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা।
জীবন বীজ আর ক্ষমতা তার ফসল,
ক্ষমতা বুঝিয়ে দেয় সত্য মিথ্যার রহস্য।
ওগো অসাবধান যারা তোমাদের প্রতি পদ ও বিশ্বাসে
বিশ্বাস কর নিজেদেরকে
উভয় বিশ্বের সেরা ব'লে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

দ্বিতীয়ত মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে প্রকৃতির অনন্ত শক্তিকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে স্বীয় মেধা ও মননকে ব্যবহার করা। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ছাড়া প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতার কাছে সে পরিণত হবে করুণার পাত্রে। বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরকে সাহস যোগায় ঠিক, কিন্তু মানবতার বৃহত্তর কল্যাণে একে নিয়োজিত করা যাবে তখন যখন তা নিয়ন্ত্রিত হবে প্রেম দ্বারা। ইকবালের ধারণায় উজ্জীবিত এই প্রেম কোন মানসিক আবেগ নয়। এ হলো এক সক্রিয় শক্তি যা মানবীয় প্রচেষ্টাকে অধিকতর গতিবান করে তোলে; মানব ব্যক্তিত্বকে উন্নীত করে সীমাহীন মর্যাদার আসনে। এ অবস্থায় মুমিন যুক্ত হয় খোদার সাথে একই সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টায়। প্রকৃত মুমিন জীবন ধারণ করে আল্লাহরই জন্য। আল্লাহর ইচ্ছাকে বুলন্দ করবার জন্য নিজে জীবনবাজি রাখে এবং এমনিভাবে নিজেকে তৈরী করে আল্লাহর খলিফা হিসাবে। পৃথিবীতে স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মুমিনকে তাই নানা ধরনের জিহাদে শামিল হতে হয়। এই জিহাদ স্বীয় প্রবৃত্তির দিক থেকেও হোতে পারে কিংবা বহির্জগতের নানা ধরনের অন্যায়, অবিচার ও বেইনসাফীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার মত প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিতে পারে। এই ধরনের জিহাদ স্বাভাবিকভাবে মুমিনকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধ অধিকতর

আত্মপ্রত্যয়ী ও সংগ্রামী। এর ফলে বর্ধিত হয় তার অন্তর্সম্পদ যা কি-না তাকে সকল দুর্নীতি ও অকল্যাণকে বর্জন করতে অনুপ্রাণিত করে এবং সকল সামাজিক দুর্দৈবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার শক্তি যোগায়। এমনিভাবে মুমিন তার সকল আস্থা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্রীভূত করে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করে এবং নিজে স্রষ্টার সৃষ্টিশীল জীবন বিন্যাসের একটি অংশে পরিণত হয়–

'বান্দায়ে হক' নির্ভরশীল হয় না
অবস্থার কাছে:
জীবন নয় ঘন্টা দোলকের আবর্তন।
মুসলিম যদি তুমি
শিক্ষা কর আত্মনির্ভরতা
হও তুমি অবিমিশ্র আশীর্বাদ
বিশ্বের সকল জাতির কাছে:
সন্ধান করো না তোমার জীবিকা
নীচমনার হাত থেকে।
ইউসুফের মতো তুমি:
সুলভ করো না আপনাকে।
হেলায় উপেক্ষা কর তুমি
কায়-কাউসের সাম্রাজ্য
কোরবান কর তোমার শির,
তবু কোরবান করোনা তোমার সম্মান।
সেই মানুষই তুলনাহীন–
যে জানতে শেখে তার আপনাকে,
সেই কওমই সত্যিকার কওম
যে আপোষ করেনা অপরের সাথে।
শিক্ষা কর মোস্তাফার বাণীর তাৎপর্য
বর্জন করো সকল আরাধ্য
এক আল্লাহ ছাড়া। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের মতে, এই আদর্শ মানব সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় তিনটি গুণ আয়ত্ত করা ঃ সাহস, পরমত সহিষ্ণুতা এবং ফকর।

সাহস হলো পরিপূর্ণ মানবের জীবন চর্চার আবশ্যকীয় উপাদান। উপরন্তু ভীতি তার কাছে মানব জীবনের পরিশীলতা ও পরিচ্ছন্নতা আনয়নের বিরুদ্ধে এক চরম প্রতিবন্ধক। প্রেম যেমন আত্মাকে পরিচ্ছন্ন ও সাহসী করে, ভীতি তেমনি আত্মাকে করে অবদমিত। এই আত্মা তখন মানবচরিত্রের কলংক হিসেবে বিবেচিত হয়। আল্লাহর ভীতি ব্যতীত অপর সব রকমের ভীতি যাবতীয় খারাবীর জন্ম দেয়। ইকবাল মনে করেন, একমাত্র তাওহীদই পারে মানুষকে ভীতিমুক্ত জীবন নির্বাহে উৎসাহ যোগাতে। তাওহীদের অর্থ হলো আল্লাহকে ভয় করা ব্যতীত বিশ্বজগতের যাবতীয় শক্তিকে নির্ভয়ে উপেক্ষা করা যা মানুষের স্বাধীন গমনাগমনে কিংবা কল্যাণ যাত্রার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভীতি থেকেই জন্ম নেয় সবরকমের অন্যায় ভাবনা যা মানবীয় সংহতিকে দুর্বল করে; জীবনের সকল সৌন্দর্য হরণ করে। সুতরাং তওহীদ হচ্ছে এক সুদৃঢ় বর্ম যা মুমিনকে সকল প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা যোগায়–

প্রেম দগ্ধ করে দিক সকল ভীতি

ভয় কর কেবল আল্লাহকে
আর বেঁচে থাক সিংহের মতো;
আল্লার ভীতি ঈমানের প্রারম্ভ
আর অপরের ভীতি হচ্ছে
অবগুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা;
মুক্ত কর নিজকে
অপরের ভীতি থেকে
তুমি এক ঘুমন্ত শক্তি;
জাগ্রত করে তোল আপনাকে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

অন্যত্র ইকবাল বলেছেন–

ওগো যারা আছ বন্দী
ভীতির জিন্দান খানায়
শিখে নাও মহানবীর নির্দেশ ঃ
ভীত হয়ো না।
যদি তুমি ঈমান রাখ আল্লাহতে
মুক্ত কর আপনাকে সকল ভীতি থেকে
আর লাভ ক্ষতির সকল আশঙ্কা থেকে;
'গায়রুল্লাহর' ভীতি
পশ্চাৎমুখী করে কর্মকে
সেই তো দস্যু–
রাহাজানি করে জীবনের কাফেলাকে;
যখন তার বীজ রোপিত হয়
তোমার ক্ষেত্রে,
জীবন হয় পশ্চাৎমুখী আত্মবিকাশ থেকে;
যে কেহ উপলব্ধি করেছে মুস্তাফার শিক্ষা
দেখেছে পৌত্তলিকতা বিরাজমান
ভীতির বুকে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের পরিকল্পিত পরিপূর্ণ মানবের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। কারণ ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্বারোপকারী চিন্তাধারার বিকাশের জন্য চাই সুস্থ সুন্দর সামাজিক পরিবেশ। কারণ, অনেকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে হলে যদি পরমতসহিষ্ণুতা না থাকে তাহলে এক অনিবার্য সংঘর্ষের পথে সবাই এগিয়ে যাবে এবং আত্মবিকাশের ধারণা পরিণত হবে নিছক প্রহেলিকায়। ইকবাল বলেন ঃ কর্মপ্রবণ আত্মার নীতি হচ্ছে নিজস্ব আত্মমর্যাদাবোধ ও অপরের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাপোষণ।

ইকবালের এই সহিষ্ণুতা শক্তিতে; দুর্বলতার মৃত্তিকায় এর জাগরণ ঘটেনি। বলিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তির সহিষ্ণুতা এমন, সে তার বিশ্বাস বোধ থেকেই উপলব্ধি করে অপরেরও বিশ্বাস পোষণ করা এবং তা কার্যকর করার ধারণা একটি ন্যায়সঙ্গত অধিকার। ইকবাল মনে করেন, মুমিন পোষিত এ সহিষ্ণুতার ধারণা একান্তই ধর্মীয়। কোন প্রত্যয়বিহীন মূল্যবোধ থেকে এর জন্ম লাভ সম্ভব নয়–

ধর্ম হচ্ছে চিরন্তন আকাঙক্ষা
পূর্ণতা লাভের জন্য;
আরম্ভ তার ভক্তিতে

আর সমাপ্তি প্রেমে।
কঠোর বাক্য উচ্চারণ পাপ,
কারণ কাফের ও মোমেন
উভয়ই হচ্ছে খালকে খোদা।
আদমিয়াত কি?
মানবের প্রতি শ্রদ্ধা
শিক্ষা করো উপলব্ধি করতে
মানবের মর্যাদা
প্রেমিক মানুষ শিখে নেয় আল্লার পথ;
সম উদার সে
মোমেন ও কাফেরের কাছে;
গ্রহণ করো কুফর ও দীন কে
সমভাবে তোমার অন্তরে।
যদি অন্তরই দূরে সরে যায় অন্তর থেকে,
অভিশাপে পূর্ণ হয় মানব অন্তর
অন্তর নিঃসন্দেহে কারাবন্দী
জল ও কর্দমের কয়েদ খানায়
কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জগতে রয়েছে
অন্তরের আধিপত্য। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবাল মুমিনের তৃতীয় গুণ হিসেবে ফকরের উল্লেখ করেছেন। 'ফকর' হচ্ছে সেই গুণ যা মুমিনকে জড় বিশ্ব জয় করতে উৎসাহ যোগাবে, কিন্তু নিজে পরিণত হবে না জড় বিশ্বের দাসে।

এখন আমরা ইকবালের বিবেচিত ও পরিকল্পিত ইনসান-ই-কামিলের একটি সুনির্দিষ্ট আকৃতি নির্মাণ করতে পারি। ইনসান-ই-কামিল হচ্ছে সেই মহাশক্তিমান মানব যে সমস্ত শক্তিকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত করে আল্লাহর রাজ্যের প্রতিনিধিতে পরিণত হবে। পারিপার্শ্বিকতার সাথে সংযোগ রক্ষা করে সে তার ব্যক্তিত্বকে প্রচণ্ড গতিবান করে তুলবে এবং জড় বিশ্ব তার আয়ত্তাধীনে পরিণত হবে। এ অবস্থায় একজন বিজয়ীর ভূমিকায় দাঁড়িয়েও তার চারিত্রিক স্খলন ঘটবে না কিংবা কোন প্রলোভন তার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করবে না; কেননা তার নৈতিকতা স্বপ্নাতীত উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। তার মর্যাদাই তাকে আল্লাহর ক্রমসম্প্রসারিত জীবন চেতনার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সে তখন শুধু সহিষ্ণুতার আদর্শ অনুসরণে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না; অন্যের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য যে কোন আত্মত্যাগ স্বীকারেরও অঙ্গীকার করবে।

যে সব কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী মানবতার বিপর্যয়কে প্রকট করে তোলে তার বিরুদ্ধেও ইনসান-ই-কামিল হবে সোচ্চার। ইকবালের কাছেএই পরিপূর্ণ মানব এমন এক মুমিন যার সাথে একজন কাফেরের পার্থক্য শুধু ধর্মীয় পার্থক্যই নয়; জীবনের উপর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও। তাহল সে তার সমগ্র শক্তির বিকাশে পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে কিনা; যদি করে তবে ঐশী ইচ্ছার পূর্ণতা সাধনে কতখানি খরচ করেছে–

মুসলিম যদি হয় কাফের,
তার না হয় শাহী, না হয় ফকিরী;
যদি সে হয় সত্যিকার মোমেন,
ফকির হয়েও সে করে যায় শাহী কর্তব্য

সৈনিক যদি হয় কাফের
ভরসা করে সে শমশেরের উপর:
আর সে যদি হয় মোমেন
সে লড়াই করে যায় তেগ্ ব্যতীত।
মুসলিম যদি হয় ঈমান বর্জিত.
সে তখন তকদীরের দাস:
যখন সে মোমেন
সে পরিণত হয় তকদীরে ইলাহীতে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

কবি তাঁর যরবে কলীমে কাফির ও মুমিনের পার্থক্যকে আশ্চর্য সুন্দর দীপ্তিতে রঙিন করে তুলেছেন–

কাফেরের পরিচয় ঃ সে হারিয়ে ফেলে
আপনাকে বিশ্বের বুকে.
আর বিশ্বজগৎ যায় হারিয়ে
মোমেনের মাঝে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এমনিভাবে কবি তার জাভিদনামায়ও নেদায়ে জামাল মানবতার প্রতি সত্য ও সুন্দরের পথে আল্লাহর আহ্বানকে মধুর করে তুলেছেন– যেখানে তাকে জীবনের মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি তা যেমন তাকে হৃদয়ংগম করতে হয় তেমনি তাকে নিয়োজিত হতে হয় মানবতার সেবায়–

অতিক্রম করে যাও প্রাচ্যের সীমানা,
প্রতিরোধ কর পাশ্চাত্যের যাদু.
এইসব প্রাচীন ও নবীন
রাখেনা একটি শস্যকণারও মূল্য!
যে রত্ন বিনিময় করেছো তুমি
অন্ধকারের মানুষদের সাথে.
এত দামী– যা আমানত রাখা যায় না
জিবরাইলের কাছেও।
জীবন আত্মপ্রত্যয়শীল
আর সে সৃষ্টি করে তার আপন মজলিস:
ওগো কাফেলার সঙ্গী
চলো সবার সাথে.
স্বাধীন থাক সকলের থেকে।
দীপ্ততর তুমি
দীপ্তিমান চন্দ্র অপেক্ষা:
থাক জীবন্ত হয়ে.
যেনো প্রতি পরমাণু লাভ করে তোমার দীপ্তি। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এমনি যে কবি আজীবন মানবতার কল্যাণকামিতার গান গেয়েছেন, নৈরাশ্যের গহীন অন্ধকারেও আশার দেয়ালি জ্বেলেছেন. ইনসান-ই-কামিল পরিপূর্ণ মানবের স্বপ্ন-সঙ্গীতও হল তাঁর মানবতারই আনন্দ কুসুম।

ইকবালের আদর্শ সমাজ

ইকবাল দর্শনের চিত্ররূপময় কারুকার্যের একটি পূর্ণতর পরিচয় পেতে হলে তাঁর সমাজদৃষ্টি ও জীবন ভাবনার একটি সুসমন্বিত সমীকরণ আমাদের টানতে হবে। ইকবাল যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ব্যক্তির বিকাশের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছেন তারই ক্রমসম্প্রসারিত একটি দিগন্ত এসে মিশেছে তাঁর সমাজভাবনার মধ্যে।

সন্দেহাতীতভাবে ইকবাল ছিলেন বড় মাপের দার্শনিক। তাঁর অপরিসীম প্রতিভার দীপ্তিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন মহৎ মানবিক চেতনার পরিস্ফুটনের জন্য।

ইকবাল শুধু মুসলমানের কবি নন। তিনি মানবতার কবি; বিশ্বমানসেরও কবি। তাই বিশ্ব সমাজের, যে কোন সমস্যাই তাকে পীড়িত করে; উদ্বেলিত করে। জীবন সমস্যাকে তিনি মানবিকতার সমস্যা হিসেবেই বিবেচনা করেন; কোন সাম্প্রদায়িক কিংবা গোত্রীয় তাৎপর্য হিসেবে নয়।

খূদী বা ব্যক্তির বিকাশ তিনি কামনা করেছেন তাঁর চলিষ্ণু জীবনের জন্য। খূদীর এই চলিষ্ণুতা তাঁকে করে আল্লাহর নিকটতর। কিন্তু সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই; ঠিক তেমনিভাবে সুষ্ঠু ও কল্যাণকর সমাজ ব্যবস্থা ব্যতীত পূর্ণ পরিণত ও কল্যাণপ্রদ ব্যক্তির উজ্জীবনও সম্ভব নয়।

ইকবাল তাঁর রমূযে বেখূদীতে এই পরিকল্পিত আদর্শ সমাজের নীতিমালা পেশ করেছেন এভাবে–

১. মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমিরূপ তাওহীদ

২. তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্যে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব

৩. সমাজকে পরিচালনা করবার জন্যে একটি মৌলিক নীতিমালা

৪. একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রস্থল

৫. একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি সমাজের সদস্যবৃন্দকে পরিচালনে উদ্যম সঞ্চারের জন্যে একটি যথাযোগ্য আদর্শ যা সাথে সাথে তাদের মধ্যে একাত্মবোধ ও সুসমাঞ্জস্য বিধান করবে এবং

৬. প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তে আনয়ন। তাঁর মতে, যে সমাজ এই নীতিমালা অনুসরণ করবে তার অন্তর্গত সত্তা অধিকতর বলিষ্ঠ ও গতিবান হয়ে উঠবে এবং চিরন্তন জীবন লাভ করবে।

ইকবালের এই সমাজ বিশ্বাসীদের (মুমিন) নিয়ে গঠিত এবং তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র পতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য। আল্লাহর একত্বের ধারণার মধ্যে বিশ্বাসীদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাওহীদ থেকে পাওয়া মানবিক স্বাধীনতা, সাম্য, সংহতি হল এই রাষ্ট্রের ভিত্তি।

ইসলাম মানুষের কাছে আল্লাহর আনুগত্য কামনা করে। এমনি একটি দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে তাওহীদের নীতি বিভক্ত বিশ্বে আনতে পারে ঐক্য এবং ইসলামী সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করে যোগসূত্র। ইকবাল তাঁর রমূযে বেখূদীতে এই নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–

কি সে বস্তু–
যা প্রবাহিত করে একটি মাত্র শ্বাস
শতেক অন্তরে?

তা হচ্ছে তাওহীদে বিশ্বাসের অন্যতম রহস্য।
ঐক্যবদ্ধ হও
আর তাওহীদকে করে তোল দৃশ্যমান:
রূপায়িত করো তার গোপন রহস্যকে কর্মে:
দীন, হেকমত আর আইন
জেগে ওঠে এরই ভিতর থেকে,
এই হচ্ছে উৎসমুখ
শক্তি, ক্ষমতা আর স্থায়িত্বের:
এরই শক্তি উন্নীত করে মানব প্রকৃতিকে
আর পরিণত করে তাকে
সম্পূর্ণ নূতন সত্তায়:
ভীতি আর সন্দেহের হয় মৃত্যু:
জীবন্ত হয়ে ওঠে কর্ম।
চক্ষু দর্শন লাভ করে বিশ্ব আত্মার:
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ–
এই হচ্ছে আমাদের জীবনের মূলধন,
এরই বন্ধন এক করে দেয়
আমাদের বিক্ষিপ্ত চিন্তা রাশিকে। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বের নীতির উপর যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তিনি বিশ্বাস করেন তার মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে মানবতার সত্যিকারের চিত্র। ইসলামী সমাজের অভ্যুত্থান তাই তাঁর কাছে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নয়। যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে তা সকল দেশের, সকল মানুষের সমস্যা এবং যে আদর্শের কথা তিনি বলতে চেয়েছেন তা সমগ্র মানবতার পুনরুজ্জীবনের আদর্শ। ইকবালের কাছে ইসলাম এক নীতি ও আদর্শের প্রতীকে স্থিতি লাভ করেছে; নিছক এর অতীত কীর্তি কাহিনীর প্রতি-বর্ণনা না হয়ে মানব জীবনের এক অর্থপূর্ণ তাৎপর্যের আকারেও তার কাছে অস্তিত্ব লাভ করেছে।

রাসূল (সঃ)-এর আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ইসলামী সমাজের সংহতির আরেকটি কার্যকর ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছে। রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁরই আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং সাধনা দীপ্ত কর্মমুখর প্রচেষ্টায় দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানেরা একটি কেন্দ্রে মিলিত হয়েছে। রাসূল (সঃ)-কে নেতা মেনে যে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী সমাজ নির্মাণের ধারণা গড়ে উঠেছে তার প্রকৃত মর্ম নিহিত রয়েছে মানব জাতির জন্য আনা তার এই বিশিষ্ট বাণীর প্রকৃতিতে। মানবতার জন্য যেমন তিনি এনেছেন সাম্য, স্বাধীনতা ও সংহতির ধারণা তেমন এতদিন যারা ছিল নিগৃহীত, শোষিত এবং অপদস্থ তাদের মুখে তিনি দিয়েছেন ভাষা। বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি এনেছেন শৃঙ্খলা ও মানব ঐক্যের বার্তা এবং পরিণতিতে সামাজিক সাম্য ও সুবিচার–

আমাদের সংহতি, আমাদের ধর্ম এবং
আমাদের আইন–
সব কিছুরই বুনিয়াদ হচ্ছে রেসালত।
তাতে সৃষ্টি করে
আমাদের বিভেদের মধ্যে ঐক্য এবং

আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে
এক সুসংবদ্ধ সমাজে–
যা দ্বারা আনীত হয়
শান্তির বার্তা বিশ্বের কাছে।
যদি আমরা এই ঐক্য সংস্থাপক,
প্রাণ সঞ্চারী মতবাদকে পরিত্যাগ করি
তা হলেই জাতি হিসেবে হয় আম .দর মৃত্যু;
কারণ এই কেন্দ্রবিন্দুই আমাদেরকে দিয়েছে
বহির্দৃষ্টি ও উদ্দেশ্যের এক চলিষ্ণু ঐক্য।

(রমূযে বেখূদী, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার করলে এই সমাজবিধান নিশ্চিতভাবেই ভাষা, বর্ণ এবং ভূখন্ড-নির্ভর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। ইসলামের যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তা এই সংঘাতময় দেশাত্মবোধ ও ভূখন্ডপ্রীতির পরিপন্থী। ইকবাল মনে করেন আধুনিক কালের এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা মানবতার সংহতিকেই বিপন্ন করে তুলেছে। তাওহীদ ও রিসালাতকে কেন্দ্র করে এবং নীতি হিসেবে ইসলামী আদর্শের উজ্জীবন ঘটিয়ে যে সমাজের রূপকল্প ইকবাল হাজির করেছেন তা স্বদেশী চারিত্র্য বর্জন করে আন্তর্জাতিক সুষমা লাভ করেছে। ইকবাল এই আন্তর্জাতিক সমাজকে মিল্লাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মিল্লাতের এই ধারণার সাথে উনিশ শতকের প্যান ইসলামী ধারণার ঐক্য রয়েছে।

ইকবালের কাছে মিল্লাত হলো বিকশিত ব্যক্তিত্বের একটি কার্যক্ষম সমা্‌ যা এই সমাজকে দেয় একটি স্বতন্ত্র সত্তা–

The community is an entity which in all its functions and activities motivated by power and a spirit of triumph. The unity acquired through the mergence of several individuals gives the community a Unique personality of its own. (Maqalat-i-Iqbal. S. A. V. Moeeni)

এমনিভাবে ব্যক্তি যখন হারিয়ে যায় মিল্লাতের মধ্যে তখন মানব জীবন অধিকতর গৌরবদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং মিল্লাত লাভ করে প্রত্যয়পুষ্ট শক্তিমানের হৃদয়–

The complete integration of the individual in the community is the crowning glory of human life and power thus constituted is all embracing and provides strength and vigour both to the individual and community. (Iqbal's Educational Philosophy. K. G. Saiyidain)

এ সম্পর্কে ইকবাল নিজেই বলেছেন–

জমাআতের মধ্যে সে যখন হারিয়ে যায়,
তখন তার উপমা সেই জল বিন্দুটির সাথে
যে নিজেকে বিকশিত করতে যেয়ে পরিণত হয় সমুদ্রে।
তখন সে অর্জন করে অপরিমেয় শক্তি ও সম্পদ।
চিরন্তন প্রথায় সে পরিণত হয়
অতীত ও ভবিষ্যতের দর্পণরূপে;

এবং যা আসবে আর যা গত হয়েছে
তাদের যোগাযোগ সূত্ররূপে
অতএব এর মুহূর্তগুলি যেন অনন্তকাল–
অশেষ এবং পরিমাপের অতীত।
তার অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে
সমাজ জীবন থেকে আহরিত বিকাশের আনন্দে
এ সমাজবোধ প্রহরা দেয় তার সর্বকর্মকে
নিয়ন্ত্রণ করে সর্বঅনুভূতিকে।
সে বোঝে যে তার দেহ ও অন্তর
–ভিতর ও বাহির–
সে পেয়েছে সেই সামগ্রিক জীবন বোধ থেকে। (রমূযে বেখুদী)

ইকবাল মনে করেন, ব্যক্তির মত মিল্লাতকেও একটি সংগ্রামী জীবন নির্বাহ করতে হবে। মিল্লাতের ভাগ্যাকাশেও উদিত হবে ঝঞ্ঝামুখর দিন; কিন্তু তাকে অতিক্রম করাই হলো সত্যিকারের জীবনের লক্ষণ।

ব্যক্তির আত্মনের মতো মিল্লাতের আছে একটি আত্মন। এই আত্মন শক্তি, সাহস ও প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জীবিত। ইকবাল তাই মুসলমানদের মিল্লাতের মধ্যে বিলুপ্ত হওয়ার পরামর্শ দেন, কেননা মিল্লাতের আত্মন ব্যতীত রাষ্ট্র ও ধর্ম কোনটাই স্থায়ী হবার নয়।

ইকবাল তাঁর সুবিখ্যাত শিকওয়া কাব্যগ্রন্থে মুসলমানদের গৌরবময় যুগের একটি চিত্র এঁকেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, তখন তাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের সততা ও প্রত্যয়ের দীপ্তি বর্তমান ছিল; সংগত কারণে সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর বাণীকে বহন করবার জন্য তারা যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিল। হককে বুলন্দ করবার জন্য তারা রক্ত ঝরাতে কখনো দ্বিধা করেনি।

ইকবাল দুঃখ করেছেন, আধুনিক কালে মুসলমানেরা এই মিল্লাতের ঐক্যকে নিঃশেষ করেছে এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা ও কোরবানীর আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলেছে।

মিল্লাতের বুনিয়াদকে মজবুত করবার জন্যই জিহাদের ফয়সালা দেয়া হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মুসলমানদের উপর জিহাদকে ফরজ করা হয়েছে। ইকবাল বিবেচনা করেছেন, মুসলমানদের উপর আপতিত বর্তমান জিল্লতির প্রধান কারণ হল তাদের মিল্লাতের কল্যাণময় বন্ধনের প্রতি অনীহা এবং এই কল্যাণময়তার সপক্ষে তাদের ত্যাগ স্বীকারে অনাগ্রহ।

ইকবাল ব্যক্তি ও মিল্লাতের মধ্যেও একটি সম্পর্ক সৃষ্টির কথা বলেছেন। এ সম্পর্কটা রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জারক রসে মিশ্রিত। তাঁর পরিকল্পিত মিল্লাতের প্রকৃতি হল এমনি ঃ এটি নিজেই হবে একটি স্বতন্ত্র ও সংহত অস্তিত্ব যার নিজের থাকবে যেমন স্বকীয়তা তেমন নিজস্ব আত্মাও। ইকবাল তাঁর রমূযে বেখুদীতে ব্যক্তি ও মিল্লাতের পারস্পরিক ঐক্য ও সম্পর্কের নীতিমালা পেশ করেছেন। এক জায়গায় তিনি বলেছেন–

মিল্লাত হচ্ছে ব্যক্তির জন্য আশীর্বাদ;
কেননা ব্যক্তির শক্তি দুর্নিবার হয়ে ওঠে
মিল্লাতের মধ্যে।
তেমনি তার হৃদয় ও বুদ্ধি

হয় উদ্বেল
বিকাশের ছোঁয়ায়।
মিল্লাতের সদস্য হিসেবে
ব্যক্তি লাভ করে
ইয্যত,
মিল্লাত অর্জন করে সংহতি।
যখন ব্যক্তি হারিয়ে যায়
মিল্লাতের মধ্যে,
তার জীবন হয়ে ওঠে
অনাবিল আকাশের মতো। (অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

এস, এ, ভি মঈনী তার 'মাকালাতে ইকবাল' গ্রন্থে ইকবালের এ বিশিষ্ট চিন্তাকে বিবৃত করেছেন রূপদক্ষ শিল্পীর মতো–

He explains that in the life of a community, an individual has a transitory existence. His thoughts, hopes, conduct, physical and intellectual powers depend upon the community. He is only a partial manifestation of the collective life of the community— the community is a seperate being and is by no means merely a collection of individuals. It is much more than that. Its composition is infinite and eternal and carries within itself unborn generations of human beings.

এমনিভাবে ইকবাল খুদী ও বেখুদীর মধ্যে যে যোগসূত্র রচনা করলেন তার চিত্র উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো। ইকবালের প্রতীতি জন্মালো খুদী যদি অর্জন করে স্বকীয়তা, কর্মদ্যোগ, প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা তাহলে বেখুদীর মধ্যে জন্ম লাভ করবে ত্যাগ, তিতিক্ষা ও কোরবানীর দীপ্তি। ব্যক্তির ইচ্ছা তখন বিলুপ্ত হবে সমাজের ইচ্ছার মধ্যে এবং মিল্লাত হয়ে উঠবে কল্যাণের একটি সবুজ শ্যামল প্রান্তর–

If the self inculcates uniqueness, initiative, determination and ambition, selflessness creates a spirit of sacrifice, devotion and mergence of the individual wills into the bigger will of the community for the greater good of all members of the community. This reciprocal association between the individual and community is in the last analysis, according to Iqbal, the secret of success in life.

(Ruh-i-Iqbal, Yousaf Hussain Khan)

পরিণতিতে–

The self reaches the pinnacle of its glory when it attains maturity in selflessness. When an individual does service to others, he fulfills the main objective of hislife. (Ruh-i-Iqbal, Yousaf Hussain Khan)

ইকবালের নিজের ভাষায়–

মিল্লাত ছাড়া
ব্যক্তির অস্তিত্ব অর্থহীন;

যেমন নদীর বিশালতা ছাড়া
ক্ষুদ্র ঊর্মির অস্তিত্ব
মূল্যহীন।
যে মুহূর্তে ঊর্মি বিচ্ছিন্ন হয়
নদীর বুক থেকে
সে হারিয়ে যায় অনস্তিত্বের
অন্ধকারে।' (বাঙ্গ-ই-দারা, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের এই সমাজবিধান যার মধ্যে রয়েছে মানবের অন্তরাত্মার স্বীকৃতি। নীতি হিসেবে এটি গ্রহণ করেছে ইসলামের কালজয়ী ও সার্বজনীন আদর্শ এবং সমাজের ঐক্য সংস্থাপক ভিত্তি হিসেবে ইসলামের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ। অন্যান্য সমাজবিধানের মতো ইকবালের পরিকল্পিত সমাজ সন্যাসবাদী ধারণায় পুষ্ট নয়। বহির্জগতের প্রতি ইসলামের নেই কোন ঔদাসীন্য। জড় জগতের প্রতি এই সমাজ সকল দায়িত্বের স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সঙ্গে সকল বিঘ্ন মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে। এই সমাজবিধান আধুনিক বিজ্ঞানের গুরুত্বকে উপলব্ধি করে এবং বিজ্ঞানকে হাতিয়ার বানিয়ে বহির্জগতের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

ইকবাল তাঁর রমূযে বেখূদীতে জাতীয় জীবনের ক্রমসম্প্রসারণশীলতার জন্য বিজ্ঞানের বিকাশকে একান্ত জরুরী মনে করেছেন। ইকবালের ধারণা, মুসলিম জাতির দুর্ভোগ ও পতনের মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের প্রতি তাদের অবহেলা। কারণ, বর্তমান কালে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমৃদ্ধির প্রধান কার্যকারণ হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে তাদের চিন্তার দুয়ার যেমনি হয়েছে অবরুদ্ধ তেমনি পার্থিব উন্নতির পথও হয়েছে কুয়াশাচ্ছন্ন। ইকবাল তাই জাতীয় জীবনের বলিষ্ঠতার জন্য পাশাপাশি প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্তে আনবার লক্ষ্যে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিকে অর্জন করবার তাগিদ দিয়েছেন–

যে কেহ জয় করে বস্তুর জগতকে,
নির্মাণ করতে পারে সে একটি বিশ্ব
ধূলি মুষ্টি থেকে,
পর্বতমালা ও মরুভূ, নদ নদী, সমতল–
এর সবই হচ্ছে শিক্ষার পন্থা
চক্ষুষ্মান মানুষের কাছে।
তোমরা– যারা হয়ে আছ তন্দ্রাতুর
অহিফেন নেশায়,
ঘৃণাই মনে কর এই কার্যকারণের বিশ্বকে।
উদ্দেশ্য তার সম্প্রসারণ মুসলিম আত্মার
আর এক পরীক্ষা
তার লুকায়িত সম্ভাবনার।
জয় করো তাকে,
নইলে সে জয় করবে তোমায়–
যেমন করে মদ্য ধারণ করে সোরাহী;
তোমার বহুমুখী কর্মক্ষমতা

লাভ করবে পূর্ণতা
তার সকল শক্তির উপর কর্তৃত্ব করে।
সেই মানুষই হয়ে ওঠে আল্লার প্রতিনিধি
বিধান প্রয়োগ করে সকল বস্তুর উপর।
ডুবাও তোমার হস্ত পর্বত শোণিতে,
আহরণ করো উজ্জ্বল মুক্তারাজি
সমুদ্র বক্ষ থেকে;
সূর্য থেকে গ্রহণ করো
তার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতি,
ঝঞ্ঝা থেকে গ্রহণ করো বিদ্যুৎ ঝলক–
যা আলোকিত করে প্রাসাদ বক্ষ।
জ্ঞানকে নিয়োজিত করো তোমার সন্ধানের কাজে
জয় করো বস্তু ও আত্মার বিশ্ব;
যে কেহ শাসনে আনতে পারে
বস্তুর বিশ্বকে,
আরোহী হোতে পারে সে
বিদ্যুৎ ও তাপের রথে। (জাভিদনামা, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

সবশেষে এই সমাজ-বিধান হবে একটি গতিশীল বিধান। এটি হবে সদাজাগ্রত ও পরিবর্তনশীল। ইকবাল মনে করেন, জীবন হচ্ছে গতিমান এবং পরিবর্তন হচ্ছে তার ধর্ম। ইসলামী নীতি অনুসারে সমাজের এই পরিবর্তনশীলতা জীবনের গতিশীল সৃষ্টিধারার জন্যই অপরিহার্য। ইকবালের এই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে জাভিদনামায়– যেখানে সুলতান টিপু কাবেরী নদীর উদ্দেশ্যে বলছেন–

তুমি আর আমি জীবন প্রবাহের তরঙ্গ মাত্র;
প্রতি মুহূর্তে
এই বিশ্বে আসে পরিবর্তন– প্রবাহ,
জীবনে আসে পরিবর্তন
প্রতি শ্বাস গ্রহণের সাথে
কারণ সে চিরন্তন সন্ধানী নবীন বিশ্বের।
গতি থেকে রচিত হয়
প্রতি সত্তার টানাপোড়েন;
গতি থেকেই আসে
ক্রমবিকাশের এসব আকাঙ্ক্ষা;
পথেরও আছে গতি
পথিকের মতো,
সর্বত্রই রয়েছে গতি স্পষ্ট অথবা প্রকাশমান।
কাফেলা ও উট
মরুভূ আর ওয়েসিস–

যা কিছু দেখেছো তুমি,
সবাই অশান্ত চঞ্চল
গতির বেদনায়। (জাভিদনামা, অনুবাদ– সৈয়দ আবদুল মান্নান)

সুতরাং ইসলামী সমাজবিধান কাল ও সময়ের বোঝাকে সরিয়ে জীবন সঞ্চারী গতিশীল ধারণাকে প্রয়োগ করবে; অবশ্য তা কোরআনী মূল নীতির আওতাধীনে থেকে। তাহলে সে যেমন বুদ্ধিবৃত্তিগত উদ্যমকে হারিয়ে ফেলবে না, তেমনি প্রাচীন ও কীটদুষ্ট ধারণাকে আঁকড়ে রাখবার মোহকেও বর্জন করতে পারবে। সেই সাথে নতুন কিছু গ্রহণ করবার নিরীক্ষাও তারা চালাতে পারবে। ইকবালের পরিকল্পনা অনুসারে এই সমাজবিধান বাস্তব ও সংস্কৃতির শক্তির উপর যেমন নির্ভর করবে, পাশাপাশি ইসলামী কাঠামোর মধ্য থেকে এর প্রতিটি সদস্যের পক্ষে মুক্তবুদ্ধি চর্চার সুযোগকেও ত্বরান্বিত করবে। মানব সমাজের এই সমৃদ্ধিশীলতা ও চলিষ্ণু গতির মধ্যে উন্মোচিত হবে তখন এক অভূতপূর্ব সাফল্য ও সুস্বাদ।

ইকবাল ও সক্রিয় রাজনীতি

মুসলিম ভারতের নবজাগৃতির নায়ক ইকবাল। আধুনিক ভারতীয় ইসলামের ইতিহাসে ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ও গভীর জীবনবোধ অলোকসামান্য দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুসলিম ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তনে তিনি যে বিস্ফোরণ ঘটালেন তা আযাদীর রোশনীতে সকল দিগন্তকে উদ্ভাসিত করেছে।

এতদসত্ত্বেও, ইকবালের রাজনৈতিক জীবন মূলত তাঁর ব্যাপক কবি ও দার্শনিক পরিচিতির মধ্যে ঢাকা পড়ে আছে। অতলান্তিক অনুভূতি ও দার্শনিক মেজাজ– এ দু'য়ের সমন্বয়ে যে উষ্ণ আবহ নির্মিত হয়েছিল তা তাঁর রাজনৈতিক কলস্রোতে ভেসে যাওয়ার পক্ষে পুরোপুরি অনুকূল ছিলনা। কিন্তু ইকবাল ছিলেন গভীরভাবে সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিটি পট পরিবর্তন তিনি লক্ষ্য করেছেন। বিশেষ করে, ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য ও ভবিষ্যত চিন্তায় তিনি ছিলেন নিমগ্ন। এ প্রসঙ্গে উপমহাদেশের আযাদী আন্দোলনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আমাদের স্মর্তব্য। বিভিন্ন সময়ে, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইকবালকে জটিল রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তিনি যথাযথ পথনির্দেশও করেছেন। তিনি কখনো পেশাদার রাজনীতিবিদ ছিলেন না এবং রাজনীতি কখনো তাঁর কবি ও দার্শনিক সত্তাকে সর্বতোভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তবু কওমের স্বার্থে রাজনৈতিক কার্যক্রমে তিনি যতটুকু ভূমিকা রেখেছেন তা ছিল বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তায় পূর্ণ। ইকবালের রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করতে হলে সর্বাগ্রে তৎকালীন রাজনীতির স্বরূপটি পর্যবেক্ষণ করা আবশ্যক।

পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

ইকবালের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে; পলাশীর বিপর্যয়ের পর, ঔপনিবেশিক শক্তি ইতোমধ্যে ভারতে তার ক্ষমতাকে সংহত করেছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভারতের জাতীয় ও সমাজ জীবনেও সূচিত হয়েছে রূপান্তর ও বিবর্তন। ইংরেজ শক্তির উত্থানের সাথে সাথে এ অঞ্চলের মুসলমানদের তকদীরে নেমে আসে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। রাজ্যক্ষমতা হারানোর মধ্যে তাদের এ দুর্ভাগ্য সীমাবদ্ধ থাকেনা; জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে তাদেরকে এক ভাগ্যাহত লাঞ্ছিত মানবগোষ্ঠিতে পরিণত করা হয়। রাষ্ট্রভাষা ফার্সীকে উচ্ছেদ করা হয়; তাদের তাহজীব-তমদ্দুনের বিরুদ্ধে ধ্বংসকারী ইন্ধন যোগানো হয়। মুসলমানদের ইতিহাস বিকৃত করে কুচক্রী ইংরেজ পোষ্য ও দালাল ঐতিহাসিকদের দ্বারা সৃষ্টি করে নতুন ইতিহাস। মুসলিমদের উপর কলংক লেপন করে। সর্বোপরি পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধিতার সয়লাব ভারতের উপকূলেও এসে আঘাত হানে। এ বৈরী শাসন ও যুলুমের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মুসলমানরা শুরু করে সংগ্রাম। পরিণতিতে এ বিদ্রোহই দাবানল হয়ে জ্বলে ওঠে। মাত্র একশ' বছরের ব্যবধানে ১৮৫৭ সালে। ইংরেজরা এ বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করে এর রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব এবং তাৎপর্যকে খাটো করবার প্রয়াস পায় বটে; কিন্তু আসলে এ ছিল ভারতীয় জনগণের প্রথম সুসমন্বিত আযাদীর লড়াই।

১৮৫৭ সালে সূচিত বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ইংরেজরা নব উদ্যমে মুসলমানদের উপর দমননীতি চালাতে শুরু করে। এই কূট ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রের মুখে তারা ক্রমেই নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। এ বিপ্লবে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষ অংশগ্রহণ করলেও ইংরেজ রোষ মূলতঃ মুসলমানদেরই উপরই পতিত হয়। কেননা ফিরিঙ্গিরাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই একমাত্র মুসলমানদের অসহযোগিতা এবং বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ ঘোষণা ইংরেজ শক্তিকে নাজুক অবস্থায় নিক্ষেপ করে। তাই, প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যের শত্রু বিবেচনা করে তারা মুসলমানদের প্রতি বৈরী আচরণের নীতি অবলম্বন করে। বিদ্রোহের বহু বছর পরেও তাই আমরা দেখি ব্রিটিশ রোষ কেমন করে মুসলমানদের দগ্ধীভূত করে চলেছে। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়ন করেছিলেন তার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল নবসৃষ্ট হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার কর্তৃক মুসলমান কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে দেয়া। এ সময়ে মুসলমানদের দুর্দৈব ও জিল্লতির এক মর্মঘাতী ছবি ফুটে উঠেছে ইংরেজ লেখক ডব্লিউ, ডব্লিউ, হান্টারের সুবিখ্যাত 'আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে। মুসলমান শরীফ ও খানদানী পরিবারের বিপর্যয় প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন–

They drag on a listless existence in patched up Verandahs or leaky out houses sinking deeper and deeper into a hopeless abyss of debt, till the neighbouring Hindu money lender fixes a quarrel on them and then in a moment a host of mortgages foreclose and the ancient Mussalman family is suddenly swallowed up and disappears for ever.

ইংরেজ হয়েও লেখক মুসলমানদের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য উচ্চারণে দ্বিধা করেননি। বেদনার এ মর্মানুকৃতি আঁকতে যেয়ে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন–

If any statesman wishes to make a sensation in the house of commons he has only to truly narrate the history of these Mohammedan families of Bengal.

সরকারী চাকরিতে প্রশাসনের বৈরী আচরণের উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছেন–

...... there is now scarcely a government office in Calcutta in which a Mohammedan can hope for any post above the rank of a porter, messanger filler of inkpots and mender of pens.

উনবিংশ শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে এ বিরুদ্ধ হাওয়া বিরাজ করতে থাকে। শাসককুলের বিমাতাসুলভ আচরণ মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে পরাজয়ী মনোবৃত্তির জন্ম দেয় এবং নৈরাশ্যের করাল আচ্ছাদনে তারা ঢাকা পড়ে যেতে থাকে। নৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মুসলমানদের উপস্থিতি এখন বিলীয়মান এক ছায়াচিহ্ন হিসেবে রয়ে যায়।

অন্যদিকে, প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ রাজত্বকে সূচনালগ্নেই স্বাগত জানায়। কারণ ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা তাদের কাছে ছিল শুধু প্রভু বদলের মত। তাই, নবতর এ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর সাথে মিতালী গড়ে তুলতে তাদের মোটেও বেগ পেতে হয় না। এর ফলে হিন্দু সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অবাধ প্রবেশাধিকার ঘটে এবং তাদের সামাজিক কাঠামো বদলের অভিযানও শুরু হয় দ্রুতগতিতে। ডঃ ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ আচরণের দ্বৈত চিত্রের ঐতিহাসিক কার্যকারণ

এঁকেছেন এভাবে–

.... the attitude of the British towards the Muslims and the Hindus are also affected deeply by the traditional prejudices in Europe against Islam on the one hand, and the sympathy for Sanskrit literature and Hindu Philosophy on the other; the former awakens hidden memories of the crusades; the latter adds to the pride in a Common Aryan past. Europe and Islam have been neighbours; their relations have not always been peaceful, whereas there have been no such conflicts between the christian West and the Hindu East. Thus the anti Muslim prejidice is inherited as a part of history in the west, whereas there is no such tradition of hostility against Hinduism. (The Muslim Community of the Indo-Pakistan Subcontinent, Ishtiaq Hussain Qureshi)

ঐতিহ্যগতভাবে তাই এ হিন্দু মিত্রতা দানা বেঁধে ওঠে এবং ব্রিটিশের রাজানুগ্রহ অনিবার্যভাবে হিন্দু সমাজদেহকে পল্লবিত করতে থাকে। ১৮২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রাহ্ম সমাজ। এর উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজের সংস্কার সাধন। মূলত ব্রাহ্ম সমাজের প্রচেষ্টায় ইংরেজ-হিন্দু সহযোগিতার নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয় এবং হিন্দুরাও নতুন শাসকের আস্থা ও কৃপাভাজন হয়ে ওঠে। এ সময় ব্রিটিশের আনুকূল্যে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দু কলেজ। নব্য হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী সৃষ্টিতে এ কলেজের অবদান সীমাবদ্ধ থাকে না। ইউরোপীয় রেনেসাঁর জাগরণী ভাবধারা সম্প্রসারণেও এটির উদ্যোগ হিন্দু সমাজ কর্তৃক বহুলভাবে অভিনন্দিত হয়। ঔপনিবেশিক রাজশক্তি তাদের সুবিধার্থেই এভাবে একটি হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়, যারা চাকরিতে অধিকতর সুবিধা লাভ করে, শিল্পোন্নয়নে অংশগ্রহণ করে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করে। ভারতে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ সংরক্ষণে পাশ্চাত্য ভাবধারাপুষ্ট এ সুবিধাভোগী শ্রেণী ঔপনিবেশিক শক্তির বরকন্দাজ হিসেবে কাজ করতে থাকে। চিন্তায়, মননে, রাষ্ট্রিক কার্যক্রমে ইঙ্গ-হিন্দু সহযোগিতার এ ধারা যখন অবাধে চলতে থাকে তখন ভারতীয় সমাজ জীবনে ইতোপূর্বে অজানা সাম্প্রদায়িকতার এক নতুন দানব তার বাহু বিস্তার করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে কায়েম রাখার মতলবী উদ্দেশ্য থেকেই ইঙ্গ-হিন্দু চক্রান্তের এ ছিল শেষ অস্ত্র। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এ সময় ভারতের অন্যান্য জাতি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়া শুরু করে। ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ তার আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মুসলমানদেরকে তার প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। তার সূচিত শুদ্ধি আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল জোরপূর্বক মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করে পুনরায় হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনা।

হিন্দু সংকীর্ণতার আর একটি উদাহরণ হলো এ সময় লেখা প্রখ্যাত বাঙালী লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ উপন্যাস। এর প্রতিটি ছত্রে সাম্প্রদায়িকতার বৈরী বিষ মেশানো। এছাড়া রয়েছে বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত শিবাজী উৎসব। মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী আফজাল খাঁর ঘাতক তস্কর শিবাজীর স্মৃতিবাহী উৎসব অনিবার্যভাবেই হিন্দু মুসলমান সম্পর্কে বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এহেন আচরণ মুসলমানদের সন্দেহ ক্রমেই তীব্রতর করে এবং চারদিকের ঘটনা প্রবাহে তারা অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন

করতে শুরু করে। পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও উদার নৈতিকতায় পুষ্ট হয়ে যারা ভারতের জনগণের জন্য একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গড়ে তুলেছিল, এক্ষণে সেটিও উগ্র সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর কাছে প্রকারান্তরে বন্দী হয়ে পড়ে। এমনি যখন অবস্থা, মুসলমানরা তখন তাদের ধর্মের দিকে নজর দিতে শুরু করে। তাদের জীবনে যে স্থবিরতা বাসা বেঁধেছিল তার অপনোদনেও তারা ইসলামের পুনর্জাগরণের তাকিদ অনুভব করে।

দুর্যোগকালীন এ আবহাওয়ায় স্যার সৈয়দ আহমদ খান এক যুগান্তকারী দায়িত্ব পালন করেন। স্বজাতির মঙ্গল সাধনে রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষার বিস্তৃত কার্যক্রম নিয়ে তিনি এগিয়ে আসেন। তার প্রতীতি জন্মে, এ বিস্তর কার্যক্রম কেবল তখনই বাস্তবায়ন সম্ভব যখন ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শাসককুলের খারাপ ধারণা অপসারিত হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি দুটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন– The causes of Indian revolt এবং Loyal Mohammedans of India.

এ বইগুলোতে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেন, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কোন ধর্মীয় উন্মাদনাপ্রসূত ছিলনা বরং এটি সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশ ও মুসলমানদের পারস্পরিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে। দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি উল্লেখ করেন, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে মুসলমানরা ভারতের অন্যান্য জাতি সম্প্রদায়ের চেয়ে খ্রীস্টানদের অধিকতর নিকটতর। এরপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Translation Society যা পরবর্তীকালে Aligarh Scientific Society হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্যার সৈয়দ আহমদের শ্রেষ্ঠ অবদান Aligarh Anglo-Oriental Mohammedan College প্রতিষ্ঠা যা পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠস্থান হিসেবে পরিণত হয়।

রাজনৈতিকভাবে স্যার সৈয়দ আহমদই প্রথম দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা। তিনিই প্রথম মুসলিম নেতা যিনি ভারতে পাশ্চাত্য ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনার বিরোধী ছিলেন। কারণ, ভারতের আন্তঃধর্মীয় ও গোত্রীয় অনৈক্যই এর অনুপযোগিতার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ কারণেই তিনি মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন যা মূলত একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছিল। ১৮৮৮ সালে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের দুই জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন।

পর্যায়ক্রমে এ ধারণা ইংরেজদেরও প্রভাবিত করতে শুরু করে। এরপরই লর্ড ডাফরীন সমস্ত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে মুসলমান সদস্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারণ করবার সুপারিশ করেন। সময়ের আবর্তনে ভারতীয় রাজনীতির ধারা ক্রমেই জটিল ও চঞ্চল হয়ে ওঠে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক উত্থান ধর্মীয় পুনর্জাগরণের চেতনায় দুলতে থাকে। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কারকদের কার্যক্রম এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দু মানসিকতার প্রবল চাপের মুখে মুসলমানদের সতর্কতার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং একই কারণে হিন্দু প্রভাবিত সকল প্রতিষ্ঠান থেকে মুসলমানরা এখন থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে আসতে থাকে। আর, এম, সাইয়ানীর মত উদারনৈতিক মুসলমানও এ বাস্তবতার স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি–

The Mussalmans were gradually ousted from their lands, their offices, in fact everything was lost save their honour. The Hindus, from a subservient state came into the lands, offices and other worldly advantages of their former masters. Their exaltation knew no bounds and they trod upon their heals of

their former masters. The Mussalmans would have nothing to do with anything in which they might have to come into contact with the Hindus. (Presidential address at the 12th Indian National Congress held in Calcutta in 1986)

১৮৮৮ সালে স্যার সৈয়দ আমীর আলীও একই কারণে মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান না করার পরামর্শ দেন। সে বছরই লর্ড ডাফরীনের নিকট সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে সাক্ষাত করবার সময় তিনি ইংরেজ সরকারকে মুসলমানদের অধিকার রক্ষার অনুরোধ জানান।

বিশ শতকের শুরুতে এ সাম্প্রদায়িক বৈরিতা আরো প্রকট আকার ধারণ করে। উর্দু-হিন্দী ভাষা বিরোধ এবং বঙ্গভঙ্গ রদের দাবীতে কুচক্রী ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের আন্দোলন ঘটনা প্রবাহকে অধিকতর জটিল করে তোলে। এ রকম পরিস্থিতিতে আগা খানের নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল লর্ড মিন্টোর সাথে দেখা করে এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু বৈরিতার বিরুদ্ধে নিজেদের নিরাপত্তার আশ্বাস দাবী করে। লর্ড মিন্টো সহানুভূতির সাথে মুসলিম সমস্যা বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেন এবং আগা খান মুসলমানদেরকে তাদের দাবী ও সমস্যাসমূহ উত্থাপন করবার জন্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পরামর্শ দেন।

১৯০৬ সালে ঢাকায় আহূত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এ সুবর্ণ সুযোগ ব্যবহার করেন। এ সম্মেলনে জাতীয় পর্যায়ে মুসলমানদের সমস্যা বিবেচনা করার জন্য একটি জাতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে **'মুসলিম লীগ'** প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আধুনিক ভারতীয় ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। দুঃসময় ও ক্রান্তিকালে ইসলাম মুসলমানদের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নির্ধারণে যে প্রচন্ড নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে– মুসলিম লীগের পরবর্তীকালের আন্দোলন সে ইতিহাসকেই প্রোজ্জ্বল করেছে।

১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ ভারতীয় রাজনীতির সাংঘর্ষিক চিত্রমালায় পরিপূর্ণ এক জ্বলন্ত প্রবাহ, আর মুসলমানদের জন্য সন্দেহ ও বিশ্বাসহীনতার দোলাচল থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির রাজপথে পা দেবার উত্তুঙ্গ সময়।

উল্লেখ্য, এ সময়ে কয়েকবার হিন্দু মুসলিম ঐক্য সাধনে এবং সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস মোচনে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা সফলতার মুখ দেখেনি। ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে স্বাক্ষরিত লাখনৌ প্যাকট দুই সম্প্রদায়ের অবিশ্বাস ক্ষণকালের জন্য দূর করতে পারলেও তার স্থায়িত্ব বেশী দিনের ছিল না। ১৯২৮ সালে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিরসনে সেক্রেটারী অব স্টেট লর্ড বার্কেনহেডের প্রস্তাবানুসারে দিল্লীতে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এ সমস্যার একটি শাসনতান্ত্রিক সুরাহা প্রণয়ন করার জন্য মতিলাল নেহরুর উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। নেহরু নিরূপিত এ সমাধান প্রক্রিয়াই **নেহরু রিপোর্ট** নামে পরিচিত যা মুসলিম অধিকারকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করায় এটিরও কার্যকারিতা থাকে না।

সমসাময়িক সময়ে ব্রিটিশ সরকারের প্রেরিত **সাইমন কমিশন**ও অনুপযোগী বিবেচিত হয়। কারণ, এ কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্যের প্রবেশাধিকার ছিলনা। ১৯২৯ সালে বৃটেনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসে। ভারতীয় জনগণের আযাদীর প্রতি তাদের অধিকতর সহানুভূতি থাকায় এ অঞ্চলের সমস্যা নিরসনে তারা পরপর কয়েকটি গোল টেবিল বৈঠক আহবান করে। কিন্তু

সংখ্যাগুরু হিন্দুদের উস্কানিতে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়নি। ১৯৩২ সালে প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাক ডোনাল্ডের ঘোষিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (Communal award) স্বতন্ত্র নির্বাচনের প্রথা সংরক্ষণ করা হয় এবং ১৯৩৫ সালে ইন্ডিয়া এ্যাকট প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ করা হয়। ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রক্রিয়াকে চিরদিনের জন্য কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলে। অকংগ্রেসী মুসলমানদের সাথে তারা ক্ষমতার ভাগাভাগিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠার এক জঙ্গী প্রক্রিয়াকে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে উৎসাহিত করতে শুরু করে। স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের মিঃ গান্ধীর ছবি যুক্ত করে পূজা করতে বাধ্য করা হয় এবং বন্দে মাতরম সংগীত উচ্চারণে যথারীতি নির্দেশ দেয়া হয়। জঙ্গী হিন্দুরা গো-কোরবানী নিষিদ্ধ করে এবং উর্দুর বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে।

১৯৩৪ সালে ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং এর সাংগঠনিক মজবুতীতে মনোনিবেশ করেন। তিনি ইতোমধ্যে প্রকাশিত **শরীফ রিপোর্ট** ও **পীরপুর রিপোর্টে** বর্ণিত কংগ্রেসী জঙ্গীদের বাড়াবাড়ি ও মুসলিম নিপীড়নের তথ্য তুলে ধরে ইতোপূর্বে কয়েকজন মুসলমান নেতার স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবী পুনরুজ্জীবিত করেন এবং ঘোষণা দেন : একমাত্র স্বাধীন স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রই তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির রক্ষাকবচ হতে পারে; যেখানে তারা স্বাধীনভাবে জীবন এবং ইসলামের নির্দেশিত আদর্শের পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব এ আকাঙ্ক্ষারই সম্প্রসারণ এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের পর উপমহাদেশের মুসলমানরা তাদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবীতে নিরাপোষ সংগ্রাম শুরু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পুনরায় বৃটেনে ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি ভারতীয় রাজনীতির এ জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের চেষ্টা করে, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার গরবে এবং উন্মাদনায় কংগ্রেসী হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা অকার্যকর প্রমাণিত করে এবং বৃটেনে সরকারের এ প্রতীতি ও বোধোদয় জন্মায় যে, ভারত বিভাগই এই আন্তঃধর্মীয় অবিশ্বাস ও নিয়ত কোন্দল অবসানের একমাত্র উপায়। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও সাধনার রক্তঝরাপথ অবশেষে কামিয়াবীর অরুণ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে দুটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান ও ভারতের জন্ম হয়।

ইকবালের জীবনাবসান ঘটে ১৯৩৮ সালে। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর স্বপ্নের মুসলিম আবাসভূমি দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তার রাজনৈতিক চিন্তা ও কার্যক্রম পরবর্তীকালে মুসলমানদের আন্দোলনের গতিধারাকে বিপুলভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে যথাযথ ও সুনিপুণভাবে কার্যকর হয়েছে। ইকবাল রাজনীতিবিদ হয়েও ছিলেন রাজনীতির উর্ধে; সমকালে তাঁর প্রজ্ঞা, চিন্তা ও দূরদৃষ্টির অধিকারী আর কেউ ছিল না। তাই তার অসামান্য প্রভাব এত অনিবার্যভাবে ভারতীয় মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনকে নাড়া দিয়েছিল।

উপমহাদেশীয় রাজনীতিতে ইকবাল

ইকবালের অপরিসীম ত্যাগ ও কোরবানীর স্বীকৃতি দিতে গিয়ে মরহুম কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, তিনি সেই বিরল মনীষার অন্তর্গত যার মনন ও বুদ্ধিবৃত্তি উপমহাদেশের মুসলমানদের

জন্য একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ইসলামী আবাসভূমির রূপরেখা বিনির্মাণ করেছিল–

Iqbal was a remerkable poet of world wide fame and his work will live for ever. His services to his country and the Muslims are so numerous that his record can be compared with the greatest Indain that ever lived. ...... although a great poet and philosopher, he was noless a practical politician. With his firm conviction and faith in the ideals of Islam, he was one of the few who originally thought over the feasibility of carving out of India an Islamic state in the north west and north east zones which are historical home lands of Muslims.

প্রথম জীবনে ইকবাল ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী; এ সময় তার লেখা কবিতাসমূহ প্রবল জাতীয়তাবাদী আবেগে উচ্ছসিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথমত তিনি ছিলেন একজন পুরোপুরি মুসলমান এবং পরে জাতীয়তাবাদী।তাঁর প্রধান ও মৌল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্যের পরিবর্তন সাধন। সর্বাবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ ও ইজ্জত তাঁর অনুভূতিতে ক্রিয়াশীল ছিল এবং তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অবকাঠোমো যাতে কোনক্রমেই ভেঙ্গে না পড়ে সে সম্পর্কে তিনি পুরোমাত্রায় সচেতন ছিলেন। জীবদ্দশায় এক বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছেন–

In so far as India is concerned, I can say with perfect confidence that the Muslims of India will not submit to any kind of idealism which would seek to annihilate their cultural entity.

এ উক্তির মধ্য দিয়ে সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকার সমর্থন মেলে। যদিও উত্তর-যৌবনে এসে মূলত সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি অংশগ্রহণ করেন তথাপি প্রথম জীবনেও মুসলমানদের স্বার্থ ও ইজ্জতের সাথে জড়িত আন্দোলনসমূহে অংশ গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। ১৯০৫ অবধি কাটে তাঁর অধ্যয়ন ও শিক্ষকতার মধ্যে। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮– এ তিন বছর অতিবাহিত হয় উচ্চ শিক্ষার্থে প্রবাস যাপনের মধ্যে।

১৯০৬ সালে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বৃটেনের রাজনীতিবিদদের কাছে ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরা। ইকবাল এ কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৮ সালে লণ্ডনে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের একটি শাখা উদ্বোধন করা হয়। ইকবাল মুসলিম লীগের লণ্ডন শাখারও সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯০৮ সালে আগস্ট মাসে ইকবাল দেশে প্রত্যাবর্তন করে দেখতে পান ভারতীয় রাজনীতির অস্থির চিত্রমালা। যদিও তিনি এ সময় নিজের পেশাগত কার্যক্রমের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিলেন, তবুও চারদিকের চলমান রাজনৈতিক স্রোতের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত ছিল না এমন নয়। ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে পাঞ্জাবে স্থানীয়ভাবে মুসলিম লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল যা পরবর্তীকালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সাথে একীভূত হয়ে যায়। নবগঠিত পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব শাহ দীন, যিনি পরবর্তীকলে পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রখ্যাত দেশনেতা স্যার মোহাম্মদ শফী। এ সময় ইকবাল পাঞ্জাব

মুসলিম লীগের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করতে থাকেন। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিতব্য বার্ষিক সম্মেলনের জন্য মুসলিম লীগ কমিটি তাঁকে জনসংযোগ কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে। যদিও দিল্লীতে তিনি তাঁর অসুস্থ বন্ধু আকবর এলাহাবাদীকে দেখতে যাওয়ার কারণে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন, তবু দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি অমৃতসর সম্মেলনে উপস্থিত হন।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ১৯১০ থেকে ১৯২৩- এ বছরগুলোতে রাজনীতিতে ইকবালের অংশগ্রহণ পুরোপুরি সতেজক হয়ে ওঠেনি। এ সময় ইকবাল মূলত তাঁর কাব্য ও দর্শনের জগতে বসবাস করছিলেন। উত্তেজক ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টিকারী কবিতা রচনা করে মজলুম মুসলমানের প্রাণে তিনি আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যা আরোপ করে তিনি তাদের স্থবির অচলায়তন ভেঙ্গে ফেলার দিকনির্দেশ করেছিলেন। এ সময় ইকবালের অসামান্য জনপ্রিয়তা ও লোকবন্দনার একটি ছবি চৌধুরী খালিকুজ্জামান তার সুবিখ্যাত Pathway to Pakistan গ্রন্থে আমাদের দিয়েছেন–

Meeting the Brothers (Ali Brothers) was like gulping wine. It made us fresh and lively. When we are not talking the Brothers generally sang poems of Iqbal from Shikwa, Shama aur Shair, Sicily Fatima etc. These were of course, the poems which had made Iqbal the idol of Muslim youth. We loved Iqbal the revolutionary, calling upon his people to rise to action, the Iqbal who introduced Muslim heroes in their true glory, the Iqbal who by his new interpretations of Quranic injunctions put life into what had been made state by philosophical ponderings.

১৯১৯ সালে স্যার কৃষ্ণ প্রসাদের কাছে লেখা ইকবালের এক চিঠিও রাজনৈতিক সভা-সমিতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার তাঁর আগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়–

The Muslims of Lahore in a public meeting passed a resolution not to participate in Victory Celebrations. I also attended this meeting. I do not attend political meetings, but in this meeting a very serious religious issue was involved.

এ চিঠির মর্মার্থ আমাদের প্রতীতি জন্মায় তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল ইসলামের খেদমত ও মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষণ। সচেতনভাবেই তিনি রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সংঘর্ষের পথ পরিহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কারণ, এটি তাঁর সুকুমার উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী।

১৯২০ সালে তিনি পাঞ্জাব খেলাফত কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু খেলাফত আন্দোলনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং তাদের কংগ্রেসী অনুসরণ প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে তিনি এ পদ প্রত্যাহার করেন। উল্লেখ্য, খেলাফত আন্দোলনের প্রচার কার্যে মাওলানা মোহাম্মদ আলী লাহোর আগমন করলে তিনি তাঁর কার্যক্রমের প্রতিবাদ করেন। তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল, খেলাফত নেতৃবৃন্দ মূলত কংগ্রেসী হিন্দুদের আস্থাভাজন হয়ে কাজ করবার চেষ্টা করছে যা মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণের মোটেও অনুকূল নয়। পরবর্তীকালে ইকবালের এ ধারণা সম্পূর্ণরূপে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালে লেখা সৈয়দ সুলায়মান নদভীর নিকট এক পত্রে খেলাফত নেতাদের দুঃখজনক কার্যক্রমের তিনি উল্লেখ না করে পারেননি–

It is unbearable to sell Islam at the hands of the Hindus. It is sad that the protagonists of Khilafat have gone far away from their true path. They are pointing towards a kind of nationalism which no Muslim can accept even for a moment.

যারাই ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থকে উপেক্ষা করেছে অথবা স্বীয় সম্প্রদায়ের অধিকার ও সম্মানকে খর্ব করেছে তাদের সাথে ইকবালের মতানৈক্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এর অর্থ এই নয় যে, ইকবাল ধর্মান্ধ ছিলেন অথবা সাম্প্রদায়িক কুয়াশা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সহমর্মিতার জাগরণও ছিল তাঁর অন্তর্গত বিশ্বাসের অংশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যা অহরহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার পুঁজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, ইকবালের জন্য তা ছিল এক সার্বক্ষণিক মানসিক উদ্বেগ ও যাতনার বিষয়। ১৯২৩ সালে স্যার কৃষ্ণ প্রসাদের কাছে লেখা এক চিঠিতে পাঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমানের ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক তিক্ততা ও সন্দেহ তাঁর দুঃখজনক উপলব্ধির স্বীকৃতি দিয়েছেন–

It is very sad that differences rather hostility between the Hindus and Muslims is multiplying everyday. If this continues, life will become extremely difficult for the two nations in the coming thirty years.

১৯২৪ ও ১৯২৭-এর মধ্যে দেশে সাম্প্রদায়িক অস্থিরতা চরমে পৌঁছে। জাতীয় জীবনের এরকম মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশে দেশের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ সাম্প্রদায়িক অনাসৃষ্টি মোচনে একত্রিত হন। লাহোরে হিন্দু ও মুসলিম নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে এ লক্ষ্য হাসিলে ন্যাশনাল লিবারেল লীগ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ইকবালও এ সংগঠনে যোগদান করেন। পরে বোম্বাইয়ে সিওয়াই চিন্তামনি একই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সম্মেলন আহবান করলে ইকবাল নিজেকে একজন খাদেম হিসেবে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তাব দেন। যখন এ সংস্থায় যোগদানের কার্যকারণ সম্পর্কে ইকবালকে প্রশ্ন করা হয় তখন এক বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন : সাম্প্রদায়িক বৈরিতায় দেশে যে দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তা কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের পক্ষে আচরণীয় হতে পারেনা। হিন্দু ও মুসলমান তাদের পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর করে যাতে শান্তি ও স্বস্তিতে সহাবস্থান করতে পারে তার যথার্থ পরিবেশ সৃষ্টি করাই আমার লক্ষ্য। ভারতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গে ইকবালের স্বতন্ত্র ধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক মৈত্রী অটুট থাকুক– এটা তাঁর কাম্য ছিল। যারা ইকবালের ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণার উল্লেখ করে তাঁকে ধর্মান্ধ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান মানবদরদী ইকবালের এ কার্যক্রম তাদের ভুল ভাঙ্গাবে।

ইকবাল, নেহরু রিপোর্ট এবং সাইমন কমিশন

প্রাথমিকভাবে ইকবাল রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পুরোপুরি পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু ১৯২৬-এর পরবর্তী সময়ে ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত ইকবালকে রাজনীতিতে টেনে আনে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয়। রাজনৈতিক আন্দোলন যেমনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি ইকবালও পুরোপুরি সচেতন ছিলেন সমকালীন রাজনৈতিক কার্যক্রম দেশের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব নির্ধারণে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। নেহরু রিপোর্ট ছিল এ সময়ের আলোচিত বিষয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ এ রিপোর্টকে কেন্দ্র করে তিনভাগে

বিভক্ত হয়ে পড়েন। প্রথম গ্রুপের নেতৃত্ব দেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও ডাঃ আনসারী– যারা এ রিপোর্ট কোন পরিবর্তন ব্যতিরেকেই পুরোপুরি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয় গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও মাহমুদাবাদের রাজা সাহেব– যারা শর্তসাপেক্ষে এবং কিছু সংশোধনের মাধ্যমে রিপোর্টটি গ্রহণ করতে রাজী ছিলেন। তৃতীয় ও শেষ গ্রুপ গঠিত হয়েছিল স্যার মোহাম্মদ শফী ও তার অনুসারীদের নিয়ে– যারা রিপোর্টটিকে পুরোপুরি অগ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন। ইকবাল ছিলেন তৃতীয় গ্রুপের সমর্থনকারী। নেহরু রিপোর্টকেই কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের একটি অংশ স্যার মোহাম্মদ শফীর নেতৃত্বে বেরিয়ে যায় এবং শফী লীগ প্রতিষ্ঠা করে। নেহরু রিপোর্ট সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ে ইকবাল স্যার মোহাম্মদ শফীকে জোরালো সমর্থন দেন। তিনি নিজেও শফী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

নেহরু রিপোর্টকে সামনে রেখে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যখন এমনি রাজনৈতিক চাপের সম্মুখীন তখন বৃটেন সরকার ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র বিনির্মাণে অবকাঠামো নিরূপণের জন্য সাইমন কমিশন প্রেরণ করেন যা কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু শফী মুসলিম লীগ বিষয়টি ভিন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করে এবং সাইমন কমিশনের সাথে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেয়। কমিশনের প্রতিনিধিদের সম্মুখে খসড়া প্রণয়নের জন্য যে কমিটি গঠিত হয় ইকবাল তার অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। দুঃখজনকভাবে খসড়া প্রস্তুতির সময় ইকবাল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং দিল্লী চলে আসেন। তাঁর অবর্তমানে খসড়া প্রস্তুত হয় এবং প্রত্যাবর্তনের পর দেখতে পান ইতোমধ্যে প্রণীত খসড়াতে অনেক জরুরী মৌলিক বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এ ঘটনা দৃষ্টে তিনি বিরক্ত হন এবং শফী লীগের সম্পাদক পদত্যাগ করেন। এ পদত্যাগের আসন্ন প্রতিক্রিয়া হয় ইকবালের দাবী, সমূহ শফী লীগ জরুরী ভিত্তিতে মেনে নেয়। ইকবালের ধারণা ছিল, কশিমনের সামনে মুসলমানদের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা উচিত। স্যার মোহাম্মদ শফীর সাথে একত্রে কমিশনের সামনে মুসলিম দৃষ্টিকোণ উপস্থাপনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় ইকবাল সাইমন কমিশনের উদ্দেশ্যে একটি কবিতাও রচনা করেন এবং প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কমিশন আশা ও আরজুর নতুন দুয়ার উন্মোচন করবে।

বিশ শতকের শুরুতে মুসলিম নেতৃত্ব মর্মান্তিকভাবে ঐক্যহীনতার পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল। নেহরু রিপোর্টে অনৈক্য আরো ঘনীভূত করে। মুসলিম লীগের জিন্নাহপন্থী অংশ যারা সামান্য সংশোধনের মাধ্যমে নেহরু রিপোর্ট গ্রহণের পক্ষপাতী ছিল সর্বদলীয় কনফারেন্সে সে দাবীটুকুও অগ্রাহ্য হয়। এ দুর্যোগকালীন আবহাওয়ায় মুসলিম কনফারেন্সের জন্ম; ইকবাল সূচনা থেকেই যার সাথে জড়িত ছিলেন।

ইকবাল এবং মুসলিম কনফারেন্স

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে স্যার ফজলে হোসেনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মুসলিম কনফারেন্স গঠিত হয়। নেহরু রিপোর্টে মুসলিম অধিকারসমূহ যথাযথভাবে বিবেচিত না হওয়ার কারণেই প্রতিক্রিয়া হিসেবে মুসলিম কনফারেন্স আত্মপ্রকাশ করে। সর্বভারতীয় যে সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দ মনে করতেন নেহরু রিপোর্ট মুসলমানদের প্রতি একটা সুস্পষ্ট বেইনসাফী, তারাই এ সংগঠনটির কার্যকরী রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে লাখনৌতে ডাঃ আনসারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কনফারেন্সে নেহরু রিপোর্ট পরিপূর্ণ

অবয়ব লাভ করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উভয়ই এ সময় বিদেশে অবস্থান করছিলেন; মাওলানা শওকত আলী কনফারেন্সে উপস্থিত থাকলেও তার প্রতিবাদ সাম্প্রদায়িক হিন্দু প্রতিরোধের মুখে ছিন্ন পত্রের মত উড়ে যায়।

স্যার ফজলে হোসেন ও তার সমর্থকরা কংগ্রেস প্রভাবিত সর্বদলীয় কনফারেন্সের গৃহীত সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় দিল্লীতে সর্বদলীয় মুসলিম কনফারেন্স আহবান করেন, যেখানে উপমহাদেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। স্যার আগা খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে মুসলিম অধিকার সংরক্ষণ কল্পে ১৪ দফা দাবী পেশ করা হয়। চৌধুরী খালিকুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, মুসলিম কনফারেন্সের এ দাবীসমূহ পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হয়; হিন্দু সাংবাদিকরা যা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ১৪ দফা হিসেবে প্রচার করে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কনফারেন্সের সাধারণ সম্পাদক ফজল রহমত আলী দিল্লীতে আহূত সম্মেলনে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু লীগ নেতৃবৃন্দ এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লীগ সম্মেলনে কনফারেন্সের উদ্যোক্তাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রাথমিকভাবে নেহরু রিপোর্টের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ করার লক্ষ্যে এবং যুক্ত নির্বাচন-পন্থীদের প্রতিরোধ কল্পে মুসলিম কনফারেন্স আত্মপ্রকাশ করলেও পরবর্তীকালে মুসলিম স্বার্থকে সমুন্নত রাখবার জন্য এটি একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক আকার লাভ করে। স্যার ফজলে হোসেনই ছিলেন এটির প্রাণ এবং সংগঠনটি টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে তিনি যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সঞ্চয় গড়ে তোলেন। কয়েকটি উর্দূ ও ইংরেজী দৈনিক সংগঠনটিকে সমর্থন দিতে শুরু করে। কনফারেন্সের সংগঠন ও আর্থিক দিকটি দেখাশোনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এবং উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে বার্ষিক দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে কনফারেন্স এতখানি কার্যকরী হয়ে ওঠে যে স্যার ফজলে হোসেন তৎকালীন ভাইসরয় ও ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হন মুসলিম কনফারেন্সই ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন।

ইকবাল মুসলিম কনফারেন্সের সূচনালগ্ন থেকেই জড়িত ছিলেন। প্রথমে তিনি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির একজন সদস্য মনোনীত হন। পরে ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত কনফারেন্সের সম্মেলনে ইকবাল সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির এ ভাষণে তিনি ভারতীয় রাজনীতির জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি দিকের প্রতি আলোকপাত করেন–

We tried the majority community and found them unwilling to recognize the safeguards which we can forego at the risk of complete extinction as a nation determined to live its own life. The alternative was to hope for justice from the British who, ever since they took the country from the Muslims, have clamied, as I have said above, to function as an impartial holder of balance in India. In their case, too we find that the old British courage and straight forwardness are replaced by a constantly shifting policy which can inspire no confidence and seems to be calculated only to facilitate their own position in India ..... your immediate duty is to prepare the whole community for the kind of self sacrifice without which no self respecting people can live on honourable life. The most critical moment in the history

of the Indian Muslims has arrived. Do your duty or cease to exist.

একই ভাষণে তিনি ভারতীয় হিন্দু মানসিকতা এবং হিন্দু রাজনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রবাহে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন এবং উল্লেখ করেন, হিন্দু রাজনীতি যার মর্মস্বরূপে নিবদ্ধ হয়েছে পাশ্চাত্য দর্শন তা কখনোই ভারতীয় আবহাওয়া ও পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়–

The majority community pretends to believe in a nationalism theoretically correct, if we start from western premises, belied by facts, if we look to India. Thus the real parties in the present struggle in India are not England and India, but the majority community and the minorities of India which can ill afford to accept the principle of western democracy until it is properly modified to suit the actual conditions of life in India.

ত্রিশের দশকের শুরুতে ইকবাল ভারতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেন এবং রাজনীতি এখন তাঁর কাব্য ও দর্শন সাধনার সমান্তরালবর্তী হয়ে ওঠে। অন্যান্য মুসলিম নেতারা যখন ক্ষমতা ভাগাভাগির লড়াইয়ে ব্যস্ত, ইকবাল তখন মুসলমানদের ভবিষ্যৎ সংগ্রাম ও সাধনার আদর্শিক কাঠামো বিনির্মাণে মনোনিবেশ করেছেন। এ পর্যায়ে ইকবালের অপরিসীম অবদানের উল্লেখ করেছেন প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী পন্ডিত ডঃ উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ–

In Indian Islam, as in all pre-industrial cultures, there are traditions, powerful and centuries old, conditioning man to quiescence, that is conditioning them not to take advantage of the opportunities which today they are offered Observers from the Modern West are struck most of all with the poverty of the East and secondly with its lack of initiative. The greatest service rendered by Iqbal was his reiterated call to action in the name of Islam, his raising of action to be a virtue in itself, his bold insistence that a dynamic infidel is more righteous than a passive Muslim.

পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্যরূপে

পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ইকবালের ভূমিকা স্বল্পকালীন হলেও বিভিন্ন দিক দিয়ে তা গুরুত্বপূর্ণ। বহুদিন ধরে ইকবালের শুভানুধ্যায়ীরা কামনা করছিলেন যে, তাঁর পাঞ্জাব আইন পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত। ১৯২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে প্রতিযোগিতার জন্য সমর্থকরা তাকে পীড়াপীড়ি করতে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁর পুরনো বন্ধু মিয়া আব্দুল আজিজের সাথে নির্বাচনী যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন।

পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে তিনি নির্বাচনে অংশ নেন এবং লাহোরের জনগণের সমর্থন ও ঐকান্তিক সহযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বী খান বাহাদুর মালিক মোহাম্মদ দীনকে তিন হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন।

আইন পরিষদের সদস্য হিসেবে ইকবাল নিয়মিত বিতর্কে অংশ নিতেন; গণমানুষের সুযোগ-সুবিধার দিকে নজর রেখে সাহস ও ধৈর্যের সাথে তিনি তাঁর প্রত্যেকটি মতামত পেশ করতেন। পার্থিব সুবিধা অথবা উচ্চপদ প্রাপ্তির বিনিময়ে তিনি তার বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দেননি।

পরিষদে এ সময় স্যার ফজলে হোসেনের ইউনিয়নিস্ট পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ইকবাল এ

পার্টির নীতি ও কার্যক্রমের তীব্র সমালোচক ছিলেন। পরিষদে এবং পত্র-পত্রিকায় ইকবাল ইউনিয়নিস্ট পার্টির দু'মুখো নীতির নিন্দা করেন যা পাঞ্জাবের মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর বিবেচিত হতে থাকে। ইকবাল ছিলেন স্যার ফজলে হোসেনের কলেজ জীবনের বন্ধু। ইকবালের নির্বাচনের পর ফজলে হোসেন তাঁকে প্রস্তাব দেন পরিষদের সভাপতিরূপে চৌধুরী শাহাবুদ্দীনের সময় উত্তীর্ণ হলে তাকে এ পদে নির্বাচিত করা হবে। কিন্তু ইকবাল ইউনিয়নিস্ট পার্টির সমালোচনায় এত তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করেছিলেন যে, পরিষদের সদস্যরা তাকে সভাপতিরূপে নির্বাচন দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে এবং চৌধুরী শাহাবুদ্দীনকে পুনঃ নির্বাচিত করে।

পরিষদে ইকবাল পুনঃ পুনঃ পাঞ্জাবের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনের আবেদন জানান। ১৯২৭ সালের ১৮ই জুলাই পরিষদে উত্থাপিত এক মুলতবী প্রস্তাবের উপর ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

I wonder if the members have realised the fact, that we are actually living in a state of civil war. If stringent measures are not taken to put this down, the atmosphere of the whole province will be poisoned. If this communal hatred permeates the rest of the country and people living in villages also come to loggerhead,. God alone knows where eventually it will lead us.

বিভিন্ন সময় ইকবাল এ জরুরী বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন; সরকারী চাকরিতে কর্মচারী নিয়োগে পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ তোলেন। সমগ্র আবহাওয়া সাম্প্রদায়িক বিষে জর্জরিত হওয়ায় তাঁর উৎকণ্ঠা গভীর হয়ে ওঠে। তিনি পরিষদে চাকরিতে নিয়োগদানের জন্য নিরপেক্ষতা বজায় রাখার আহবান জানান। ইকবাল পরিষদে গণমানুষের স্বার্থ যাতে কোনক্রমে উপেক্ষিত না হয় তার জন্য পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। ১৯২৭-২৮ সালের বাজেট আলোচনায় তিনি সরকারের করনীতির সমালোচনা করেন। ইকবাল উল্লেখ করেন, বর্তমান প্রচলিত করনীতি সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হবে। পরিষদের সদস্য থাকাকালীন প্রদেশের জনগণের জন্য তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আনজাম দেন। সাম্প্রদায়িক বৈরিতার কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে কোন কোন লেখকের মধ্যে উত্তেজনা ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী পুস্তক রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যা আন্তঃসাম্প্রদায়িক শত্রুতা সৃষ্টিতে ইন্ধন যোগাতে শুরু করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতির খোলা দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়। ইকবাল এক বক্তৃতায় এ ধরনের পুস্তক রচনার বিরুদ্ধে আইন পাসের দাবী জানান। সরকার ইকবালের যুক্তির যথার্থতা অনুধাবন করতে পেরে প্রয়োজনীয় আইন পাস করান।

ইকবাল আর এক বক্তৃতায় সরকারের অর্থ ও শিল্পনীতির নিন্দা করেন। তিনি বলেন, এ নীতি বাস্তবতাপ্রসূত নয় এবং যুগের চাহিদা মেটাতে তা অক্ষম। ইকবাল ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব হ্রাসে অধিক হারে শিল্পোন্নয়নের প্রতি গুরুত্বারোপের আহবান জানান।

পরিষদ সদস্য হিসেবে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর নজর কখনো উপেক্ষিত থাকেনি। প্রশাসনে ও শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানরা তাদের ন্যায্য দাবী থেঁকে বঞ্চিত হচ্ছে– ইকবালের তা নজর এড়ায়নি। সর্বত্র হিন্দুদের আধিপত্য থাকায় তারা বিভিন্ন স্থানে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে; ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে যা ব্যয় হয় তার বৃহদাংশ তাদের জন্যই নির্ধারিত হয়। চলমান এ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি পরিষদে আওয়াজ তোলেন এবং তথ্য ও প্রমাণ সহকারে মুসলমানদের প্রতি জুলুম ও বেইনসাফীর এক জ্বলজ্বলে চিত্র তুলে ধরেন।

ইকবালের স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনে স্থৈর্য ও বিশ্বাসের দীপ্তি প্রখর হয়ে উঠেছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণার পর ইকবাল নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের কার্যনির্বাহী সদস্যদের বৈঠক মুলতবী ঘোষণা করেন। ইকবালের এ কার্যক্রমকে কোন কোন লেখক স্বৈরতান্ত্রিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন; কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ইকবাল ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এরূপ করতে নির্দেশিত হয়েছেন। কিন্তু সকল সন্দেহের মেঘ ছিন্ন করে তিনি সে সময় এ বিবৃতি দিয়েছেন–

In my private and public life I have never followed another man's conscience. I regard the man who is capable of following another's conscience when the most important interests of the community are at stake as unworthy of Islam and humanity.

চরিত্রের এ বলিষ্ঠতা এবং অচপল ঈমানদারী তাঁর রাজনৈতিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। জীবনের দ্বন্দ্বমুখর কঠিন যাত্রাপথে দার্শনিক গভীরতা তাঁকে শক্তি যুগিয়েছে।

ইকবাল ঃ মুসলিম স্বাতন্ত্র্যের রূপকার

ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দ্রষ্টা কবি হিসেবে ইকবাল বিশ্বনন্দিত। আধুনিক ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার এ সংগ্রাম কালজয়ী চেতনার বর্ণমালায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। মানুষের আযাদী সংগ্রাম ও স্বাতন্ত্র্যের লড়াইয়ে ইসলাম যে আজও নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হতে পারে, চেতনার গভীরে নাড়া দিতে পারে– পাকিস্তান আন্দোলন তার উত্তম নজীর।

১৯৩০-এ এসে ইকবাল মুসলিম রাজনীতির গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। এ সময় এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর সভাপতির ভাষণে ইকবাল যে ঐতিহাসিক পথ-নির্দেশ করেছিলেন, ইসলামের অন্তর্গত শক্তি উজ্জীবনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের শরীর থেকে পরাধীনতার আবিলতা মুছে ফেলবার যে তাগিদ তিনি দিয়েছিলেন, অনাগত দিনগুলোতে তা দুর্জয় ও দুর্মর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আযাদী সংগ্রামের ইতিহাসে যে বক্তৃতা এতখানি ফলপ্রসূ হয়েছে তার প্রয়োজনীয় দিকগুলি এখন আমাদের বিবেচনায় আনা উচিত। ইসলামের কতকগুলি মৌলিক নীতিমালার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন–

It can not be denied that Islam, regarded as an ethical ideal plus a certain kind of polity by which expression I mean a social structure regulated by a legal system and animated by a specific ethical ideal has been the chief formative factor in the life history of the Muslims of India.

ইকবাল তাঁর মতামত প্রকাশে ছিলেন অকুতোভয়। তিনি দাবী করেন, ভারতীয় মুসলমানদের ভাগ্য ইসলামের সাথেই জড়িত। কেননা, ইসলামে জড় ও আত্মাকে পৃথক বিবেচনা করা হয়না, যেমন রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টিকারী দেয়াল নির্মাণেরও উপযোগিতা এখানে নেই। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয় যদিও আধুনিককালে পাশ্চাত্য দর্শনের অবাঞ্ছিত প্রভাবে ধর্মকে অনেকে অন্দরমহলের বস্তুতে পরিণত করেছেন। জড়বাদীদের কাছে ইকবাল তাই জিজ্ঞাসা করেন–

Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and reject it as a polity in

favour of national politics in which religious attitude is not permitted to play any part.

ইকবালের বিশ্বাস ছিল মুসলিম ভারত কোনক্রমেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেনা। কারণ তা হবে তাঁর আত্মবিকাশের পক্ষে চরম আত্মঘাতী। লক্ষণীয়, ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে ভারতীয় মুসলমানের আযাদীর প্রশ্নটিও জড়িত। তিনি উল্লেখ করেন, জাতিগঠন ও নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভারত হল এশিয়ার ক্ষুদ্র সংস্করণ কারণ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও সাংস্কৃতিক জোটের অধিবাস এ ভূখন্ডে। ইকবাল এ প্রসঙ্গে বলেন, যারা তাই বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর জাগরণকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে চিত্রিত করেন তারা মূলত মিথ্যার বেসাতী করেন। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি সংজ্ঞায়িত করেন এভাবে–

There are communalisms and communalisms. A community which is inspired by feelings of ill will towards other communities is low and ignoble. I entertain the higher respect for the customs, laws, religions and social institutions of other communities. Nay, it is my duty according to the teaching of the Quran, even to defend their places of worship, if need be. Yet I love the communal group which is the source of my life and behaviour and which has formed me what I am, by giving me its religion, its literature, its thought, its culture and then by recreating its whole past as a living operative factor in my present conciousness.

ইকবাল তাঁর ভাষণে যে প্রস্তাব পেশ করেন তা তাঁর এই মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার মৃত্তিকায় গুপ্ত ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, উপমহাদেশের অভ্যন্তরেই একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কারণ, ঐতিহাসিক বাস্তবতা ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তাই এর পটভূমি নির্মাণ করবে। মুসলিম আবাসভূমির প্রদোষারুণ এই প্রথম কোন বক্তৃতায় খুব ধার তরবারীর মত ঝিকমিক করে উঠলো–

I would like to see the Punjab, North-West Frontier province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single state. Self government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India.

তিনি এ বক্তৃতার সারমর্ম দেখে ইংরেজ ও হিন্দুদের আশ্চর্যান্বিত না হবার পরামর্শ দেন। কারণ, ভারতেই পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী মুসলিম বাস করে এবং ইসলামী জীবন ধারার বৈশিষ্ট্য হলো এই, একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের আওতায় থেকে স্বীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা। তাঁর ধারণা ছিল, এ ধরনের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হলে তা হবে ইসলাম ও ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের অনুকূল। কারণ, ভারতের জন্য তা হবে আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য সৃষ্টির উপযোগী আর ইসলামের জন্য পেছনের সংস্কার ঝেড়ে ফেলে সামনে এগিয়ে আসার নতুনতর সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করবে–

I ...... demand the formation of a consolidated Muslim state in the best interests of India and Islam. For India it means security and peace resulting from an internal balance of power, for Islam an opportunity to rid itself of the stamp that Arabian imperialism was forced to give it, to mobilize its

law, its education, its culture and to bring them into closer contact with its own original spirit and with the spirit of Modern times.

ইকবাল ও গোল টেবিল বৈঠক

ত্রিশের দশকে ভারতীয় রাজনীতির উত্তাল প্রবাহে ব্রিটিশ সরকার আহূত গোল টেবিল বৈঠক এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। ১৯২৭ সালে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে এইমর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ব্রিটিশ সরকার ও ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে সরাসরি মতবিনিময়ের প্রয়োজন যাতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের কাঠামো নির্ধারণ করা যায় এবং পারস্পরিক মতপার্থক্য দূর হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। পরবর্তীকালে লেবার পার্টি ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় আসে। লেবার পার্টির ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি থাকায় নতুন সরকার গোল টেবিল বৈঠক আহবান করে এবং ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের ঐকমত্যের মাধ্যমে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যার একটি সম্মানজনক সমাধানের দুয়ার উন্মোচন করে। তৎকালীন ভাইসরয় অবশ্য উল্লেখ করেন, ভারতের বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী অথবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবর্গকে এ বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হবে এবং আমন্ত্রিত প্রত্যেকেই হবেন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক মনোনীত। বৈঠকের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ভাইসরয় জানান–

The conference which His Majestys Government would convene would not be such a conference as would be desired by those who claimed that its duty should be to proceed by way of a majority vote to the fashioning of an Indian constitution which should there after be accepted unchanged by Parliament.

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভাইসরয়ের এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায় এবং অবশেষে বৈঠকে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার অবশ্য তার পরিকল্পনা মাফিক অগ্রসর হতে থাকেন। এ সম্মেলনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ তাদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত দাবীসমূহ তুলে ধরেন; ভারত ও বৃটেনের পারস্পরিক সম্পর্ক কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেন, সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতির গুরুত্ব মূল্যায়ন করেন।

ব্রিটিশ সরকার অবশ্য কংগ্রেসের অনুপস্থিতিতে গোল টেবিল বৈঠকের ভবিষ্যৎ সফলতা নিয়ে উৎকণ্ঠার মধ্যে ছিলেন; বৈঠকে তাই শাসনতান্ত্রিক সমস্যা নিরসনে কোন ইতিবাচক সুফল পাওয়া যায়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত নেন ভবিষ্যতে কোন এক উপযুক্ত সময় গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করা হবে।

এ সময় অনেক রাজনৈতিক দরকষাকষির পর গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর কংগ্রেস এক প্রস্তাবে চুক্তিটি গ্রহণ করে এবং গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য মিঃ গান্ধীকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদানপূর্বক কংগ্রেস তাকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচিত করে। কংগ্রেসের একশ্রেণীর উগ্রপন্থী নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল গোল টেবিল বৈঠকে কোন ফলাফল অর্জিত হবে না; তাই এ বৈঠকের ব্যাপারে তাদের অনাগ্রহই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এটিকে তারা অর্থহীন বিবেচনা করে। মিঃ গান্ধীকে একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে কংগ্রেসের এই অসাধুতার চিত্র ফুটে

ওঠে। এর পেছনে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বৈঠকের কার্যকারিতা ব্যাহত করা। প্রথম অধিবেশনের মত তাই গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনও নৈরাশ্য ও সিদ্ধান্তহীনতায় উবে যায় এবং সংখ্যালঘু সমস্যার কোন ইতিবাচক ফলাফল নিরূপণে সাফল্য ঘটেনা।

ইকবাল দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। এ মনোনয়ন অবশ্য সরকারী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই হয়। মিঃ গান্ধী ডাঃ মোখতার আহমদ আনসারীকে মনোনয়ন দানে সরকারকে প্রভাবিত করেন; কিন্তু ব্যর্থ হন। স্যার ফজলে হোসেন গোল টেবিল বৈঠকের সদস্য নির্বাচনে এবারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চারজন নতুন মুসলমান সদস্যই মুসলিম কনফারেন্সের সাথে জড়িত ছিলেন। সুতরাং বৈঠকে মুসলিম ঐকমত্য সাধনে কোন বিপত্তি পরিলক্ষিত হয়নি। আগা খান মুসলিম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন; ইকবাল ছিলেন চার সদস্যের একজন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দু'টি কমিটি গঠন করা হয়; কেন্দ্র ও শাসনতন্ত্র বিষয়ক এবং অপরটি সংখ্যালঘু সম্পর্কিত।

ইকবাল সংখ্যালঘু বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মনোনীত হন। এ কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি মিঃ গান্ধীর সাথে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সংখ্যালঘু সমস্যার একটি সম্মানজনক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান, কিন্তু মিঃ গান্ধী ও তার কংগ্রেসী সহযোগীদের বিরোধিতার মুখে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

প্রকারান্তরে মিঃ গান্ধী পরামর্শ দেন শাসনতন্ত্র রচনার পর সংখ্যালঘু সমস্যার আইনগত সমাধান বিবেচনা করা সম্ভব হবে। গোল টেবিল বৈঠকে উপস্থিত মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ একযোগে মিঃ গান্ধীর এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং উল্লেখ করেন, সংখ্যালঘু সমস্যাকে চাপা দিয়ে এ হলো সর্বকর্তৃত্ব গ্রাস করবার হিন্দু চক্রান্তের অংশবিশেষ।

রাজনৈতিক দলগুলির এ অনৈক্য ও সিদ্ধান্তহীনতার প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার একতরফাভাবে একটি সমাধান প্রক্রিয়া হাজির করেন। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড তার বিখ্যাত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ সরকারের প্রণীত এ সমাধান প্রক্রিয়ায় মুসলিম দাবীসমূহ সম্পূর্ণরূপে অর্জিত না হলেও কংগ্রেসী আপোষ-ফর্মুলার চেয়ে উত্তম ছিল। ২৪ আগস্ট ১৯৩২-এ ইকবাল সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রক্রিয়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে যে বিবৃতি দেন তার একাংশ–

.... It appears from a careful study of the decision that it attempts to vindicate two political principles ie no majority should be reduced to a minority and the interests of the minorities should be protected by giving them suitable Weightage. In the application of both these principles it is the Muslims who suffer. The positions of the Muslims in Bengal prove the violation of the first principle to the detriment of the Muslims and the figures relating to the weightage given to the Minorities in various provinces prove that the second principle has been applied more generously to Hindus in the frontier provinces than to Muslims in any other province. In the Punjab the Sikh Minority has been given weightage to an extent which reduces the probable Muslim Majority to the narrowest possible Margin.

বিবৃতিটি তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। ভালমন্দ উভয়দিক বিচার সাপেক্ষে তিনি উল্লেখ করেন, ভারতীয় মুসলমানরা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ থেকে উত্তম কিছু আশা না করতে পারলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেসী আগ্রাসন প্রতিরোধের এটিই একমাত্র উপায়।

আশ্চর্য ঘটনা হল এই, কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি এ সময় সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণও করেনা; বর্জনের জটিলতা থেকেও মুক্ত থাকে। ইকবালের দৃষ্টিতে কংগ্রেসের এই দ্বৈত চিত্র ফুটে উঠেছে; তিনি বিস্মিত হয়েছেন এরকম একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অনীহা পর্যবেক্ষণ করে। আশু প্রয়োজনে তাই তিনি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রভূত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এটি গ্রহণের পরামর্শ দেন। তার এ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে এ সময়ে দেয়া একটি বিবৃতিতে–

The Congress working committee has tried by, this resolution to hide its inner communalism, but in the very act of doing so has unveiled its designs to such an extent that no Muslim will fail to see through the game. At this critical juncture I would advise the Muslims of India to stand boldly by the communal award even though it does not concede all their demands. This is the only course they can adopt as a practical people.

তৃতীয়বারের মত গোল টেবিল বৈঠক আহূত হয় ১৯৩২ সালের নভেম্বরে। এবারও ইকবাল মুসলিম প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত হন। কিন্তু বৈঠকে তাঁর ভূমিকা আশ্চর্যজনকভাবে প্রায় অনুল্লেখযোগ্য প্রতিপন্ন হয়। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি হিসেবে তাঁর সংগ্রামী ভূমিকা ব্রিটিশ সরকারের বিরক্তির উদ্রেক করেছিল। বৈঠকে তিনি শিক্ষা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন, কিন্তু কমিটির বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি ছিল কদাচিৎ এবং প্রায় দর্শকের মতই। এ সময় তিনি বৃটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক গ্রুপের সাথে পরিচিত হন এবং ইতোপূর্বে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে দেয়া বক্তৃতায় উল্লেখিত পরিকল্পনা নিয়ে মত বিনিময় করেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য, বৈঠকে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ও বিবৃতি ইকবালকে আহত করে। হিন্দু প্রতিনিধিবর্গের উন্নাসিকতার ফলে যে বৈঠক মূলত হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক ঐক্যের সেতু বিনির্মাণ করতে চেয়েছিল তা এখন অনৈক্যের মেঘ আরো ঘনীভূত করে। বৈঠক সমাপ্তির পর অমুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং সাংবাদিকরা এর একটি মিথ্যা ও বিকৃত চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পান। এমনকি জওয়াহেরলাল নেহেরুও সবাইকে এমন একটি ধারণা দিতে চেষ্টা করেন মিঃ গান্ধী মুসলমানদের সকল দাবী গ্রহণ করতে স্বীকৃত ছিলেন, কিন্তু মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে কোন সমাধান প্রক্রিয়ায় পৌছানো সম্ভব হয়নি। ১৯৩৩-এর ৬ ডিসেম্বর ইকবাল গোল টেবিল বৈঠকে মুসলিম ভূমিকার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেন এবং নেহেরুর অসত্য বক্তব্যের নিন্দা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, আগা খানের নেতৃত্বে মুসলিম প্রতিনিধি দল কয়েকজন হিন্দু নেতার উপস্থিতিতে মিঃ গান্ধীর কাছে প্রস্তাব রাখেন, যদি মুসলমানদের ন্যায্য দাবীসমূহ মেনে নেয়া হয় তবে ভারতের সকল মুসলমানরা তার অনুগত অনুসারীতে পরিণত হবে। কিন্তু অসংখ্য শর্ত ও উপযোগিতার আবরণে মিঃ গান্ধী পরিস্থিতিকে ধোঁয়াটে করে ফেলেন এবং প্রকারান্তরে মুসলিম দাবীসমূহকে অস্বীকৃতির অন্ধকারে ঢেকে দেন।

ইকবাল ভারতে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন যা কংগ্রেসী

জাতীয়তাবাদীদের মুখরোচক শ্লোগানে পরিণত হয়েছিল। তিনি জানতেন, এ ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বাতাবরণ দেশে প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানরা স্থায়ীভাবে একটি সংখ্যালঘু জাতিতে পরিণত হবে এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও মর্জির উপর জিন্দেগী নির্বাহ করতে হবে। তিনি স্থানিক (Territorial) জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কারণ তাঁর ধারণা হয়েছিল, এতে মুসলমানদের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা বিপন্ন হবে; উপরন্তু এটি তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দর্শনের (Religio-Political ideology) অবকাঠামো ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে।

প্রকৃত অর্থে তিনি এ সমস্যার একটি সম্মানজনক সমাধান খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিলেন, যাতে উপমহাদেশে মুসলমানরা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিকভাবে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হতে পারে; কেননা তার মাধ্যমে তারা তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে পূর্ণ করতে পারবে। কিন্তু তার বিশ্বাস ছিল, এ জটিল সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান কেবলমাত্র হিন্দু নেতৃবৃন্দের উদার নৈতিক আচরণের মধ্যে নিহিত আছে এবং একমাত্র তাদের সদিচ্ছার প্রকাশ ঘটলেই এ ভয়ানক দংশন থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি এগিয়ে না আসে তা হলে মুসলমানদের আপোষকামিতার কোন প্রয়োজন নেই।

এরকম সংকটাপন্ন অবস্থায় তিনি মুসলমানদের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন, একমাত্র মুসলমানদের ঐক্যের মধ্যেই হিন্দু প্রতিরোধের মোকাবেলা সম্ভব। তিনি মুসলমানদের ঐক্যহীনতার বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। মুসলমান দল ও গোষ্ঠীর বিভিন্নতায় তার অসন্তোষের সীমা ছিল না এবং তিনি সকলকে নিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ ফোরাম গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছেন। ১৯৩২ সালের ৮ জুলাই দেয়া এক বিবৃতিতে স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর এই অপরিসীম প্রীতির উচ্চারণ ঘটেছে–

The guidance offered to the community is not always independently concieved and the result is ruptures. some times at critical moments, within our political organization. Thus these organizations can not properly develop the kind of discipline which is absolutely essential to the life and power of political bodies. To remedy this evil I suggest that the Indian Muslims should have only one political organization with provincial and district branches all over the country. Call it whatever you like. What is essential is that its constitution must be such as to make it possible for any school of political thought to come into power and to guide the community according to its own ideas and methods.

শেষ কথা

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ ঘোষণার পর ১৯৩৫ সালে ভারত সরকার আইন পাস হয়। এ আইনের কার্যকারিতা অর্জনের সাথে মুসলিম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর হতে থাকে। এ সময় মুসলিম লীগ দলীয় কোন্দল ও অদূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে জনতার সমর্থন হারিয়ে ফেলে এবং সাধারণ মুসলমানের কাছে এর উদ্দেশ্য অপ্রমাণিত হয়ে ওঠে। বৃটেন থেকে কায়েদে আযম

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রত্যাবর্তন করলে তিনি এর পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইকবাল তাঁকে ঐকান্তিকভাবে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। কায়েদে আযমের প্রধান সমস্যা ছিল পাঞ্জাব। কারণ এখানে স্যার ফজলে হোসেনের ইউনিয়নিস্ট পার্টির প্রভাব এত বেশী গভীরে প্রবেশ করেছিল যে, তার পক্ষে মুসলিম লীগের দাওয়াত পৌছানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাজনীতিতে ইউনিয়নিস্ট পার্টি পল্লী ও শহর অঞ্চলের বিভেদকে জিইয়ে রেখে পল্লী অঞ্চলের মানুষের বিশেষত পাঞ্জাবের দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের কথা বলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইকবালের প্রতীতি জন্মেছিল পল্লী ও শহরের এ কৃত্রিম ও রাজনৈতিক বিভাজন মূলত পাঞ্জাবে মুসলিম ঐক্যের বুনিয়াদে আঘাত হেনে চলেছে। এসময় আঞ্জুমানে হেমায়েত-ই-ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে দেয়া এক বক্তৃতায় ইকবাল স্যার ফজলে হোসেনের এ কার্যক্রমের নিন্দা করেন।

১৯৩৫-এ এসে ইকবালের বিশ্বাস জাগ্রত হয় একমাত্র নিখিল ভারত মুসলিম লীগই ভারতীয় মুসলমানের স্বার্থকে উজ্জীবিত করতে পারে এবং সে লক্ষ্যে মুসলিম জনতাকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাফেলায় শরীকও করাতে পারে। পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের পুনর্জীবনে তাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১২ মে ১৯৩৬-এ মিয়া আব্দুল আজিজের বাসভবনে পাঞ্জাবের নেতৃস্থানীয় মুসলিম ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে মুসলিম লীগ পাঞ্জাব শাখা পুনর্গঠন করা হয়; ইকবাল যার সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সম্মেলনে আসন্ন নির্বাচনের জন্য যে কেন্দ্রীয় সংসদীয় কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়, তার দায়িত্ব অর্পিত হয় কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উপর। পাঞ্জাবের সংকট মোকাবেলায় প্রথমত তিনি স্যার ফজলে হোসেনের মুখোমুখী হন। কিন্তু মুসলিম ঐক্যের পথে ইউনিয়নিস্ট পার্টি কাঁটা হয়েই রয়ে যায়। পরবর্তীতে জিন্নাহ ইকবালের সাহায্য প্রার্থী হলে তিনি তাকে সন্তুষ্ট চিত্তে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ সংসদীয় কমিটি গঠনে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। ইকবালের নেতৃত্বে পাঞ্জাব মুসলিম লীগ নির্বাচনী প্রস্তুতিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু নবপর্যায়ে পুনর্গঠিত মুসলিম লীগের পক্ষে ইউনিয়নিস্ট পার্টির মোকাবেলা করা ছিল রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্বভাবতঃই নির্বাচনের ফলাফল আশাব্যঞ্জক হয়নি।

ইকবালের অন্তিম দিনগুলোতে মুসলিম ভারতের রাজনীতি আশা ও আরজুর লীলায়িত তরঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ইকবাল ইন্তেকাল করেন ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে। তিনি যে বিশ্বাসবোধে জাগ্রত হয়েছিলেন এবং সর্বমানবিকতার প্রসারী এক নীল আসমানের নীচে কল্যাণময় মুসলিম রাষ্ট্রের উজ্জীবন কামনা করেছিলেন তা তাঁর সমকালে অস্তিত্ব লাভ না করলেও তাঁর জীবন দর্শন ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি মুসলিম ভারতের রাজনীতিতে এক স্বপ্ন করোজ্জ্বল রঙিন দিনের ঠিকানার সন্ধান দিয়েছিল। সে ঠিকানা উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির রংমশাল হয়ে জ্বলে উঠেছিল।

প্যান ইসলামিজম ঃ আফগানী ও ইকবাল

বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের গৌরবোজ্জ্বল পথিকৃৎ 'মিল্লাতে ইসলামিয়া'র রূপতীর্থ কবি ইকবালের বিশ্বাস ও অনুরণন উনিশ শতকে সূচিত প্যান-ইসলামী আন্দোলনের মৌল- চেতনার লক্ষণাক্রান্ত সমস্ত গুণ ও উপজীব্য বর্তমান। ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ও কবি চেতনার মূলেও মুসলিম ঐক্যের এই প্রাণ-বাণী বিধৃত। অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর স্বপ্ন ও মনন নিঃসৃত চিন্তা-ভাবনা সমকালে 'প্যান ইসলামিজম' আন্দোলনের পথ ধরে মুসলিম ঐক্য ও পুনর্জাগরণের যে অনির্বাণ মশাল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ আক্রান্ত ইসলামী দুনিয়ায় উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল—ইকবাল তারই রজতপ্রভা বিশ শতকের মলিন আকাশে মুঠি মুঠি করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মুসলিম জাগরণের দীপ্ত প্রদোষে ইকবালের মনোভূমিতে যে গভীর এবং সদর্থক বিশ্বাসের পলি জমা হয়েছিল নবজাগরণের আলো ঝলমল পথ কেটে ইকবাল মিল্লাতে ইসলামিয়ার যে নতুন তাজমহল নির্মাণ করলেন তার প্রকৃতি বিচারের সুবিধার্থে আমাদেরকে এখন এই ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হবে।

প্যান ইসলামী আন্দোলনের পশ্চাৎভূমি মূলত ইসলামের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের মধ্যেই বিস্তৃত। মানবজাতির কল্যাণকামিতার নিশান উঁচিয়ে এই জীবন ধর্মের যাত্রা শুরু এবং পৃথিবী থেকে বর্ণ- গোত্র-ভূগোলের বৈষম্য উৎসাদনের মাধ্যমে ইসলামের চিত্ররূপময় কারুকার্য বিভূষিত। কোরআন এবং সুন্নাহর প্রতিফলিত বিশ্বাসের কার্যকরী চিত্রের একটি দিক সকল গোত্রীয় তাৎপর্যকে মানবতার বৃহত্তর ঐক্য ভাবনার পশ্চাতে নিক্ষেপ। পবিত্র কোরআনে বৈশ্বিক জীবনের এই ইংগিত অত্যন্ত স্পষ্ট। যেমন– মুমিনরা হচ্ছে পরস্পরের ভাই।

একইভাবে রাসূল (সঃ)-এর মনোবীণায় এবং কর্মসাধনায় এই ঐক্যভাবনা প্রবলভাবে গ্রথিত। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ)-এর বিভিন্ন হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে, যার অন্তর্গত তাৎপর্য মানবিকতার বৃহত্তর পটভূমিতে বিস্তৃত এবং শাশ্বত নৈতিক মূল্যমান ও কল্যাণ বোধের প্রেরণায় মিল্লাতের প্রতিটি সদস্যের মহাজৈবনিক উত্তরণ। যেমন-

"মুসলমানরা একটি দেয়াল সদৃশ, যার এক অংশ অন্য অংশকে রক্ষা করে। মুসলমানরা একটি দেহের মত; যদি চক্ষু আক্রান্ত হয়, সর্ব শরীর ব্যথা অনুভব করে, যদি পা আক্রান্ত হয় তখনও সর্ব শরীর মূর্ছিত হয়।"

হযরত রাসূল (সঃ)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণও বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনাবাহী গৌরব অলংকার। বিশাল জনতার সম্মুখে খুতবা দানের সময় তিনি উল্লেখ করেছিলেন–

মনে রেখ! সব মুসলমান ভাই ভাই। কেউ কারও চেয়ে ছোট নও। কারও চেয়ে বড় নও। আল্লাহর চোখে সকলেই সমান। প্রত্যেক মুসলমানের ধন-প্রাণ পবিত্র বলে জানবে। যেমন পবিত্র আজকের এই দিন–ঠিক তেমনই পবিত্র তোমাদের পরস্পরের জীবন ও ধন-সম্পদ। মুসলমানের অত্যাবশ্যকীয় কর্ম যে হজ্জ যা তার বিশ্বাসেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের উজ্জীবনে স্মরণাতীত কাল থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে। ঐতিহাসিক কাল থেকেই মুসলমানরা কোন প্রকার পাসপোর্ট ও ভিসা ছাড়াই বিভিন্ন মুসলিম ভূখন্ডে পরিভ্রমণ করেছে এবং ইচ্ছামত বিভিন্ন মুসলিম ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করেছে, এমনকি নতুন জায়গায় তারা রাষ্ট্র ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদও দখল করেছে। এক্ষেত্রে ভূখন্ডের পরিচিতি বড় হয়ে দেখা দেয়নি; উপরন্তু বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বই সকলের উপরে স্থান

পেয়েছে। মুসলিম দুনিয়া যখন সংকীর্ণ গোত্রীয় ও আঞ্চলিকতার শিকার– তখনও এ রীতি-পদ্ধতি বর্তমান ছিল। ইসলামী ইতিহাসের এই মহামানবিক চিত্র উঠে এসেছে Grunebaum-এর লেখনীতে ঃ

In accordance with this attitude. the law Considered any Muslim a full-fledged Citizen' of the Muslim- ruled state in which he happened to find himself. Hence the possibility of taking employment in distant Countries under different princes in one sense no Muslim could be an alien in any Muslim land.

(Modern Islam- G. E. V. Grunebaum)

ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক ইসলামী দুনিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই এ নীতির আমূল পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের স্বার্থে ইউরোপীয় শক্তি তখন নানাবিধ ভৌগোলিক বিধি-নিষেধ আরোপ করে যা ইসলামের সার্বজনীন নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানদের তারা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তার আড়ালে বিভূষিত করে এবং তাদের চলাচল ও মুক্ত গমনাগমনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সময়ের আবর্তনে এই বাধা অধিক প্রবল হয়ে ওঠে এবং মুসলিম দুনিয়া পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহের মুখে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইসলামী ঐক্যের সার্বজনীন চেতনা এমনিভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং পাশ্চাত্যের কুমন্ত্রণায় মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নবনীত শ্যামচ্ছায়া কোমল দুর্বাদল অপসৃত হয়।

ইসলামী ঐক্য, মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য অন্য কথায়, প্যান ইসলামিজম -এর মৌল চেতনাটি প্রবাহিত খেলাফতের সার্বজনীন অধিষ্ঠানের মধ্যে যার সোজাসুজি অর্থ করলে দাঁড়ায় মুসলিম দুনিয়ায় খলিফার শাসন। আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত প্রদানে যিনি বিশেষভাবে ক্ষমতাবান। শাসনতান্ত্রিক নীতিমালা রাষ্ট্রীয় আইন-পদ্ধতি এবং ধর্মীয় ব্যাখ্যাবলীর ক্ষেত্রেও খলিফার অনুমতি যেখানে বিশেষভাবে জরুরী। ইসলামী খেলাফত বিশ্বাসীদের এক ঐক্য সাধনের তপোভূমি যেখানে খোদায়ী কানুন সকল সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিষয়াবলী পরিচালনার একমাত্র নিয়ামক। এই উজ্জীবক ও প্রেরণাসৃষ্টিকারী আদর্শের বিস্তৃতি মূলত রাসূল (সঃ) ও তাঁর খলিফা চতুষ্টয়ের জীবদ্দশায় সীমিত। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাস রক্তরাঙা বেদনাবিধুর গোত্রীয় এবং ভৌগোলিক যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ। যদিও তখনও খিলাফতের অবয়বিক কাঠামো বর্তমান ছিল কিন্তু বাগদাদের পতনের পর তার অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ে। একথা সত্য, ইসলামের প্রাথমিক খলিফা চতুষ্টয়ের তিরোধানের পর খিলাফত নিছক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং এর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ছিনতাই হয়ে যায় বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী মুসলিম শাসকদের যুক্তিহীন কর্মকান্ডের মাধ্যমে। মুসলিম ইতিহাসে উসমানী শাসকরাই খেলাফতের শেষ জিম্মাদার। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত উসমানী খলিফারা মুসলিম দুনিয়ার বিরাট অংশের উপর নিজেদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রাধান্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্তীকালে খলিফাদের অযোগ্যতা ও নীতিহীনতার শিকার হয়ে মুসলিম খেলাফত তার সার্বভৌম চারিত্র্য হারিয়ে বসে এবং পর্যায়ক্রমে বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। GEORGE LENCZOWSKI লিখেছেন–

It was in these Circumstances that the Muslim world became a prey to western imperialism. and province after Province of the former ottoman empire was occupied by one western power or another.

(The Middle east in world affairs)

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য চিরদিনের জন্য অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। ১৮৫৯-১৮৬৪ সালের মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া মুসলিম ককেশাসে

দখলদারিত্ব কায়েম করে এবং ১৮৮৬ সালের মধ্যে উজবেকিস্তান রাশিয়ার পদানত হয়। এ পরিস্থিতিতে রাশিয়ার সীমান্ত ইরান ও আফগানিস্তানের দোরগোড়ায় এসে পৌছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আফগানিস্তানকে কেন্দ্র করে কুটিল রাজনীতির সূচনা করে এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। একই সময় ইরান পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের নাজুক ক্রীড়াকেন্দ্রে পরিণত হয় এবং দুর্বল কাচারশাহী সাম্রাজ্যবাদের অযৌক্তিক দাবী-দাওয়ার মুখে দুলতে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেশটিতে শুরু হয় সীমাহীন নৈরাজ্য। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব কায়েম হয়। ১৮৫০ সালে উত্তর আফ্রিকা, আলজেরিয়া ফরাসী অধিকারে আসে। ১৮৮১ সালে তিউনিসিয়া ফরাসী আশ্রিতে (PROTECTORATE) পরিণত হয়। এর এক বছর পরই বৃটেন আরবী পাশার বিদ্রোহ দমন করে মিসরে আধিপত্য কায়েম করে। অন্যদিকে পূর্ব ইউরোপে তখন উসমানী সালতানাতের দুর্দিন। বসনিয়া, হারজেগোভিনা, বুলগেরিয়ার মত অনেক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা তাদের হাতছাড়া–অমুসলিম শক্তির কুক্ষিগত। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র সৌদী আরবেও তখন চলছে এক সার্বিক বিপর্যয়। নামমাত্র উসমানী খেলাফতের অধীন থাকলেও গোত্রীয় ও জাতিগত কলহ এবং সর্বোপরি পশ্চিমী ষড়যন্ত্রের মুখে আরবও বিধ্বংসের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তুরস্কের নিজের অবস্থানও তথৈবচ। রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক পশ্চাৎপদতা এবং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি দেশটিকে মহাবিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ইসলামী দুনিয়া জুড়ে এই যে ঘোরতর বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের স্রোতধারা চলছে, এরি মধ্যে পশ্চিমীকরণের একটি বৈরী প্রক্রিয়া ঘোরতর হয়ে এলো; ইসলামী দুনিয়ার অস্তিত্বের জন্য যা আরও মারাত্মক দুঃসহ মনে হল। এই সন্দেহ, এই অবিশ্বাসের যুগের ছবি এঁকেছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব ফজলুর রহমান–

The unsettlement that ensued from the political defeats and subjugation rendered the Muslim psychologically less capable of rethinking his heritage. and meeting the intellectual challenge of modern thought by assimilative creative processes and the christian challenge that came directly to this heritage. All these diverse elements of this whole phenomenon. therefore have left an irresistable impression....... that Islam has become internally incapable of reconstitutting itself and whatever it might do by way of reconstruction. if at all it can. will be done by influence and borrowings from the west. (Islam-Fazlur Rahman).

উনবিংশ শতাব্দীর এমনি বেদনার্ত দিনগুলোতে এমনি তিক্ততা ও বর্বরতার মুহূর্তগুলোতে মুসলিম দুনিয়ায় প্যান ইসলামী আন্দোলনের সূত্রপাত। মুক্তির আলোকে, বিশ্বাসের তীব্রতায় জীবনের কল্লোলিত শক্তির দ্যোৎনায়– এ আন্দোলনের নেতৃপদ গ্রহণ করলেন সৈয়দ জামাল উদ্দীন আফগানী; অসাধারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব, বিপুল তাঁর জীবনীশক্তি, প্রখর তাঁর বিশ্বাসের জ্বালা এবং দূরদর্শী তাঁর নেতৃত্ব। যেখানেই তিনি পা রেখেছেন সেখানেই জাগরণের কল্লোলিত স্রোত উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তাঁর উদ্দেশ্য ও কর্মাবলী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একদল ত্যাগী মানুষের প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন হয়েছে। ফজলুর রহমান লিখেছেন ঃ

His Pan-Islamism was basically a doctrine of the unity of the Muslim world and constitutionalism. (Islam- Fazlur Rahman)

আফগানী চেয়েছিলেন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুসলিম দুনিয়ার মুক্তি এবং মুসলিম উম্মার মধ্যে এক সার্বিক জাগরণ সৃষ্টি। ইসলামী আদর্শের নিরিখে ঐক্য, বিশুদ্ধতা ও সমৃদ্ধির একটি আবহ নির্মাণও ছিল তাঁর কাম্য। জামালউদ্দীন আফগানীই প্রথম বিভেদাক্রান্ত মুসলিম দুনিয়ায় ঐক্যের গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ঐক্যের মধ্যেই ভবিষ্যতের মুসলিম দুনিয়ার স্বর্ণোজ্জ্বল চিত্র নির্মাণ করেন। আফগানীই প্রথম ইসলামের আধুনিক মূল্যবোধের নিরিখে আত্মবিশ্বাসহীন মুসলমানের অন্তরে অগ্নিশিখার জন্ম দেন।

সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর জন্ম ১৮৩৯ সালে; কাবুলের সন্নিকটে আসাদাবাদে। স্থানীয় মক্তবে তাঁর লেখাপড়ার হাতে খড়ি। আঠার বছর বয়সকালের মধ্যে আফগানীর এ সময়ের অর্জিত জ্ঞানের একটি সালংকার বর্ণনা দিয়েছেন CHARLES ADAMS তার Islam and Modernism in Egypt গ্রন্থে ঃ

By the time he was eighteen he had studied practically the whole range of Muslim sciences and acquired a remarkable familiarity with Arabic grammar. Philosophy and rhetoric in all branches. Muslim history. Muslim theology. sufism. logic philosophy. physics. metaphysics. mathematics. astronomy. medicine. anatomy and various other subjects.

আঠার বছর বয়সে তিনি ভারতে আসেন এবং বছরাধিককাল এখানে অবস্থান করেন। ভারতে থাকাকালীন তিনি কিছু ইংরেজী শিক্ষা করেন, পাশাপাশি ফিরিঙ্গি শাসিত মজলুম ভাঁরতীয় মুসলমানদের দুর্দশাও তাঁর নজরে আসে। এখান থেকে তিনি মক্কা গমন করেন। ভারতে তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত হলেও এখানকার মুসলমানরা তাঁর এ আগমনে বিপুলভাবে উজ্জীবিত হন। NIKKI R. KEDDIE লিখেছেন ঃ

The Visit was short but his personality left a deep impact on the Indian Muslims.

(Sayyid Jamal Al Din Al Afghani First period in the Middle east Journal)

আফগানীর জীবনীকাররা ভারতীয় মুসলমানদের উপর তাঁর চিন্তা ও আদর্শের প্রভাবের কথাই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁর ধারণা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহের পর অশান্ত ভারতীয় জনজীবনের চিত্র বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বৈরিতা আফগানীকে সুনির্দিষ্টভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার করে তোলে।

The events of the Mutiny of 1857 and the Social political and economic miseries to which the Muslims were subjected during the post-mutiny period had to do a great deal in fashioning the opinions of Afghani against British imperialism.

NIKKI R. KEDDIE আরো লিখেছেন ঃ

The revolutionary movement in thought and action led by Syed Ahmad Brelvi which may have influenced Afghani in developing antiwestern revolutionary and positive approach to the problems of Contemporary Islam.

(Sayyid Jamal Al Din Al Afghani First period in the Middle east journal)

১৮৬৪ সালে আফগানী দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং আমীর দোস্ত মোহাম্মদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। কিন্তু ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মুখে আফগানী দেশত্যাগ করেন।

১৮৬৯ সালে ভারতের মধ্যদিয়ে তিনি কায়রো গমন করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর আফগানী ইস্তাম্বুলে হাজির হন। সুলতান আব্দুল হামীদ তাঁকে উষ্ণ সম্বর্ধনা জানান এবং রাজন্যবর্গ ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু আফগানীর অসম সাহসিকতা, বিশ্বাসের গভীরতা এবং সত্যপ্রিয়তা তৎকালীন তুরস্কের শায়খ-উল-ইসলামের নেতৃত্বে গুটিকয়েক স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন আলেমদের বিব্রত করে তোলে। আফগানীর জীবনীকার লিখেছেন ঃ

For the sake of order. the Sultanis government told Afghani to leave the Country. and he returned to Cairo on March 22. 1871.

(Mazamin gamal-ud-Din Afghani- Muhammad Abdul Quddus Kazmi)

মিসর সরকার আফগানীকে সামান্য বৃত্তি মঞ্জুর করেন এবং তিনি সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেন। কায়রোতে আফগানীর একদল ছাত্র ও শিষ্য গড়ে ওঠে। তিনি তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। অধিকাংশ সময় আফগানী এদের নিজের বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার আলোকে গড়ে তোলবার চেষ্টায় নিয়োজিত হন। এ ছাড়া তিনি মিসরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ব্যাপারেও খোলাখুলি মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন এবং জনগণকে বিদেশী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দেন। আফগানী তাঁর লেখনীর মাধ্যমেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ উন্মোচন করতে শুরু করেন। মিসরের ভবিষ্যত নিয়ে বৃটেন যে ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু করেছিল আফগানীর তা মোটেই নজর এড়ায়নি। তাই তিনি দু'হাত খুলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন। পরিণতিতে–

These activities Continued for eight years. Culminating in his expulsion from Egypt in September 1879.

(Syed gamal-ud-Din Afghani-Maulana Zafar Ali Khan)

মিসর থেকে বহিষ্কারের পর আফগানী ভারতে আসেন এবং দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। এখানে তাঁর অবস্থানকালে মিসরের যুব সমাজ আরবী পাশার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যার বীজ আফগানী অনতিকাল আগেই মিসরের মাটিতে নিজ হাতে রোপণ করে এসেছিলেন। মিসরের এই জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে কলকাতায় অন্তরীণ করে রাখে। বিদ্রোহ শেষে আফগানীকে মুক্তি দেয়া হলে তিনি ভারত ত্যাগ করেন এবং সেখান থেকে লন্ডন, পরে প্যারিসে হাজির হন। প্যারিসে থাকাকালীন আফগানী মুসলিম দুনিয়ায় পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের কালো থাবার বিরুদ্ধে বিপুল প্রচারণা শুরু করেন। ১৮৮৪ সালে পুরনো ছাত্র মোহাম্মদ আবদুহুর সাথে আফগানীর মিলন ঘটে। আবদুহু মিসরে আরবী পাশার বিদ্রোহের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে বহিষ্কৃত হন। গুরু-শিষ্যের যৌথ উদ্যোগ ও কর্মপন্থায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার আগুন এবার দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে –

They used their joint efforts to edit an Arabic weekly Called Al Urwah al Wuthkah (The Indissoluble Bond) with the sole object of arousing the Muslims to organize their scattered political religious forces to stop western aggression and exploitation in Muslim lands.

(Maqam-i-Jamal-ud-Din Afghani-Abdul Hasnat Nadvi)

আরবী পত্রিকা আল উরওয়াতুল উসকার (অচ্ছেদ্য গ্রন্থি) প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৮৪ সালের ১৩ মার্চ। পত্রিকাটির মোট আঠার সংখ্যা প্রকাশিত হয়। শেষ সংখ্যা প্রকাশের তারিখ

১৬ অক্টোবর ১৮৮৪। আল উরওয়াতুল উসকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আফগানী সোভিয়েট রাশিয়া গমন করেন এবং মস্কো ও সেন্ট পিটার্সবার্গে অনধিক চার বছর অবস্থান করেন।

মিউনিখে অবস্থানকালে ১৮৮৯ সালে আফগানীর সাথে ইরান সম্রাট শাহ নাসির উদ্দীনের মোলাকাত ঘটে। শাহ নাসির উদ্দীন আফগানীকে ইরানের প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ইরান সম্রাট শাহ নাসির উদ্দীনের সাথে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘদিন মধুর থাকেনি। আফগানীর বিশ্ব মুসলিম চিন্তা অকর্মন্য দুঃশাসক শাহ নাসির উদ্দীনকে বিব্রত করে তোলে এবং–

and about the close of 1889 or the begining of 1890. Afghani was expelled from the Country. (Syed jamal-Ud-Din-Zia-ud-Din Barani)

ইরান থেকে বসরা এবং সেখান থেকে আফগানী লন্ডন যান। ১৮৯২ সালে তিনি শেষবারের মত ইস্তাম্বুল রওয়ানা হন। এখানেই তাঁর চিরদিনের শেষ মনজিলে নির্ধারিত হয়। আফগানীর ইন্তেকালের তারিখ ছিল ৯ মার্চ, ১৮৯৭ সাল। অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউন আফগানীর অসাধারণ জীবন ও কর্মের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে ঃ

Enormous force of Character. prodigious learning. untiring activity. dauntless Courage. extra-ordinary eloquence both in Speech and in writing. and an appearance equally striking and majestic. He was at once a philosopher. writer. orator and journalist. but above all politician. and was regarded by his admirers as a great patriot and by his antagonists as a dangerous agitator. (Persian Revolution)

আফগানীর জীবনের লক্ষ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের দখলদারিত্ব থেকে মুসলিম দুনিয়ার আযাদী ও মুক্তি। সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের কবলে পতিত প্রাচ্যের রক্তরাঙা চিত্র তাঁকে ব্যথিত করেছিল। আল উরওয়াতুল উসকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

The Eastern people are being subjected to extreme tyranny and high handedness by the west. Most of them are passing through the worst stages of their history. Especially the Muslims have been treated in an extremly shabby manner. Princes have been de Throned by force. and the aristocracy has been deprived of its privileges.

আফগানীর রচনাবলী মুসলিম দুনিয়ার ঐতিহ্য আবিষ্কারে বার বার যাত্রা শুরু করেছে। মুসলমানদেরকে তিনি তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে বলতে চেয়েছেন– তারা আজ কোন্ অন্ধকার ও হতাশার সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। আফগানীর বিশ্বাস জন্মেছিল, এই বিপর্যয়ের একটি মাত্রই কারণ— মুসলিম মিল্লাতের অনৈক্য। তিনি আক্ষেপ করেছেন—

The main Cause was the disunity among the ranks of ummat which had shaken its stability and security. Unity of pupose and single minded devotion to the Common cause had disappeared and the Vitality which resulted from Collective endeavour had Vanished from the Muslims world. (Cited from Magalat-i- Jamal-ud-Din Afghani)

আল উরওয়াতুল উসকায় প্রকাশিত একই নিবন্ধে তিনি আরো উল্লেখ করেছেন ঃ

.... nefarious activities of selfish people have obstructed the progress of Islam and that for the Muslims, Islam is the only nationality. (Cited from Maqalat-i-Jammal-ud-Din Afghani)

আফগানী পরিষ্কারভাবে বলেছেন—

ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ ইসলামী আদর্শের পরিপন্থী। তিনি মনে করেন, এই সত্যের গভীরতা প্রতীয়মান হবে তখনই যখন সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কোরআনী আদর্শের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুসরণ শুরু করবে। আফগানীর বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম মুসলিম দুনিয়ার এই পুনর্জাগরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছিল মুসলিম উম্মার অনৈক্য কেমন করে তাদের প্রাগ্রসর চেতনা ও মূল্যবোধকে বিপর্যস্ত করে চলেছে এবং বিশ্ব সমাজে তাদের অবস্থানকে হতোদ্যম ও নিরুৎসাহিত করে তুলেছে। আফগানীর ধারণা, এই অনৈক্য কোরআনী মূল্যবোধ থেকে তাদের স্বেচ্ছাকৃত পশ্চাদপসরণের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। তাই তিনি মনে করেন, ইসলামের বিজয় ও নবজাগরণের জন্য এবং সর্বোপরি মুসলিম দুনিয়ার নিরাপত্তার খাতিরে সর্বপ্রকার আঞ্চলিকতা ও গোত্রপ্রীতির উৎসাদন প্রয়োজন। আফগানীর ধারণা, প্রাথমিকভাবে মুসলিম দুনিয়ায় বিদেশী আধিপত্য মোকাবেলা করা জরুরী, কেননা গোলামীর জিঞ্জিরে আটক কওমের এই জাগরণ ও উত্থান প্রচেষ্টা কোনক্রমেই কামিয়াবী হাসিল করতে পারবে না।

পাক-ভারত উপমহাদেশে আফগানীর ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং আদর্শিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। যদিও পৃথিবীর এই প্রান্তে এই মনস্বী পুরুষের অবস্থান ছিল খন্ডকালীন, কিন্তু তিনি জনজাগরণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবস্থান এখানে সৃষ্টি করেছিলেন। WELFRED SCAWEN BLUNT তাঁর রোজনামচার পাতায় উপমহাদেশে আফগানীর এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার কথা বিবৃত করেছেন ঃ

For Jamal-ud-Din they professed something like worship.

(India under Ripon— A Private Diary)

বিশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী এবং ইসলামী চিন্তাবিদ এই মনস্বী পুরুষের অসাধারণ কর্মকান্ডের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী ডঃ স্যার আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বিশ শতকের সূচনা পর্বে লন্ডনে PAN ISLAMIC SOCIETY গোড়াপত্তন করেন এবং আফগানীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে PAN ISLAM নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল ঃ মুসলিম সংহতি বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় মুসলমানদের পারস্পরিক সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ আফগানীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এভাবে ঃ

During the reform and resurrection in the East during the nineteenth Century, there is hardly a personality which can, in natural brilliance, and creative power be compared to Syed Jamal-ud-Din. It can be unhesitatingly said that he ranks Very high among the makers of history and leaders of thought of modern East.

(Abul Kalam Azad, Syed Jamal-ud-Din Asadabadi in Maqam-i- Jamal-ud-din Afghani)

আফগানীর প্যান ইসলামী আন্দোলনের গভীরতা, আদর্শিক উত্তাপ, বিশ্ব মুসলিম ঐক্য ভাবনায় এর আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব এবং তৃণমূল পর্যায়ে এর বিস্তার মহামান্য আগা খানের লেখনীতেও পরিস্ফুটিত হয়েছে ঃ

There is a right and legitimate Pan-Islamism to which every sencere and believing Muhammadan belongs -that is the theory of the spiritual brotherhood. and unity of the children of the prophet. It is a deep. parennial element in perso Arabian Culture. It connotes charity and good will towards fellow believers everywhere from china to Morocco. from Volga to Singapore. The real Spiritual and Cultural Unity of Islam must ever grow. for to the followers of the prophet. it is the foundation of the life of the soul.

(India in Transition- The Agha Khan)

সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানীর দ্রোহ মন্ত্র উপমহাদেশের মুসলমানদের নব উদ্দীপনা দিয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাস নির্মাণে ভারতের মুসলমানরা নব-জাগরণের পথ ধরে জেগে উঠল। যা ছিল তাদের ধর্মীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ জিহাদ। আফগানীর প্রেরণায় সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলায় তা হয়ে উঠল আরো সজীব, প্রানবন্ত। তাই দেখা গেল আফগানীর মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যেই উপমহাদেশের খেলাফত আন্দোলন, স্বাধিকার-স্বতন্ত্রের লড়াই এবং পরিণতিতে স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জনের সংগ্রামে মুসলমানরা সর্বাধিক ত্যাগ ও কোরবানীর নজীর স্থাপন করল। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মুক্তি ও কল্যাণের উদগাতা হওয়া সত্ত্বেও আফগানী বিশেষ করে উপমহাদেশে চিরঞ্জীব হয়ে রইলেন তাদের আযাদীর অন্যতম গৌরব দিশারীরূপে।

ইকবালের ঋদ্ধ মনন ও কবি চেতনার গৈরিক স্রাবে ভারতীয় মুসলিম মানসে যে বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটেছিল তা এক কথায় তুলনা রহিত। তিনি জাতীয় জাগরণের কবি- এ কথা যেমন সত্য, তার চেয়েও বড় সত্য তিনি তার কবিতায় ইসলামের যে শুদ্ধতম রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন তা পরাধীন ভারতীয় মুসলমানদের মর্মমূলে, জীবনের অনন্ত আশাবাদে আলোকিত হয়ে উঠেছিল।

মিল্লাতে ইসলামিয়ার ফুল-চন্দন সুগন্ধির উপচারে তিনি তাঁর কবি ভাবনার অনন্ত বিশ্বকে সাজিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর মানসভূমি প্রস্তুত হয়েছিল এমন একটা সময় যখন প্যান-ইসলামিজমের মর্মজ্ঞ অবয়বিক কাঠামো ভারতীয় জনজীবনে বিস্তৃতি লাভ করেছিল; পরাধীনতার অসহায়ত্বের কোলে মাথা রেখেও দূরতিক্রম্য স্বপ্নের মধ্যেও পল্লবিত আশার বিদ্যুৎ ঝলক খুঁজে পেয়েছিল। ইকবালও কি এই আশায়, ভবিষ্যতের এমনি কোন উষশী স্বপ্নে জেগে ওঠেননি?

ইকবাল তাঁর জাবিদনামায় আফগানীর মহাজীবনের এক কল্যাণব্রতী বৈশ্বিক চিত্র হাজির করেছেন। জাবিদনামা ইকবালের ডিভাইন কমেডি। মুর্শিদ রুমীর প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনি পরিভ্রমণ করেন পৃথিবী ছাড়িয়ে দূরে; অনন্ত বিশ্বের কোলে। এই আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সফরে ইকবালের সাথে মোলাকাত হয় বিভিন্ন নন্দিত মানুষের- যাঁরা পৃথিবীতে বিশেষত ইসলামের ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন।

এরপর ইকবাল উপস্থিত হন এক মনমৌজ বলাকা প্রান্তরে, যেখানে মানবস্পর্শের অভিমান জন্মেনি অদ্যাবধি -নিসর্গ যেখানে রূপের অবিশ্রান্ত ডালি মেলে ধরেছে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ-ত্রিকাল যেখানে একাকার। ধূসর অতীত, হারানো সুর, বর্তমানের জীবনবৃত্ত আর

স্বপ্নায়িত ভাবীকালের ত্রিমাত্রিক মেলোড্রামা রজত উদ্ভাসে একই মঞ্চে আলোড়িত হয় যেখানে। ইকবাল মুগ্ধ হন। তাঁর কবি চিত্ত আলোড়িত হয়।

শ্রুতি দৃশ্যে তিনি মুখোমুখী হন সুললিত আজানের। অনতিদূরে মাওলানা রুমীর অস্থির পায়চারি। তিনি তাকে আশ্বস্ত করেন সংরক্ষিত এই স্থান– খোদার বান্দাদের জন্য। ফুজায়েল বু'সাঈদ, জুনায়েদ এবং বায়জিদের মত খোদা-প্রেমীরাই কেবলমাত্র এখানে প্রবেশাধিকার পায়। মুর্শিদ রুমী ইকবালকে সালাতে আহবান করেন। রুমীর ভাষায় 'সালাতুল ইশক'– প্রেমিক মানুষের আল্লাহ্ ভাবনা; যা কি-না বস্তু-পৃথিবীতে কষ্টকল্পিত।

রুমী ও ইকবাল এগিয়ে যান। সমুখে সিজদারত দু'জন খোদাপ্রেমী –জামালুদ্দীন আফগানী ও সাঈদ হালিম পাশা। রুমী ইকবালকে পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বলেন ঃ প্রাচ্য অহংকৃত তাঁর এই দুই সন্তানের জন্য—যাঁরা প্রাচ্যের যুগোত্তরণের পথিকৃত সাধনাময় মুক্তিপথের নীল দিগন্ত।

আফগানীর ইন্দ্রধনু প্রাচ্যের মানব-মানবীকে এক গভীর বর্ণ-ব্যঞ্জনায় জীবন সাধনায় পরিব্যপ্ত করেছে। হালিম পাশার বিশ্ববিক্ষা-গভীর জীবনবোধ প্রাচ্যের আকাশে আলো ছড়িয়েছে।

আফগানী সালাতে পবিত্র কোরআনের সূরা-আন্ নজম থেকে তিলাওয়াত করছিলেন। তাঁর এই আবৃত্তি আলেখ্যর সাথে ঝরে পড়ছিল এক অনুভূতিময় আকাশ, উদ্দীপনাময় সহস্র দীপিকা। এই সুরার গভীরতা, আবৃত্তিকারের রাগবিস্তার ক্ষমতা এবং পবিত্র কোরআনের সুরেলা ও হৃদয়স্পর্শী ব্যঞ্জনা সব মিলিয়ে পারিপার্শ্বিক সৌষ্ঠব হয়ে উঠল সজীব ও প্রাণপূর্ণ। ইব্রাহীম ও জিব্রাইল (আঃ) যদি মানবিক আবেগের এই স্বতঃষ্চারিত ব্যঞ্জনা শুনতেন তাহলে হয়ত নতুন কোন আনন্দলোকে উপনীত হতেন। এই আবৃত্তির স্বরক্ষেপের অনুরণ-সৌষ্ঠবে যেন প্রসারিত উন্মোচিত হল বিশ্বজগতের রহস্য-বাইরের কোলাহল থেকে ভেতরের গুহ্যাতিগুহ্য কোন মর্মজ্ঞ।

সালাত শেষে ইকবাল আফগানীর প্রসারিত হস্তে চুম্বন এঁকে দিলেন। মুর্শিদ রুমী কবিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন– অস্থির চিত্ত, বিশ্রান্ত পথিক ও অনন্ত স্বাপ্নিক হিসেবে। রুমী ইকবালকে অভিনন্দিত করলেন জিন্দারূদ–জীবন্ত নদী রূপে।

আফগানী কবির কাছে পৃথিবীর মানুষের অবস্থা-আরো বিশেষ করে মুসলমানদের অবস্থা জানতে চাইলেন।

কবি বর্ণনা করলেন কঠিন পীড়নে মুসলমানের রক্তাক্ত আকাশের সেই ছবি। যে কওমের একদিন অভ্যুত্থান ঘটেছিল পৃথিবী শাসনের, পৃথিবীর নবজাগরণের অগ্রনায়ক হিসেবে। তারা আজ ধর্ম ও ভূগোলের পীড়নে ক্ষতবিক্ষত। বিশ্বাসের মর্মজ্বালা থেকে তারা বঞ্চিত এমনকি ইসলামের বিশ্বাশ্রিত সত্য বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ থেকেও অপসৃত।

জাতীয়তাবাদের বাঘের উপর তারা আজ সওয়ার। ইরানী ও তুর্কীরা পশ্চিমের সুরা রসে উজ্জীবিত। তারা আজ পশ্চিমের গড়া ফাঁদে বন্দী; অপরদিকে খোদাহীনতার প্রতিভূ কমিউনিজম মিল্লাতের ইজ্জত নিয়ে শুরু করেছে ক্রুর ও পৈশাচিকতার খেলা ঃ

ঈমানের কমজোর আত্মাকে বানিয়েছে মৃর্ত
ঈশ্বরের ধর্মে বলীয়ান তারা নয়
তুর্কী আরব পারস্য উজ্জীবিত ইউরোপের মাদকতায়
কিন্তু তারা অবগত নয় ইউরোপের লৌহশলাকা
বিদ্ধ তাদের গলায়–
প্রাচী আজ বিবসনা প্রতীচ্যের লালসায়
কওমের ইন্দ্রধনু ছিনিয়ে নিয়েছে কমিউনিস্ট প্রেতাত্মা।।

আফগানী ব্যথিত হন। মর্মজ্বালা প্রখর হয়ে ওঠে মুখের রেখায় রেখায়। তিনি বলতে থাকেন ঃ পশ্চিমী প্রতারকরা পূর্বীয় দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে। তারা নিজেরা সাম্রাজ্যবাদের লালন করছে অথচ জাতীয়তাবাদের আপাত স্বচ্ছ অলঙ্কার বাহুল্যে বিভক্তির বীজ ছড়িয়ে দিয়েছে তোমাদের মাটিতে।

আফগানী ইকবালকে আহবান করেন ঃ ওঠ! ছুঁড়ে ফেল এই বন্দী কারাগারের ঘেরাটোপ। ছড়িয়ে পড় মুক্ত বিশ্বে। মুসলমানের কাছে সব দেশই তার স্বদেশ। তার স্থান দেশাতীত. যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও ভেঙ্গে দাও ইট আর পাথরের তৈরী পৃথিবীর সীমানা. এস সবাই মিলে আমরা ধৌত করি বস্তুতান্ত্রিকতার ক্লেদাক্ত শরীর।

আফগানী ইকবালকে আরো বলেন– যে আল্লাহকে উপলব্ধি করে বিশ্ব তাকে ধারণ করতে পারেনা। সে হয় পুরুষোত্তম। মৃত্তিকার তৈরী মানুষ কিন্তু তার আত্মন স্বর্গীয়। তার বহিরংগ এই পৃথিবীর জীবনের সাথে একাকার কিন্তু অন্তরংগ অন্য পৃথিবীর মুসাফির। ভোগ আর প্রাচুর্যে আত্মন অসুস্থ হয়; সীমাবদ্ধ হয়ে আসে তার জৈবনিক চেতনা. বৈশ্বিক মূল্যবোধ। জাতীয়তাবাদের তরি গুটিয়ে আনে বিশ্ব মানবতাকে। কিন্তু শাহীন বাস করেনা খাঁচায়। তার বাস উর্ধ্বে অনেক উর্ধ্বে—আকাশের নীলিমায়। ধূলি আর মুক্তার তৈরী ভূখন্ড যাকে আমরা বলি দেশ. নানা নামে তাকে ডাকি মিসর, সিরিয়া, ইরাক; কিবা আসে যায় তাতে। এই সীমানা ছাড়িয়ে দূরে দৃষ্টি মেলে দিতে পারি আমরা. যেমন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে কিন্তু আলো ছড়িয়ে যায় সর্বত্র।

কমিউনিজম সম্পর্কে আফগানীর মতামত আরো চিত্তাকর্ষক। তাঁর ধারণা এ হলো এক ইহুদী পন্ডিতের মন-মানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতগত প্রমাণ। পন্ডিতের হাতে ছিল গ্রন্থ, কিন্তু ছিলনা ঐশী বাতি। বাতিহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে এ প্রতিবাদী লৌকিক পুরুষ হারিয়ে ফেলেছিলেন অলৌকিকতার জ্ঞান। সত্যের অমর লোকে পৌঁছে যেতে যেতে এক রকম অগোচরে হাতে তুলে নিয়েছিলেন মিথ্যার অভিনব জীবন চর্যা। পশ্চিমের ব্যর্থতা আভাসিত হয়েছে বিশ্বাশ্রিত সত্যের মুখোমুখী না হয়ে উদরের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে। কেননা কমিউনিজমের প্রাণ শক্তি উদরের সমৃদ্ধিতেই নিহিত।

স্থূলাকৃতি দৈহিক সমতা প্রাপ্তিতে মানবিকতার জাগরণ ঘটেনা। প্রীতি ও সানুকম্প জীবনের বহতা স্রোতের নিরিখে জেগে ওঠে জীবনের শস্য শ্যামল মুকুলিত উপাখ্যান।

আফগানী ইকবালকে চিরে চিরে দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের হাড় জিরজির চেহারা। ওর বাইরের খোলসটা বড্ড বেশী উন্মুখ বৈভবে, রং আর বর্ণের বাহুল্যে, মুকুলিত বিত্তের চাঞ্চল্যে। কিন্তু অন্তঃকরণটা জটিল মোড়কে ঢাকা, আবর্ত কুটিল গভীরতা পরতে পরতে মাখা। শোষণের চাকায় কেমন দুলে ওঠে পল্লবিত জীবন, কেঁপে ওঠে ঋদ্ধ মানবের সাজানো সংসার। বে-ইনসাফীর কালো ঘোড়া ছুটে চলে পুঁজিবাদের রক্তপিচ্ছিল পথবেয়ে। কওমের প্রাণ শক্তি নিঃশেষিত হয় ওর খপ্পরে। নৈঃসঙ্গ, মৃত্যু ও বিপর্যয়ের টানাপড়েনে শেষ হয়ে আসে জীবনের মধুরেন অনুভূতি।

লোভ, নাস্তি ও দুর্গত মানবিকতা কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মাস্তুলে হা করে আছে। জীবন যদি নাস্তিতে পরিণত হয় উৎপাদন (Production), পুঁজিবাদের শরীরে তার অবস্থান ঠিক করারোপের (Taxation)। এই দ্বিমাত্রিক দানবিক প্রাচীরের অভ্যন্তরে মানব সংহিতা প্রতিকূল হাওয়ার মুখোমুখী ; বন্ধ্যা জীবন সমুদ্রের সামনে বিস্মিত স্তব্ধতা নিয়ে দন্ডায়মান। নাস্তি হল বিশ্বাস ও জ্ঞানের বিপ্রতীপ জীবনের ঝাঁঝ, পুঁজিবাদ মানব মনন ও জীবন সৌন্দর্যের হন্তারক। উভয়েরই বিশ্বাসের অন্তরংগ নিয়তবাহী অন্ধকার। আফগানীর অন্বিষ্ট মনন,অপ্রতিম বিশ্বাস আহত হয় যখন দেখেন আল্লাহর ধর্মে মুসলমানরা আর আস্থাবান নয়। পবিত্র গ্রন্থের স্বরূপ ও

প্রকৃতির সাথে একাত্ম নয় তাদের জীবনাচরণ। পারস্পরিক সম্পর্ক এখন তাদের ধোঁয়াটে কুয়াশাচ্ছন্ন, ইসলামী উম্মার আধ্যাত্মিক চেতনায় বিধৃত নয় মোটেই। রাসূল (সাঃ) এখন তাদের অতীতের বিচার্য বিষয়। পবিত্র গ্রন্থের সুবচন মুসলমানের জীবনে ক্রিয়াশীল নয়। তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্রিয়াকান্ডের প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসেবেও পবিত্র গ্রন্থের উপযোগিতা অবিবেচ্য। সিজার ও কায়খসরুর স্বৈরাচার যে মুসলমানরা জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারাই আজ রাজতন্ত্র ও অনৈসলামী জীবনধারার পথিকৃত।

সোভিয়েট রাশিয়ায় আফগানী কবির মারফত এক উদ্দীপক বাণী প্রেরণ করেন। রাশিয়ার মহামানবতাকে তিনি এ যুগের শিকল ভাঙ্গার জন্য অভিনন্দন জানান এবং বলেন ঃ মুসলমানের মত তারাও এযুগের সীজার ও খসরুর শৃঙ্খল মোচন করেছে। স্বৈরাচারের বেড়াজাল তছনছ করে দিয়েছে তারা। কিন্তু জীবনের অনন্ত গতি প্রবাহের নিরিখে যথেষ্ট নয়-এটুকু বাদশাহী ও জাতি-প্রীতির অন্ধত্ব মোচনের পরেও বিস্তৃত প্রসারিত যে জীবনের জয়রথ তারই বৈজয়ন্তী অপেক্ষা করছে এখন।

রুশীয়দের উচিত জীবনের পরম ভাবনার বোধে সমাহিত হওয়া; প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার মাধবীকুঞ্জের ছায়ে আশ্রয় নেয়া, কেননা প্রতীচ্য আজ অন্তর্গতভাবে বিবস্ত্র ও দেউলিয়া হতে বসেছে।

যদি তারা বিচিত্র ঘটনাময় এ বিশ্বে নতুন কোন জীবন ব্যবস্থার ব্যাপ্তি ও প্রসারণের অঙ্গীকার করে থাকে তবে তার জন্য প্রয়োজন অতলান্ত –ধ্যানমগ্ন এক চিত্ত। চাই প্রমুক্ত হৃদয়,সংস্কার উর্ধ্ব মনন।

আফগানী রুশীয়দের কাছে কোরআনের হৃদয়কে চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। কোরআনের ভাবগম্ভীর অথচ জীবনছোঁয়া ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি রুশীয়দের রুদ্ধ অর্গল খুলতে চেয়েছেন। আফগানী চেয়েছেন নতুন যুগের রুশীয় মানবতা কোরআনের স্রোত ও স্বচ্ছতায় চোখ মেলে দিক, একমাত্র তাহলেই রুশীয় সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যয়ের নবদীপ শিখা ঝলমল করে উঠবে।

কোরআন কাকে বলে? আফগানীর ব্যাখ্যাত কোরআনের ছবি আমাদেরকে ভাবায়। আমাদের অনুভবে বিশ্বাসে নতুন করে নাড়া দিয়ে যায়। আফগানীর বিশ্বাস রুশীয়দেরও নাড়া দেবে। কোরআনের প্রশ্রয়ে নতুন সভ্যতার বিন্যাস করবে তারা। কোরআন হল ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা। আর যারা সর্বহারা দাস, কোরআন আশ্রয় তাদের।

ধনিকের প্রতি কোরআনের প্রত্যয়ী ফরমান নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুই করা যাবে না কুক্ষিগত। আর যাবেনা সুদের কালান্তক ব্যবসার প্রসার। কোরআন চায় করজে হাসানা ও সদকায়ে জারিয়ার আরো-আরো বিস্তার। আফগানী সমীহ নিয়ে বর্ণনা করেন ঃ কোরআন হল সেই গ্রন্থ যা আমাদের শেখায় জমিনের মালিক আল্লাহ। মানুষ তার মামুলী জিম্মাদার মাত্র। স্বার্থ শিকারী রাজা-বাদশারাই মানবতাকে বলি দিয়েছে তাদের হীন স্বার্থের যুপকাষ্ঠে।

এই পৃথিবী মানবতার জন্য, আর মানবতা হল একই পরিবারভুক্ত। কোরআন চায় মানবতার নবনির্মাণ সেই অর্থে এই পৃথিবীর এই জীবনেরও নবজাগরণ। এরই মাঝে উপ্ত জীবনের উত্তাপ, প্রাচী-প্রতীচির মহাসম্মিলন।

এই যে ইকবাল আফগানীর প্রশ্রয়ে ইসলামের যে নবনীত চিত্র এঁকে দেখালেন, বিশুদ্ধতার পুষ্পচর্চিত এক অমোঘমন্ত্র আমাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করিয়ে দিলেন, ছেনে ছুনে তিনি বুঝিয়ে দিলেন রাজার বিশ্বাস। বস্তুতান্ত্রিকতার মোহ আর ভোগবাদী পশ্চিমী সভ্যতার সাথে ইসলামের আত্মনের কোন যোগাযোগ নেই–তারই মধ্যে আভাসিত হল মিল্লাতে ইসলামিয়ার এ কালের বিশ্বভাবনা।

ইকবাল যে মিল্লাতের চিত্রকল্প আমাদের সামনে উপস্থিত করলেন তা সর্বতোভাবেই বলা চলে আফগানীর প্যান ইসলামী দ্রোহ মন্ত্রের ভাব-দ্যোৎনা বিচ্ছুরিত। বারে বারেই যে তিনি কোরআনের প্রশ্রয়ে ফিরে যাওয়ার কথা বলেন, জীবনের সাধনাময় এক দীপ্ত প্রদোষের অঙ্গীকারের কথা তার কাব্যিক ভাষায় দোলা দেয়—সেও আফগানীর জীবনের মর্মজ্ঞ অনুসৃতি মাত্র।

ইকবালের বৌদ্ধিক পরিণতি গৌরবমন্ডিত হয়েছিল আফগানীর প্যান ইসলামের মানস ও চিন্তাধারার প্রবাহে। কবির এই প্যান ইসলাম-প্রীতি শুধু অতীতের সাহিত্য পাঠ ছিল না; এই ধ্রুপদী চর্চাকে তিনি মনে করতেন মহাজীবনের পরিচর্যা ও বর্ধনের অপরিহার্য সঙ্গীরূপে। জীবন যেহেতু ভূঁই ফোঁড় কিছু নয়, তার একটা নির্দিষ্ট অতীত ইতিহাস ও চিন্তাধারার প্রবাহ আছে, তাই সৃজনমুখী জীবনের স্বার্থে আমাদের বিবিধ বৈভবে পূর্ণ সামগ্রিক এই ধ্রুপদী সভ্যতার সংগে পুনরায় নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের অপরিহার্যতা তিনি অনুভব করেছেন।

ইকবালের বহুবিশ্রুত মিল্লাতের ধারণা মূলগতভাবে আফগানীর প্যান ইসলাম চিন্তার নির্যাস আশ্রিত। যৌবনের প্রাথমিক দিনগুলোতে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেও পরবর্তি সময়ে কবির এই ভ্রান্তি উবে যেতে দেরী হয়নি এবং মানবজীবনের অভ্রান্ত পরিত্রাণকারী হিসেবে কোরআনী সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবান, জীবনের কর্মপন্থা ও দিকনির্দেশনা হিসেবে কোরআনের গ্রহণযোগ্যতাকে আধুনিক মানুষের কাছে তুলে ধরার তাঁর অভিনব ও চমকপ্রদ ব্যবস্থাদি আফগানীর চিন্তাধারার মধ্যে বিপুলভাবে বর্তমান ছিল।

এ কথা বলা যায়, ইকবালের চিন্তা ও দর্শনের আশ্রয়ে আফগানীর সুচিত আন্দোলন পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছিল।

ইকবাল তার মনন নিঃসৃত চিন্তা-ভাবনা ও কবিতার রেশমী অক্ষরে আফগানীর প্রতি নিবেদন করেছেন অসীম শ্রদ্ধা, প্রসারিত অনুরক্তি এবং জীবন-ভাবনার ঝড় জলের সামনে দাঁড়িয়েও অনুকরণীয় বিস্ময় ও মুগ্ধতাবোধ। ১৯৩২-এ বন্ধু মোহাম্মাদ আহসানের কাছে লেখা চিঠির ছত্রে ছত্রে জীবন্ত হয়ে উঠেছে আফগানীর প্রতি তাঁর সেই সমুদ্রের মত মৌন অসাধারণ চিত্র ভাষ্য ঃ

In modern times, from my point of view if anybody is entitled to be called a Mujaddid, it is Jamal-ud-Din Afghani. The future historians of the Muslims of Egypt, Iran, Turkey and India will first of all mention the name of Abdul wahab Najdi and after that of Jamal-ud-Din- Afghani. In fact, the latter is the chief architect of present day renaissance in the Muslim world. If the Muslim nation has not declared him a Mujadid or if he has not claimed that title for himself, that in no way reduces his status in the minds of those who have a proper insight into the matter . (Iqbal nama VOI-II)

এমনি করে ইকবাল পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে লেখা এক চিঠিতেও আফগানীর মহাজীবনের চিত্রকল্প হাজির করেছেন ঃ

Maulana Jamal -ud- Din Afghani was a man of a different stamp. Strange are the ways of providence. one of the most advanced Muslims of our time, both in religious thought and action, was born in Afghanistan. A perfect master of nearly all the Muslim languages of the world and endowed with the most winning elaquence,his restless soul migrated from one Muslim Country to another.

influencing some of the most prominent men in Iran. Egypt and Turkey . Some of the greatest theologiansof our time. such as Mufti Muhammad Abduh. and some of the men of the younger generation who later became political leaders. such as Zaghlul Pasha of Egypt. were his deciples. Had wrote little. spoke much and there by transformed into miniature Jamal -ud-Dins all those who came into contact with him . He never claimed to be a prophet or a renewer: Yet no other man in our time has stirred the soul of Islam more deeply than he. His spirit is still working in the world of Islam. and nobody knows where it will end. (Thoughts and reflections of Iqbal)

বস্তুত ইকবালের ভাবনার রাজ্যে ইসলামের যে অফুরান পৃথিবী পাখা মেলে দিয়েছিল তার মূল সুরটি ছিল প্যান ইসলামিজমের। তাঁর বিশ্বাস দানা বেঁধেছিল সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের ইসলামী খসড়াটি যদি বিপন্ন হতে বসে তাহলে কোরআনী আদর্শের প্রক্ষেপণ অচল মুদ্রায় পরিণত হবে। ইকবালের পর্যবেক্ষণশীল অন্তর্দৃষ্টি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেছিল কওম হিসেবে মুসলমানদের বিপর্যয় ও দুর্বিপাকের একটি মাত্রই কার্যকারণ তা হল তাদের অন্তর্গত দুর্বলতা ও অনৈক্য। তিনি মনে করেন, ঐক্যের যে প্রগাঢ় গ্রন্থি একদিন ইসলামকে সর্বজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিল তার অভাব আজ মুসলমানদের ভবিষ্যৎকে অকাল অমাবশ্যার ডুবোজলে নিক্ষিপ্ত করেছে। বিশ্ব মানব ইকবালের বাণী ও বিশ্বাস একান্ত-ভাবেই প্যান ইসলামের পরিমিশ্রণে নির্মিত । সচ্চিদানন্দ সিনহা কবি জীবনের সেই অসাধারণ পরিপ্রেক্ষিত ও নির্মিতির সৌধ রচনা করেছেন এভাবে ঃ

Islamic internationalism or pan Islamism is the Keynote of Iqbal's poetry. and permeates it through and through worded tirades against nationalism. and the exaltation of pan Islamism are the most striking features of Iqbal's poetry.

(S. Sinha - Iqbal: The poet and his Message)

ইকবালের এই বিশ্বাস আফগানীর জীবন থেকেই আহরিত। আফগানীর মত তাঁরও ধারণা ছিল, ইসলামের সার্বজনীন অঙ্গীকারে মানবমুক্তির প্রশ্রয় নিহিত; এই অঙ্গীকার ঋদ্ধ জীবন চেতনা থেকে দূরে অবস্থান করে মুসলিম মিল্লাত অসুস্থ ক্লিব্য জীবনের উপাসনা করে চলেছে। ইকবাল জীবনে আফগানীর এই অসামান্য প্রভাবের কথা লিখেছেন স্বনামখ্যাত লেখক কাজী আব্দুল ওদুদ ঃ

Of the modern Muslim thinkers. he is indeboed most to syed Jamal -ud-Din- Al Afghani who flourished in the second half of the nineteenth century and tried to drive home into the falle»Muslim world the message of scientifick out look and political resurgence.

(K. A. WADUD- Iqbal in the calcutta Review. February 1949)

ইকবালের এক শ্রেণীর সমালোচক তাঁর এই প্যান ইসলাম-প্রীতিকে নঞর্থক অর্থে গ্রহণ করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

ইকবালের কাছে প্যান ইসলাম ছিল বিশ্বাসের একটি কর্মপ্রধান আবহ এবং তিনি মনে করতেন : চলমান পৃথিবীতে মিল্লাত হিসেবে মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে চাই ঐক্যের একটি

দৃঢ় প্রেক্ষিত রচনা। ১৯১১ সালে মুসলিম শিক্ষা সম্মিলনীতে ইকবাল দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন ঃ

Some unkind critics, while commenting on my poems have labelled me as an advocate of the Pan Islamism and it is my conviction that our nation has a glorious future.

অন্যত্র ইকবাল একই প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন এভাবে–

Islam abhors all material limitations, and bases its nationality on a purely abstract idea Objectified in a potentially expansive group of Concrete personalities. It is not dependent for its life principle on the character and genius of a particular people. In its essence, it is non temporal, non spatial. (Report on the census of India 1911, VOl XIV)

অনেকেরই বিশ্বাস, ইকবালের প্যান ইসলাম ভাবনা নিছক আদর্শের রূপকল্প হিসেবে কবিতায় মঞ্জরিত হয়েছে, কিন্তু জীবনবাদী ইকবালের কাছে বাস্তবতা থেকে দূরে কবিতার গজদন্ত মিনারে বসে আদর্শবাদের ফুল্ল কুসুম রচনা কি করে সম্ভব। কবির নিজের ভাষ্য ঃ

The ideal and the real are not two opposing forces, which defy Conciliation. Idealism does not mean a complete break with realism, in fact, it is his perpetual endeavour bringing the ideal appropriately closer to the real.

(Hamidullah Siddiqi_ Iqbals legal to philosophy and Reconstrnction of Islamic law)

ইসলাম তাঁর ভাষায় এক সহজতম বিশ্বাস–জটিলতামুক্ত এক জীবন প্রণালী, কেননা ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে বিশ্বাসের এক ঋদ্ধ উচ্চারণ ছাড়া কোন কিছুই প্রত্যাশা করেনা।

আল্লাহর ওয়াহদানিয়ত এবং নবুওয়তের তাৎপর্যময় সমাপ্তি এই একটিমাত্র খসড়া নীতিমালার ভিত্তিতে দুনিয়া থেকে বর্ণ, গোত্র ও বিভেদের সকল চালিকা শক্তির অবসান সম্ভব। ইসলামের এই অসামান্য আহ্বান তার আর্থ-সামাজিক চারিত্র্যকে ভিন্নতর বৈশিষ্ট্যে গৌরবমন্ডিত করেছে এবং এই সাম্য ও আন্তর্জাতিকতার ধারণা থেকে মুসলমানরা পেয়েছে উদারতার মোহনীয় শিক্ষা। মোহাম্মদ আকবর মুনীরের কাছে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল ব্যক্ত করেছেন ঃ

If the Muslim nations of the middle East are to unite they would be saved, but if they are unable to resolve their differences and frictions, then there is no hope for their rejuvenation. (Iqbal Nama)

সুতরাং চাই ঐক্য, চাই সংহতি , চাই বিশ্বাসের আলোক রশ্মি। একমাত্র এই পথ ধরেই দুনিয়াতে মুমিনের মহামিলন সম্ভব হয়ে উঠবে। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে যেহেতু মুসলমানদের উৎস ও গতিধারা এক, তাই ইকবাল মনে করেন সংকীর্ণ স্বার্থশিকারীর মহামারী থেকে এই জাতি মুক্তির মাঙ্গল্যে নতুন পথের জাগরণ আশায় জেগে উঠবে। ইকবালের কাছে প্যান ইসলাম ও মিল্লাত তাই সমার্থক, কেননা তিনি মনে করেন দুনিয়াতে মুসলমানদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তৌহীদকে যদি তারা মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করে। কবির ভাষ্য–

Islamic outlook on nationalism is different from other nations our nationalismisisnot based on the unity of languages, one ness of territory, or economic affinities.we belong to one family which was founded by the Holy prophet, and our membership of it rests on common belief about the manifestations of universe and the historical traditions which we all share together. (Maqalat-i-Iqbal)

ইকবালের কবিতা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের উর্মিমুখর সমুদ্র বলাকা। তার ভাবনার পৃথিবীতে উন্মোচিত হয়েছে এক ন্যায় রাজ্য; বিশ্বাসের এক কর্মপ্রবণ আলোক সংহিতা। বিশ্ব স্রষ্টার কাছে তিনি প্রার্থনা করেন, এই দৈব দুর্বিপাকে ঘেরা পৃথিবীতে মুসলমানরা আজ সংকীর্ণতার মহামারীতে দগ্ধীভূত। ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের বিলোপন যত দ্রুত নিষ্পন্ন হচ্ছে মুসলমানদের ঐক্যের সার্বজনীন ভিত্তিও তত দুর্বলতর হয়ে উঠছে।

বিশ্বস্রষ্টা যেন তার মঙ্গল মঞ্জুষায়, স্নিগ্ধ স্বচ্ছ হৃদয়ের অলৌকিক সৌন্দর্যে মুসলমানদের বিশ্বাস ও ভালবাসার বন্ধনে আবার জাগিয়ে দেন। ইকবালের শঙ্কা গভীরতর হয়েছিল স্বার্থের পীড়ন ও সংকীর্ণতার বিষ কর্মযজ্ঞ মুসলমানদের বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের চেহারাকে এত বেশী প্রকট করে তুলেছে যে, বৃহত্তর জাতীয় প্রয়োজনে তাদের মধ্যে ঐক্যের একটি সূত্র গড়ে তোলা সম্ভব নাও হয়ে উঠতে পারে। তিনি অবশ্য অবগত ছিলেন সাম্প্রতিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মুসলমান দেশগুলোকে নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক বন্ধন গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য হলেও মিল্লাতের আহবানে ভৌগোলিক ও জাতীয় চারিত্র্য কাটিয়ে ওঠা কোন দুঃস্বপ্ন নয়।

ইকবাল নিশ্চিন্তভাবে বিশ্বাস করতেন, মুসলিম মিল্লাতের এই দুর্বিপাকের জন্য পশ্চিমীকরণের অপঘাতই দায়ী। পাশ্চাত্যের দুষ্টপ্রভাবে মুসলিম মিল্লাত আজ ইসলামের আন্তর্জাতিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং জাতীয়তাবাদের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিজেকে গোপন করেছে। ইকবাল মুসলমানদের উদাত্তভাবে আহবান জানিয়েছেন এই ভৌগোলিকতার কর্মযজ্ঞ পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন করতে।

মুসলমানদের বিশ্বাসের মৌলদিগন্ত প্রতিফলিত আল্লাহর সার্বভৌমত্বে নিঃশর্ত স্বীকৃতি এবং এরই মধ্যে মুসলিম জীবনধারার ঐক্যভাবনা বিধৃত। ইকবাল মনে করেন যে কোন ধরনের ভৌগোলিক ও জাতীয়তাবাদী কর্মযজ্ঞ এই আধ্যাত্মিক বিশ্বব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলবে। বাঙ্গই-দরার-ওয়াতনিয়্যাৎ-'জাতীয়তাবাদ'-এ কবি দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবাদকে মূর্তিপূজা ও ঈশ্বরহীনতার আধুনিক সংস্করণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি মনে করেন, দেশপ্রীতি যদি ইসলামের আদর্শ ও কর্মসূচীর পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কেননা মুসলমানদের বিশ্বাস, সমগ্র পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ন্যায়তঃ আল্লাহর। তাই মুসলমান কোন ভূখন্ডের দাবীদার হওয়ার পরিবর্তে বিশ্বনাগরিক হিসেবেই আত্মতুষ্টি লাভ করে–

মাতৃভূমির প্রতিমা তৈরী করে কে জান? এ তমদ্দুন
এরি হাতে হায়, নবীর ধর্ম দেশে দেশে যেগো হতেছে খুন।
বাহুতো তোমার বলীয়ান তাতে তৌহীদ করে শক্তিদান
তোমার ইসলাম জেনো, মুসলিম তুমি মুক্তপ্রাণ।
পুরাতন সেই দৃশ্য আবার নতুন যুগেরে দেখিয়ে দাও,
মোস্তফী তুমি? তবে তো এ নব মূর্তিরে আজ গুঁড়িয়ে দাও।

(অনুবাদ-মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীর সূচিত প্যান ইসলাম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার সাথে ইকবালের ঐক্যসাধনের আশু ফল হয়েছিল, মিল্লাতে ইসলামিয়ার সুপ্ত চৈতন্যে অগ্নি বলাকারা পাখা মেলে দিয়েছিল। আফগানী যেমন চেয়েছিলেন মুসলিম মিল্লাতের জাগরণ, পাশ্চাত্যের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে মুসলিম দেশগুলোর বিস্ময়কর উত্থান কিংবা সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও অন্ধত্বের অপছায়া দূরে ফেলে বিশ্ব সভায় মুসলমানের আসন গ্রহণ। এ সবই কোন না কোনভাবে ইকবালের গভীর আন্তরিক বিশ্বাসের বিশ্লেষণ হয়ে কবিতায় কিংবা সুমার্জিত গদ্যরচনায় অথবা রাজনীতিবিদের অন্তর্দৃষ্টির বিক্ষেপণে ঝড় তুলেছে।

ইকবাল মনে করতেন, মুসলমানরা কখনোই কালজয়ী ভূমিকা রাখতে পারবেনা যতক্ষণ না তারা ইসলামের মৌলনীতির ভিত্তিতে ঐক্যের একটি কেন্দ্র গড়ে তুলবে।

আফগানী যেমন ঝড় তুলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তেমনি মুসলিম সমাজের অন্তর্গত দুর্বলতা ও সংস্কারের বিরুদ্ধেও তাঁকে সোচ্চার হতে হয়েছে। প্যান ইসলামের এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে ইকবাল আশ্চর্য জীবনী শক্তিতে গতিশীল আলোকধারায় নিয়ে এসেছেন। ইকবালের মিল্লাত ও ইজতিহাদ সম্পর্কীয় ভাবনা চিন্তা- প্যান ইসলামেরই নব-নির্মিতি।

আফগানীর মত তিনিও চেয়েছিলেন মুসলিম উম্মার ঐক্য, কোরআনী জীবন ব্যবস্থার মধুর রূপায়ণ এবং মুসলিম সমাজ থেকে অনৈসলামী জীবন চর্চার উৎসাদন। একমাত্র এই পথ ধরেই ইকবাল মনে করতেন মুসলিম দেশসমূহ থেকে পশ্চিমীকরণের দুর্দৈব অপসৃতি হবে।

১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মিলনীতে সেই যে বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন কবি ঃ

one lesson I have learnt from the hestory of the Muslims. At critical moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not vice versa. If today you focus your vision on Islam and seek inspiration from the ever vitalising ideas embodied in it, you will be only resembling your scattered forces, regaining your lost integrity and thereby saving yourself from total distruction.

ইসলাম তাঁর কাছে ছিল বিশুদ্ধ জীবন চর্চার অন্য নাম; তাই তিনি একে চেয়েছিলেন নির্মলিন সৌরভ ও কল্যাণকামিতার এক প্রশ্রয়রূপে। ইজতিহাদ ছিল তাঁর দ্রোহমন্ত্র; বছরের পর বছর ধরে ইসলামের শরীরে যে আবর্জনারাশি স্তূপীকৃত হয়েছিল, ইজতিহাদের স্পর্শে তিনি তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। বারে বারেই তাঁর কবিতায় মুসলিম ঐক্যের ঝংকার বিধৃত হয়েছে। গভীর বিশ্বাসের অন্তঃস্রাব দিয়ে তিনি এই ঐক্যের রাজপথ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। উম্মা ছিল তাঁর কাছে ঐক্যের পবিত্র গ্রন্থি এবং এর যে কোন ধরনের বিভাজন রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। তাই ইকবাল সমকালীন আরব রাজন্যবর্গের সমালোচনা করেছেন; তাদের অন্তঃকলহ ও বিবাদকে ইসলামের জন্য সুনির্দিষ্ট ক্ষতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর জীবনের মহান উদ্দেশ্যই ছিল মুসলিম ঐক্যে এক দৃঢ় সূত্র গড়ে তোলা। সার্বজনীন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল ইকবালের জীবন ভাবনা। অস্থির বিভ্রান্ত পৃথিবীতে সেই ঐক্যের আহবান ইকবাল আমৃত্যু ঘোষণা করে গেছেন।

ইকবাল ও গণতন্ত্র

ইকবাল নবজীবনের কবি। নতুন দিনের রাঙা প্রভাতে নতুন প্রাণের হিল্লোল তাঁর কবিতার আকাশে সপ্তর্ষি তারার মত ঝিকমিক করে উঠেছে। জীবন বীণার আনন্দগান তাঁর কবিতার সেতারে এক অনির্বচনীয় রূপকল্প ও মধুর অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে। নৈরাশ্য ও বেদনার অচলায়তন উপড়ে ফেলে তিনি দেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন এগিয়ে চলার। পাশ্চাত্য সভ্যতার জাঁকজমক ও পশ্চিমী গণতন্ত্র তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। তিনি ঘোষণা করেছেন অন্ধত্ব ও উদ্যমহীনতার যুগের অবসান ঘটেছে। নতুন প্রভাতের জাগরণে মুক্তির মশাল নিয়ে সারা দুনিয়ার মুসলমান আজ জেগে উঠেছে। বিশ শতকের মর্মান্তিক আত্মপীড়ন ও সভ্যতার অনাচার বিদূরণে ইকবাল এক প্রতিশ্রুতিশীল কোরআনী জীবন বিধানের আলোকে আধুনিক সমাজ বিনির্মাণের সুদৃশ্য চিত্রাবলী পেশ করেছেন।

ইউরোপে অবস্থানকালে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পটভূমিতে কবির নবজন্ম হয়েছিল। তিনি একে একে পরিচিত হতে লাগলেন এর বিচিত্র ও বহুবিস্তৃত জ্ঞান বিজ্ঞানের সুরম্য ইমারতটির সাথে। তাঁর দৃষ্টির দিগন্তে এসে ধরা দিল বার্গসঁ ও নীটশের দার্শনিক প্রজ্ঞা ও দীপ্তি, গ্যাটে ও হাইনের পুষ্পোদ্যান এবং ফ্রয়েড ও মার্কসের সমাজতান্ত্রিক যাদুঘর। এমনিভাবে তাঁর সামনে প্রকটিত হয়ে উঠল ইউরোপের শক্তির উৎস তেমনি তার গোচরীভূত হলো এর মৌলিক দুর্বলতাও। ইকবালের প্রত্যয় জন্মাল, আধুনিক ইউরোপের সমস্যা কতকগুলি নৈতিক সমস্যাজাত। ইকবাল তাঁর প্রসারিত দিগন্তে দেখতে পেলেন ইউরোপের অর্জিত সম্পদগুলি কেমন বিশৃঙ্খল এবং প্রাণহীন অবস্থায় পড়ে আছে। মানবিকতার সাথে হাত মিলিয়েছে জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিত্ববাদের মৃত্তিকায় চারা গজিয়েছে গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের, মনোবিজ্ঞানের ইমারতে সৌন্দর্যবর্ধন করে চলেছে জড় বিজ্ঞান—ধ্বংসের এক উলঙ্গ চিত্র তাঁর চোখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াল। তিনি অনুভব করলেন এই বিচিত্র ও বহু মস্তকবিশিষ্ট দানবীয় শক্তির জাগরণের, যা সংহত ও আয়ত্তাধীন রাখার হিম্মত ইউরোপের নেই এবং তার আহরিত ঝলমলে উপকরণগুলি মানবতার কোন বৃহত্তর কল্যাণেও আসবে না। ইকবাল তাই মুখ ফিরালেন ইসলামের দিকে। তাঁর প্রতীতি ছিল এর নবজাগরণে কোন সাম্প্রদায়িক বা গোত্রীয় তাৎপর্য নেই। যে সমস্যা আজ সারা দুনিয়াকে ভারাক্রান্ত করেছে, জীবন গীতিকার উপযোগিতাকে অর্থহীন বিবেচনা করেছে তার অপনোদনে তিনি এক বিশ্বজনীন আদর্শের মানবিক রূপায়ণ কামনা করেছেন। ইসলাম তাঁর কাছে নিছক কোন ধর্ম নয়, প্রকারান্তরে এ হলো মানব মুক্তির আদর্শ স্বরূপ।

ইকবালের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র এক প্রতারক পদ্ধতি যা মানুষের নৈতিক এবং রাজনৈতিক স্খলন উভয়ের জন্যই সমানভাবে দায়ী। আধুনিক মানুষের বিপর্যয় ও ক্লিবত্বের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্যের এ উপকরণ যা মানবিক কল্যাণবোধ ও সুকুমার চেতনার বিকাশকে রুদ্ধ করেছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রারম্ভ থেকেই প্রাচ্যের দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের যে আগ্রাসন শুরু হয়, সে সময়ই মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্রের এই মায়াবী হাওয়া বিরাজ করতে শুরু করে। ইকবালের বিবেচনায় এ ছিল মুসলিম জনতার এক বৈরী ফাঁদে পা দেওয়া। কারণ, তার গণতন্ত্রের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট গোচরীভূত ছিল। ধর্মহীনতার নৈরাজ্য থেকে যে পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছে তিনি

জানতেন তা যদি ইসলামী দেশগুলোতে সম্প্রসারিত হওয়ার সুযোগ পায়, তবে মুসলিম সমাজে যে তাওহীদ ভিত্তিক সাম্যাবস্থা বর্তমান তা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার যে অঙ্গীকার ঘোষিত হয়েছে তা ইসলামের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী। কারণ, এখানে সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। ইকবাল তাই বিশ্বাস করেন গণতন্ত্র ইসলামের কাবাকেন্দ্রিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের ঘাতক। ইকবাল তাঁর বিভিন্ন রচনায় বিশেষ করে কবিতায় গণতন্ত্রের এই প্রতারক মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং মুসলিম সমাজকে এর বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ারও করেছেন।

মধ্যযুগে পোপ ও সীজারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই ও পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবে মুক্তবুদ্ধি চর্চার ফলে সর্বত্রই যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনার ধারণা উপ্ত হল ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে এ দৃষ্টিভঙ্গি আরো পল্লবিত হয়ে উঠলো। রাজনীতি থেকে ধর্মের পৃথকীকরণ এবং ধর্মকে সকল সামাজিক স্থাপনা থেকে অপসারণ করে গৃহবন্দী করার মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের জয় সূচিত হয়েছিল। একই সাথে সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচারের সুকুমার চেতনাকে মানসিক কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন করে শাসনতান্ত্রিক বিধানের আয়ত্তাধীন করা হলো। এ রকম পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের যে কৃষ্ণমূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হল তাতে মানুষের জয়জয়কার ঘোষিত হল, কিন্তু মানবিকতার হলো সর্বনাশ। সমাজ পরিচালনায় জনগণের অধিকারকে নিশ্চিত করা হলো, কিন্তু খোদায়ী বিধানের অকার্যকারিতাকেও ফুটিয়ে তোলা হলো।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় ইকবাল কোরআনী জীবন বিধানকে আদর্শ হিসেবে সামনে রেখেছেন। তাই স্বভাবতই ইকবালের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে পর্যবেক্ষণ করতে হলে আমাদের পূর্বাহ্নেই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামের গণতান্ত্রিক উপযোগিতার একটি তুলনামূলক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

ইসলামে আধুনিক কালের কোন বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতি না থাকলেও এর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক চেতনাই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে যে আইন প্রণয়নের বিধান রয়েছে এবং জনতার সার্বিক অংশগ্রহণের মধ্যে এ পদ্ধতির কার্যকারিতা ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে– ইসলামে তার স্বীকৃতি নেই। এখানে আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহর যার নাযিলকৃত বাণী যা কোরআনুল হাকীমে সংবিধিবদ্ধ রয়েছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের অপরিবর্তনীয় আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছে। রাসূলে করীম (সঃ)-এর পূত জীবনাদর্শ ও কর্ম পদ্ধতি যা হাদীস শরীফে বিধৃত রয়েছে তা এ ঐশী আইনের বুনিয়াদকেই মজবুত করেছে।

গণতন্ত্রে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার একটি ছক বাঁধা উপযোগিতা বর্তমান। আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এই গণতান্ত্রিক সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সকলের সমানাধিকারকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আইনের একটি সীমাবদ্ধতা আছে এবং এর ঊর্ধ্বে সাম্যাবস্থার এই ধারণা অনেকটা মরীচিকা সদৃশ।

কিন্তু ইসলামে এই ধারণা নৈতিকতাজাত এবং ঐশী প্রত্যাদেশপুষ্ট। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের সাথে তাঁর বিশ্বজনীনতা ও সর্বশক্তিমানত্বের যে ধারণা তাই বিশ্বাসীদের সমতা বিধান করেছে এবং মানুষে মানুষে পার্থক্যের জংলী ধারণার অবসান ঘটিয়েছে। ইসলামে সাম্যের উপলব্ধি ভ্রাতৃত্বের নৈতিকবোধে দীপ্ত এবং তা উম্মাহর একজন পূর্ণাঙ্গ সদস্য হিসেবে। তাওহীদের মূলমন্ত্র

ও নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনাদর্শের প্রেক্ষিতে এ ভ্রাতৃত্বের জাগরণ সম্ভব হয়েছে। আল্লাহর কাছে গোত্রীয় প্রাধান্য অথবা বর্ণাশ্রমের কোন আধিপত্য নেই; সে-ই শ্রেষ্ঠ যে বেশী তাকওয়াবান।

ইসলামে স্বাধীনতার ধারণাও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নীতিমালার মধ্যে আশ্রিত। ইসলামের কালেমায় ঘোষিত হয়েছে–

আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

এ প্রেক্ষিতে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো নির্দেশের অনুগত হওয়া সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শরীয়তের রীতির মধ্য থেকেই এ স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় আইনগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দানব এ প্রক্রিয়াকে অকার্যকর করেছে এবং নৈতিকতার কোন বাঁধন না থাকায় এখানে স্বাধীনতা অনাচারে পরিণত হয়েছে।

ইকবাল এমনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চেতনার মৌলকেন্দ্র থেকে গণতন্ত্রের নিরীক্ষা চালিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন পাশ্চাত্যের এ উপকরণ বিশ্ব মানবতার উপর জুলুমের দানবকে তার আগ্রাসী হাত বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে। বস্তুবাদী সভ্যতার এ হলো এক নবতর আত্মপ্রবঞ্চনা।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদীদের ধারণা, গণতন্ত্রকে তারা একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে পরিণত করেছে এবং পরিণতিতে এটি এখন তাদের ঐতিহ্যে অবয়ব লাভ করেছে। কিন্তু ইকবাল দেখেছেন এই ঐতিহ্যের ধারক পেশাদার রাজনীতিবিদদের চিত্র যাদের কারণে নিরীহ জনতার বুক চিরে হাহাকার ধ্বনি শোনা যায়। রাজনীতি ও আদর্শের নামে তারা মানবতাকে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী কায়দায় চালনা করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যবহারও করে। ইকবাল তাঁর এক কবিতায় উল্লেখ করেছেন–

"গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের পদ্ধতি
যাতে রাজনীতিবিদদের লেবাসে বাস করে
শয়তানী আত্মা
তাই দুনিয়ার বুকে শয়তানের প্রয়োজন
অনেক আগেই ফুরিয়েছে।" (বাল-ই-জিব্রীল)

ইকবাল আর এক কবিতায় পশ্চিমী গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেছেন এমনিভাবে–

এই কি সেই পশ্চিমী সভ্যতা
যা গণতন্ত্রের আওতায় জুলুমের দৈত্যকে
শৃঙ্খলমুক্ত করেছে
বিশ্বাস করো আমার কাছে একখণ্ড পোড়োজমি
পশ্চিমের ঐ কুঞ্জকাননের চেয়ে ঢের ভালো
ওরা যে নাগরিক রাতের মাহফিল সাজিয়েছে
তা বিস্তীর্ণ নীরবতার কাছেও হার মেনেছে।
প্রাচ্যের এই ফকীরের বাণী কেউ যেন পৌঁছে দেয়
ওদের কানে
গণতন্ত্র হচ্ছে এক কোষমুক্ত তরবারী
যার ধারে লুকিয়ে আছে ওদেরই মৃত্যুর পরওয়ানা (যবূর-ই-আযম)

পশ্চিমী সভ্যতার এই গণতান্ত্রিক উপাদান মূলত তার চরিত্র লুকিয়ে রেখেছে সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সা ও শোষণের মধ্যে। ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তৃতির কার্যকারণ হিসেবে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায়শঃই উল্লেখ করে থাকে তারা নাকি অনুন্নত জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে গণতন্ত্রের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছিল। ইকবাল তাই গণতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সারিতে স্থান দিয়েছেন এবং বলেছেন, এই তিন উপাদান মানবতার ঐক্য ও প্রাণ হরণ করে নিয়েছে। মৃত্যুর কিছুকাল আগে (১ জানুয়ারি, ১৯৩৮) লাহোর বেতার থেকে দেয়া নববর্ষের এক বাণীতে তিনি উল্লেখ করেন সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ গণতন্ত্রের আওতায় কখনো পরিচ্ছন্ন অবয়ব ধারণ করতে পারে না, প্রকারান্তরে তা এক কদর্য বিকৃতির স্বীকার হয়–

So long as this so called democracy, this accursed nationalism and this imperialism are not shattered, so long as men do not demonstrate by their actions that they believe that the whole world is a family of God, so long as distinctions of race, colour and geographical nationalities are not wiped out completely, they will never be able to lead a happy and contented life and the beautiful ideals of liberty, equality, fraternity will never materialize.

ইকবাল পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কেই চিহ্নিত করেছেন এক বৈরী চেতনার প্রেক্ষাপট হিসেবে; কারণ প্রকৃতপক্ষে উভয়ই নাস্তিক্যবাদের আগাছাই বৃদ্ধি করেছে। তিনি অবশ্য বলেছেন, গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের মৌলিক নীতির সাথে ইসলামের কোন সংঘর্ষ নেই। তিনি দাবী করেছেন তাকে যদি কখনো কোন রাষ্ট্রের ডিক্টেটর নির্বাচিত করা হয় তা হলে তিনি গণতান্ত্রিক নীতির মারফত ইসলামী জীবন দর্শন রূপায়ণের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতেন।

উভয়ই (পশ্চিমী গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ)
আল্লাহর থেকে গেছে দূরে সরে,
মানুষকে দিয়েছে ধোঁকা
মানবতা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তাদের যাঁতা তলে
কেউ কেড়ে নেয় শরীর থেকে জীবন
আর কেউ হাত থেকে রুটি।

ইকবাল তাঁর কোন কোন কবিতায় গণতন্ত্রের সমালোচনা করেছেন এমনিভাবে– মূর্খ জনগণ এ পদ্ধতির আওতায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে কিন্তু এর জটিলতা বুঝতে পারে না–

জনগণের স্মৃতিশক্তি হলো নিম্নপর্যায়ের
আর মূর্খতার লেবাস গায়ে দিয়ে ঘোরা
তার অভ্যাস
রাজনীতি কত মুখর
কিন্তু হায়!
তার জটিলতা বোঝা তাদের অসাধ্য
জনতার নদীতে যদি ওঠে মুক্তবুদ্ধির ঢেউ
তারা বয়ে আনবে বিপর্যয়
আর সুবুদ্ধিকে যদি করো পণ্য
মুক্তবুদ্ধি হবে তোমার

পশু তৈরীর কারখানা (যরবে কলীম)

গণতন্ত্রে লাগামহীন চিন্তার স্বাধীনতা বিপজ্জনক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তিনি যখন বলেন–

কওম হলো এক সাজানো বাগান
প্রত্যেক সদস্য যার একটি ফুলের তরু
কেউ যদি সুবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে
সে বাগান হবে ঝড় ও বজ্রে লন্ডভন্ড
আল্লাহর নিয়ামতে তুমি শুকরিয়া
আদায় করো
কারণ তা আলোকিত করেছে পৃথিবীকে
মুক্তবুদ্ধি হলো শয়তানের আবিষ্কার
মানুষকে যা নিক্ষেপ করেছে অন্ধকার আবর্তে।" (বাল-ই-জিব্রীল)

ইকবাল তাই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন উদার নৈতিক চিন্তার বাধনহারা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে। কারণ এ প্রক্রিয়া ইসলামী চিন্তার সংহতিকে দুর্বল করে দিতে পারে যা উম্মার অস্তিত্বের প্রতি ঘাতক হয়ে দেখা দেবে। তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাজ বক্তৃতায় এহেন দুর্দৈবের বিস্তৃত চিত্র এঁকেছেন–

We heartily welcome the liberal movement in modern Islam; but it must also be admitted that the appearance of liberal ideas in Islam constitutes also the most critical moment in the history of Islam. Liberalism has a tendency to act as a force of disintegration. Further, our religious and political reforms in their Zeal for liberalism may overstep the proper limits of reform in the absence of a check on their youthful fervour.

(The Reconstruction of Religious Thought in Islam)

ইকবাল বিশ্বাস করতেন, জনগণের স্মৃতিশক্তি কম আর মূর্খতার ভাগ অনেক বেশি। সুতরাং তাঁর মতে, জনতার কাছ থেকে প্রত্যাশার কিছু নেই; সকলের উচিত একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করা–

মূর্খ জনতার কাছে প্রজ্ঞা আশা করা হলো বোকামী
গণতন্ত্রের মরীচিকা আর নয়
এস আমরা সবাই মিলে
এক মুর্শিদের রাস্তা গ্রহণ করি
যার হৃদয়ের দীপ্তি ও বুদ্ধির আলোতে
নির্মাণ করব এক নতুন মসজিদ
অজস্র প্রাণের কাছ থেকে আমরা
পেতে পারি শুধু নির্বীর্যতার কর্দম। (পায়াম-ই-মাশরিক)

গণতন্ত্রের প্রতি তার অনীহার আর একটি প্রধান কারণ হল এর নৈতিক সীমাবদ্ধতা। গণতন্ত্র চর্চার নামে এবং জনগণের আইন প্রণয়নের অন্তরালে অনেক নীতিহীন, মূল্যবোধ-বর্জিত জীবনাচরণও আইনসিদ্ধ করা হয়। ফলে গণতন্ত্র হয়ে ওঠে দুর্বীনিত ও উদ্ধত। তাঁর ভাষায়–

Democracy has a tendency to foster the spirit of legality. This is not in itself bad; but Unfortunately it tends to displace the purely moral standpoint and to make the illegal and the wrong identical in meaning.

(Stray reflections: A note book of Allama Iqbal, Javid Iqbal)

ইকবাল ছিলেন বিশ্ব পথিক। তাঁর দৃষ্টি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ই পর্যটন করেছে এবং তাঁর প্রতীতি জন্মিয়েছে উভয়ই আধ্যাত্মিকভাবে রোগগ্রস্ত। প্রাচ্যের দুর্দৈব তার পরাধীনতার জন্য আর পশ্চিমী সভ্যতা তার গণতান্ত্রিক ভেদবুদ্ধি, দুষ্কৃতি ও নীতিহীনতার আপদের জন্য।

সুতরাং–
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
উভয়ই পেষণ করছে এক অসুস্থ আত্মা
নৈতিকতার তরু পত্র পুষ্পহীন
উভয়ের শরীরে জন্মেছে রোগজীবাণু
কিন্তু কারণ দ্বিবিধ
প্রাচ্যের মৃত্তিকায় গজিয়েছে পরাধীনতার আগাছা
আর প্রতীচ্যে গণতন্ত্রের পসরা
কেউ মুক্ত নয় দুর্বীনিত দানব থেকে
ইনসানের বুক জুড়ে শোন তার
আহত বিলাপ।" (যরবে কলীম)

তাঁর ধারণা–

গণতন্ত্র হচ্ছে এক ধরনের সরকার
যাতে মানুষকে গণনা করা হয়,
হয়না তার মূল্য যাচাই করা (যরবে কলীম)

ইকবাল তাই অনুভব করেন গণতন্ত্রের আওতায় শোষণ ও রক্তপাতকেই প্রশ্রয় দেয়া হয়েছে–

Democracy is a source of greed and avarice. It entails blood shed and exploitation. (Glimpses of Iqbal's mind and thought, H. H. Bilgrami)

গণতন্ত্রের সমালোচনায় ইকবাল মুখর; কারণ এ পদ্ধতি মানবতাকে অনৈক্য ও দৃষ্টিহীনতার মধ্যে ঠেলে দেয় এবং জাতি, স্বার্থ ও দলাদলির পৈশাচিক অন্ধকারে হারিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর এ বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

Democracy means rows. It anybody thinks that approach to democracy means sailing into a kind of lotus land he can not have read a word of History. The truth is exactly the opposite. Democracy lets loose all sorts of aspirations and grievances which were suppressed or unrealized under autocracy, it arouses hopes and ambitions often quite unpractical and relies not on authority but on argument or controversy from the platform, in the press, in Parliament, gradually to educate people to the acceptance of a solution which may not be ideal but which is the only practical one in the circumstances of the time. (Speeches and Statements of Iqbal)

একই অনুভূতি বিধৃত হয়েছে তাঁর আর একটি কবিতায় যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন–

জনতার হাতে যদি অর্পিত হয় সার্বভৌমত্ব
জীবন দুলে উঠবে বজ্র ও বাষ্পে
ইনসানের দিল থেকে রহম যাবে উঠে
হামদর্দী পরিণত হবে শুকনো কাঠে ।। (পায়াম-ই-মাশরিক)

ইকবাল অন্য এক প্রসঙ্গে লিখেছেন–

Since democracy gives rise to unlimited human ambitions, it can not be differentiated from the evil consequences of monarchy and dictatorship.

ইকবালের এই দৃষ্টিভঙ্গি কোন নিরালম্ব চিন্তার অংশীদার নয়। গণতন্ত্রের এ সীমাবদ্ধতা ও দৃষ্টিহীনতার বিরুদ্ধে অনেকেই সোচ্চার হয়েছেন এবং এর প্রতিষ্ঠিত দুর্বলতার বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলেছেন। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী উইলিয়াম র‍্যালফ ইঞ্জ গণতন্ত্রের এ দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন–

Democracy is a fair weather political creed. It works moderately well where a nation is fundamentally united—but it can not deal with anti social conspiracies. In practice, where a country is either engaged in a serious war or in danger of revolution, democratic institutions are suspended.

ইকবালের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনায় আনতে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, পশ্চিমী গণতন্ত্র মানবতার কল্যাণে উপযোগী হতে পারে না। কারণ মূর্খ জনতার কাছ থেকে প্রাপ্তির কিছু থাকে না। ইকবালের এই চিন্তাধারার অংশীদার হয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পূরোধা হ্যারল্ড লাস্কী–

A Legislative assembly is neither a collection of specialists nor a body of statesman. It is an average sample of ordinary men, deflected now this way, now that, by a drift of public opinion.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্কামপিটারও ইকবালের চিন্তার সমান্তরাল অনুভূতি বিবৃত করেছেন।

এটা বিশ্বাস করা শক্ত, গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা জনতার ইচ্ছা ও আকাঙক্ষার প্রচ্ছদ চিত্র হয়ে উঠবে। প্রায়শই দেখা যায়, এরূপ ইচ্ছার কোন যৌক্তিক পটভূমি নেই। সাধারণত জনতা কপট শিহরণ, জাঁকজমক প্রচারণা ও অপব্যাখ্যার জালে নিক্ষিপ্ত হয়। জনতার ইচ্ছা একমাত্র তখনই কার্যকর হতে পারে যখন প্রত্যেকের উপলব্ধি বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিক পটভূমি নির্মাণ করতে পারবে। কিন্তু তাদের মধ্যে এ ধরনের প্রজ্ঞার সন্ধান পাওয়া নিরর্থক। সুতরাং গণতন্ত্রের চমকে দেওয়া তত্ত্ব অস্বীকৃতির দুর্গম অরণ্যে হারিয়ে যেতে বাধ্য।

এ আলোচনা থেকে আমাদের ধারণা নিতে সুবিধা হবে, পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও ইকবালের চিন্তার মৌলিক তফাতটি। পাশ্চাত্যের পন্ডিত প্রবরেরা হয় গণতান্ত্রিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এর মৌলিক দুর্বলতা দূর করতে অগ্রসর হয়েছেন অথবা স্বৈরাচারের পক্ষপাতিত্ব করতে যেয়ে এর অকার্যকারিতাকে উল্লেখ করেছেন। গণতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের জন্য একমাত্র ঔষধ এর দুর্বল চরিত্রের মূলোচ্ছেদ আর বিরুদ্ধবাদীদের জন্য নবতর কোন চেতনার দীক্ষা গ্রহণ; এটি হতে পারে কমিউনিজম অথবা ফ্যাসিজম। কিন্তু ইকবালের জন্য ছিল ভিন্ন দিগন্ত। কারণ তাঁর চিন্তার ভুবনে ছিল ইসলামের গভীর উপলব্ধি যা গণতন্ত্রের কল্যাণকর চেতনাকে ধারণ করলেও এর

কপটতাকে পরিহার করেছে।

ইকবালের বিশ্বাস জাগ্রত হয়েছিল দেশে দেশে সাধারণ মানুষের প্রাণে যে জাগরণের সাড়া পড়েছে তার উত্তাল স্রোতে জুলুমবাজী ও মোল্লাতন্ত্রের অবসান ঘটবে। তিনি এক কবিতায় আশা করেছেন জনগণের রাজ অদূরভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পচা অতীতের নির্বীর্য ঐতিহ্য বিদূরিত হবে–

ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন, দুঃখীর রাজ!
পাপের চিহ্ন মুছে দাও, ধরা রাঙিয়ে দাও ।। (বাল-ই-জিব্রীল, অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

উল্লেখ্য, এ কবিতায় ইকবাল উপমা ও উৎপ্রেক্ষার শিল্পীত ব্যবহার করে ফেরেশেতাদের প্রতি খোদায়ী ফরমানের এক অপরূপ চিত্র পেশ করেছেন। তার ধারণা ছিল, জনগণের বিপ্লব সাধিত হবে ঐশী পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে; পশ্চিমী গণতন্ত্রের আলো হাওয়ার মধ্যে নয়। তাঁর বিবেচনায় পশ্চিমী গণতন্ত্র রাজনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক করে শোষণের মন্ত্রকে উজ্জীবিত করেছে। সরকার হয়েছে জুলুমবাজীর বাহন। খিযর-ই-রাহ কবিতায় ইকবাল এক নাটকীয় প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করে আধুনিক দুনিয়ার সমস্যাগুলো বিবৃত করেছেন। বন পরিক্রমাকালে কবির সাথে তত্ত্বজ্ঞানী হযরত খিযর (আঃ)-এর সাক্ষাত ঘটে। তখন তিনি এ সুযোগ ব্যবহার করেন এবং জীবন ও জগতের কতকগুলি জটিল সমস্যার সমাধান কামনা করেন। বর্তমান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে হযরত খিযরের প্রত্যুত্তর ছিল এমন–

পশ্চিমের গণতন্ত্র সেতো সেই সুরের ব্যঞ্জনা
যে সুরে জাগিয়া উঠে সীজারের অস্ত্রের ঝঞ্ঝা
জুলুম দানব নাচে গণতন্ত্র যবনিকা ধরি,
আহা তুমি ভাব তারে স্বাধীনতা স্বপ্নের সুন্দরী।
প্রজাতন্ত্র পরিষদ সংস্কার দাবী দাওয়া আর,
ঘুমের আরক রচে পাশ্চাত্যের রসায়নাগার।
জাতিসংঘে জ্বালাময়ী পরস্পর বিরোধী ভাষণ,
পুঁজিবাদীদের সেও সুবর্ণ সংগ্রাম সনাতন।
বর্ণ গন্ধ মরীচিকা– এর তুমি ভেবেছ কানন,
অবোধ এ খাঁচাটিকে ভরিয়াছ নীড়ের মতন। (বাঙ্গ-ই-দারা, অনুবাদ– মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

কবির আরমুগান-ই-হিজায তাঁর পরিণত জীবনের অন্তর্দৃষ্টির ফল। ইকবালের অসামান্য প্রতিভা এ কাব্যে যেন উজ্জ্বল আলোকে মূর্ত হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত সফলতার সাথে তিনি এ কাব্যাংশে পশ্চিমী গণতন্ত্রের কপট চেহারা তুলে ধরেছেন। ইবলিস কি মজলিস-ই-শূরা বা শয়তানের পরামর্শ পরিষদ নামের কবিতায় তিনি দেখিয়েছেন, আধুনিক মানুষের পরিণতি নিয়ে শয়তানের উপদেষ্টাদের মধ্যে বিতর্ক এবং এক পর্যায়ে দ্বিতীয় উপদেষ্টা পরিষদে প্রশ্ন রাখে জনগণের সার্বভৌমত্ব কি মানবতার জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে। তারা কি পৃথিবীর এই সাম্প্রতিক পরিবর্তনের ব্যাপারে নজর দিয়েছে। প্রথম উপদেষ্টা তার প্রশ্নে কোন প্রকার বিস্ময় প্রকাশ না করে বলে, এতে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই যেহেতু আধুনিক মানুষ গণতন্ত্রের লেবাসে রাজতন্ত্রকেই পুনর্বাসিত করেছে। প্রথম উপদেষ্টার ভাষ্য ছিল এ রকম–

জানি তাহা সখা; কিন্তু আমার বিশ্বজ্ঞানের বিজ্ঞতাতে
বলিতেছি এটি বহু পুরাতন, বিপদ কিছুই নাহিক তাতে

আমরাই আজ বাদশাহীকে যে সাজায়েছি গণ-পোশাক সাজে
যখন দেখেছি আত্মবোধন কিছুটা জেগেছে মানুষ মাঝে।
রাজ্য শাসনরীতির তত্ত্ব গুরুতর এক হেয়ালি যার–
রাজা ও নেতার সংজ্ঞার মাঝে খুঁজে পাবেনাকো অর্থ তার
গণপরিষদ কিংবা তখত একই চিত্রের দুইটি দিক,
অপরের জমি প্রতি যার চোখ, সেই রাজা নাম যাহাই নিক।
তুমি কি দেখনি কি রূপ ধরেছে পশ্চিমে গণতন্ত্র রাজে?
মুখেতে সদাই স্ফুরিছে হাস্য, অন্তরে তার চেঙ্গিস রাজে।'

(আরমুগান-ই-হিজায, অনুবাদ– মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

যেহেতু কবি রচিত এ কাব্য তাঁর পরিণত জীবনের ফসল তাই ধরে নিতে পারি সমকালীন রাজনীতির এ হলো তাঁর নিরীক্ষামূলক শেষ পর্যবেক্ষণ। গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর এ বৈরাগ্যের প্রাথমিক কারণ হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুঁজিবাদীরা সাধারণ মানুষের শোষণকারীতে পরিণত হয় এবং জনতা অনেক ক্ষেত্রেই দুঃখ ও বেদনার দুর্দৈবে নিক্ষিপ্ত হয়। যেমন ইকবালের মত এ.ডি. লিন্ডসে বলেছেন–

Ignorant masses become puppets in the hands of clever politicians and in a situation like this power is concentrated into the hands of a group of persons who conveniently exploit the masses.

(The Modern Democratic State, A.D. Lindsay)

ইকবালের এ পর্যবেক্ষণ এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর ধারণা, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র চর্চা যথেষ্ট নয়, পক্ষান্তরে কোন রাজনৈতিক পদ্ধতিই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না যতক্ষণ না তার শরীরে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল হবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে এ মত পোষণ করেন, একমাত্র ইসলামের মধ্যেই এই নৈতিক উপকরণ কার্যত বর্তমান যা মানবতাকে সকল প্রকার দুর্নীতি আচরণের ঊর্ধ্বে রাখতে পারে। ১৯১৭ সালের ২৮ জুলাই নিউ এরা পত্রিকায় ইকবাল তাঁর এ মতামতের মূল্যায়ন করেছেন এমনিভাবে–

The Democracy of Europe—over shadowed by socialistic agitation and anarchical fear-originated mainly in the economic regeneration of European societies. Neitzche, however abhors this rule of the herd and hopeless of the plebian, he bases all higher culture on the cultivation and growth of an Aristocracy of Superman. But is the plebian so absolutely hopeless? the Democracy of Islam did not grow out of the extension of Economic opportunity, it is a spiritual principle based on the assumption that every human being is a centre of latent power the possibilities of which can be developed by cultivating a certain type of character. Out of the plebian material, Islam has formed men of the noblest type of life and power. Is not, then the Democracy of early Islam an experimental refutation of the ideas of Nietzsche.

ইকবালের কবিতা ও রচনাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় তিনি তার নিরূপিত রাজনৈতিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক সুবিচার ও কল্যাণকামিতার উপরও জোর দিয়েছিলেন। বর্তমান কালে ধারণা করা

হয় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন কার্যকারিতা নেই। ইকবাল সেই বিরল মনীষার অন্তর্গত যারা এ শতকের সূচনাতেই আন্দাজ করেছিলেন রাজনৈতিক গণতন্ত্র বর্তমানের জটিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিরসনে কোন ভূমিকা রাখতে পারবেনা। তার জন্য চাই উনবিংশ শতাব্দীর উদার নৈতিক গণতান্ত্রিক কাঠামোতে অর্থনৈতিক সুবিচারের আবরণ। এদিক দিয়ে ইকবাল তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী ছিলেন।

Iqbal showed the insight of a great visionary and was certainly ahead of his times. (The image of the West in Iqbal, Mazheruddin Siddiqi)

ইসলাম, ইকবাল যাকে মনে করতেন বর্তমান শতকের জটিল সমস্যারাজির অভ্রান্ত পরিত্রাণকারী তা মানবতার মর্যাদাকে সুউচ্চ করেছে এবং গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্ম দিয়ে একটি প্রাণপূর্ণ নিষ্কলুষ সামাজিক প্রগতিকে নিশ্চিত করেছে। ইকবাল মনে করতেন, মুসলিম জনতার অনুভূতির জাগরণ ও মুক্তি যা কেবল আধ্যাত্মিক নীতিমালাকে প্রাত্যহিক জীবনে সুচারুরূপে বাস্তবায়নের মাধ্যমে কার্যকর করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে ইকবাল উল্লেখ করেছেন–

Let the Muslim of today appreciate his position, reconstruct his social life in the light of ultimate principles, and evolve, out of the hitherto partially revealed purpose of Islam, that spiritual democracy, which is the ultimate aim of Islam.

(The Reconstruction of Religious Thought in Islam)

ইকবাল বিশ্বাস করতেন, ইসলামে যে গণতান্ত্রিক রীতি-পদ্ধতি বর্তমান তার প্রাণ নিহিত আছে আধ্যাত্মিকতায় যা মানবতাকে ঝঞ্ঝা ও বিশৃংখলা থেকে নিরাপদ রাখবে ও নৈতিকতার সুগভীর মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাবে। ইকবাল বস্তুবাদী প্রগতিকে তাই মানব প্রগতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেননি, কারণ বস্তুর পর্যটন কখনও উর্ধমুখী হতে পারে না। ইসলামী গণতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে তা হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা যা মানব চরিত্রকে নির্ভীক ও অকুতোভয় করে তোলে। ন্যায়ের সমর্থন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মধ্যে যে ইসলামী জিন্দেগীর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে তা এই খোদায়ী সার্বভৌমত্বের তরুচ্ছায়ায় বর্ধিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে যে কেউ সামাজিক নেতৃত্বকে প্রশ্ন করতে পারে; অবশ্যই তা ঐশী নীতিমালার পরিকল্পনাধীন হতে হবে। ইকবালের ধারণা, ইসলামে বিধৃত এই নীতিমালা পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদারনৈতিক গণতন্ত্রের চেয়ে উত্তম, কারণ পশ্চিমী গণতন্ত্র প্রচারণা ও দলাদলির গহীন অন্ধকারে ডুবে আছে এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য শুধুমাত্র কাগজে বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফলে পশ্চিমী গণতন্ত্রে প্রদত্ত স্বাধীনতা হয়েছে জনগণের জন্য এক প্রহেলিকা। ইকবালের বিবেচনায় তাই একমাত্র খোদা প্রদত্ত পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা ব্যতীত যে কোন ধরনের মানব রচিত নীতিমালা স্বাধীনতা ও প্রগতির নিয়ামক হতে পরে না। ইসলামের এই মৌলিকত্বই একজন মুসলমানকে নির্ভীক ও সংগ্রামী চেতনার অধিকারী করে তোলে। ইকবাল বলেন–

The cultural proposition which regulates the structure of Islam then, is that there is fear in nature and the object of Islam is to free man from fear, this view of the universe indicates also the Islamic view of the metaphysical nature of man. If fear is the force which dominates man and counteracts his

ethical progress man must be regarded as a unit of force, an energy a will, a germ of infinite power, the gradual unfolding of which must be the object of all human activity.

(Thoughts and Reflections of Iqbal)

ইকবালের রাজনৈতিক চেতনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। ইসলামে ব্যক্তির বিকাশ ও সৃষ্টিশীল জাগরণের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে, আর পশ্চিমী গণতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের পরাজয় ও অনুভূতিহীনতার মাধ্যমে জিন্দেগীর কল্যাণকে ব্যাহত করা হয়েছে। একটি সংগঠিত প্রকল্পের মাধ্যমে যে গণতান্ত্রিক আচ্ছাদন সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হয়েছে ও পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে সময়ের যাত্রায় তার বুনিয়াদ প্রকৃত অর্থেই দুর্বল ও ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছে।

ইকবালের দৃষ্টিতে ছিল এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল আলোকদীপ্ত ইসলামী খেলাফতের স্বপ্ন। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পুণ্য খলিফা চতুষ্টয়ের জীবদ্দশায় সে সম্ভাবনা একবার মূর্ত হয়ে উঠেছিল এবং প্রচণ্ড অমিততেজ ও বলিষ্ঠতা নিয়ে পৃথিবীর সকল কল্যাণকামিতাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। ইকবাল আধুনিককালেও এই সুসমন্বিত সমাজ ব্যবস্থার নবরূপায়ণ কামনা করেছেন এবং বস্তুবাদী সভ্যতার বিপরীতে অনাগতকালের ইসলামের প্রাণ চেতনাকে ধারণ করেছেন। তাঁর গোচরীভূত ছিল, ইসলামী খেলাফত উমাইয়া, আব্বাসীয় ও পরবর্তী মুসলিম শাসকদের হাতে কদর্যরূপ পেয়েছিল এবং খেলাফত তার মৌলিক চরিত্র হারিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূত জীবনাদর্শ থেকে পরবর্তীকালের মুসলমানরা কোন প্রেরণা সৃষ্টিকারী উপমাই উপস্থাপন করতে পারেনি।

কিন্তু ইকবাল নৈরাশ্যবাদী ছিলেন না। জীবনের গহীন অন্ধকারেও নতুন দিনের স্বপ্ন গীতিকা তার কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। বেদনার 'অশ্রুভেজা' পথ ছেড়ে তাঁর মুসাফির ভবিষ্যৎ মানবতার চিত্রপটে এক কল্যাণ সূর্যকে স্বাগত জানিয়েছে। ইসলামী খেলাফতের জাগরণ ও অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ইকবাল মানুষের সেই বিরামহীন সফলতা ও অগ্রযাত্রার কাহিনীকেই উন্মোচন করেছেন।

ইকবাল ও জাতীয়তাবাদ

ইকবালের অসামান্য প্রতিভা ও জীবন চেতনার যাদুকরী স্পর্শে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলিত স্রোতধারা এক অপূর্ব শিল্প কাজ হয়ে আমাদের অনুভূতিতে জাগরণ তুলেছে। ইকবাল কাব্যের বিভূতি নতুনে প্রাচীনে সমন্বয়ে, দিগন্ত আদিগন্তের প্রসারতায় এক বিচিত্র মানবমেলার আসর জমিয়েছে।

জাতীয়তাবাদের অন্দর পার হয়ে তিনি ছুটেছেন সর্বমানবিকতার লোকালয়ে; দেশের সীমানা ভেঙ্গে তিনি পর্যটন করেছেন পৃথিবীর পথে।

ইকবালের জীবনানুভূতিতে ইসলাম কি মধুর সুর তরঙ্গ তুলেছে; তাঁর কাব্য ও দর্শনের শরীরে কোরআনী জীবন দর্শনের গীতিকা মায়াবী লাবণ্য হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ইকবালের মনীষা ও ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে জাতীয়তাবাদের বিবর্ণ চিত্র প্রকটিত হয়ে উঠেছে। তাঁর কবি জীবনের সূচনাতে সর্বভারতীয় বৈচিত্র্য ও স্বাদেশিকতা একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করলেও পরবর্তীকালে তা কেমন করে হলুদ পাতার মত ইকবালীয় মহীরূহ থেকে ঝরে পড়েছে, অনুসন্ধানীদের কাছে এ এক পরম বিস্ময়ের ব্যাপার। ব্যক্তিগত জীবনে একজন ঐকান্তিক জাতীয়তাবাদী থেকে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও প্যান ইসলামী চিন্তার প্রবক্তা হিসেবে তাঁর রূপান্তর ঘটেছিল। তাই আধুনিক বিশ্বাস ও রাজনৈতিক দর্শনসমূহের মধ্যে জাতীয়তাবাদ তাঁকে এত প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল; তাঁর কাব্যে এবং কখনো কখনো দার্শনিক প্রজ্ঞামূলক নিবন্ধে এর চিত্র ফুটে উঠেছে। ইউরোপীয় শক্তির নিবর্তনমূলক আচরণে তাঁর এ প্রতীতি গভীর হয়েছিল।

কিন্তু ইকবালের চিন্তার সামনে জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ধারণাও কার্যকরভাবে সক্রিয় ছিল। একজন পরিপূর্ণ ও ঈমানদার মুসলমান হিসেবে তিনি আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ চালিয়েছিলেন এবং এর দুর্বলতার দিকগুলিকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

ইকবালের কবি জীবনের প্রথম প্রসূণ বাঙ্গ-ই-দারা তাঁর স্বাদেশিকতা, দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী চেতনার গীতিময় রূপায়ণ। স্বদেশ বন্দনা ও মাতৃভূমি-প্রীতি এ সময় তাঁর এতদূর এগিয়েছিল যে, এর বাইরে তিনি কোন কিছুই গ্রহণ করতে উৎসুক ছিলেন না।

তারানায়ে হিন্দ, মেরা ওয়াতান ওহি হ্যায়, হিন্দুস্তান হামারা প্রভৃতি কবিতায় তাঁর স্বদেশ তথা ভারতীয় প্রেম উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। নয়া শিওয়ালা কবিতায় তিনি গেয়েছেন–

> ওরে ব্রাহ্মণ! মন্দিরের দেবতা তোর পুরানো হয়ে গেছে!
> নিজেদের মধ্যে ভেদাভেদ– এতো তুই তাঁর কাছেই শিখেছিস,
> খোদাই তো শিখিয়েছেন ওয়ায়েজকে ঝগড়া বিবাদ করতে।
> মসজিদ মন্দির কোনটাতেই আমার ভক্তি নেই।
> ব্রাহ্মণ মোল্লা দুইই ছেড়েছি আমি।
> তুই ভেবেছিস পাথরের মন্দিরে দেবতা আছে!
> জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা কিন্তু আমার দেবতা। (অনুবাদ– হবীবুল্লাহ বাহার)

অথবা 'হিন্দুস্তাঁ হামারা'তে গর্ব করেছেন ঃ সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা।

কিন্তু মহাযুদ্ধের পটভূমিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি যখন মুসলিম দুনিয়ায় ঘাতকের বেশে অনুপ্রবেশ করলো এবং উম্মাহর এক ও অবিচ্ছিন্ন শরীরে অনৈক্যের বীজ ঢুকিয়ে দিলো ইকবালের চৈতন্যে তখন নতুন ফুল ফুটেছে। জাতীয়তাবাদের মর্মান্তিক পীড়ন ও অনাচারের দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে যে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর ছবি উন্মোচিত করল তাঁর অন্তর্লোকে যে পরিবর্তন সাধিত হল তাই ইকবালের অনাগত কালের চিন্তাকে সুষমামন্ডিত করল। ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ উপলক্ষে রচিত্ তাঁর কশাঘাতে বিধৃত হয়েছে ইউরোপের এক সমীকৃত চিত্র যা জাতীয়তাবাদের দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত–

য়ুরোপীয় শকুন দল এখনো জানেনা
কত বিষাক্ত ঐ শবদেহ আবিসিনিয়ার।...
সভ্যতার শীর্ষ হচ্ছে মহত্ত্বের অধঃপতন,
নেশন-এর প্রাত্যহিক জীবিকা দস্যুবৃত্তি।
নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে প্রত্যেক নির্দোষ এক একটি
মেষ শাবকের সন্ধানে।
বিলাপ করো, চার্চের স্বমহিমার আয়নাটি ভাঙ্গল
রাস্তার মাঝখানে ঐ রোমানেরা
হায়রে চার্চের মানুষ। হৃদয়বিদারক এই ঘটনা। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

ইকবাল এইবার অনাঘ্রাতা ইসলামের পুষ্পোদ্যানে সরল ও কোমল পরিবেশে প্রাণপূর্ণ নিঃশ্বাস নিলেন। তাঁর এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুধু তাঁকে ইসলামী দুনিয়ার এক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিহ্নিত করল না। সমগ্র মুসলিম উম্মার রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে আলোড়নের ঢেউ তুলে দিল।

ভারতীয় রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী দর্শন একটি কার্যকরী অবয়ব লাভ করেছিল। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষত কংগ্রেসী মুসলিম নেতৃত্ব ইসলামী মৌল চেতনার এই বিরুদ্ধ দর্শনের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছিলেন। এদের মধ্যে প্রাজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও হোসাইন আহমদ মাদানীর মত ব্যক্তিত্বও ছিলেন। ইকবাল তাঁর জীবদ্দশায় কংগ্রেসী মুসলিম নেতৃত্বের এই জাতীয়তাবাদী চিন্তার সমালোচনা করেন এবং উল্লেখ করেন, জাতীয়তাবাদী রাজনীতি কোরআন ও সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি একবার অসুস্থ থাকাকালীন মওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সাথে এই বিষয়ে খোলাখুলী বিতর্কে লিপ্ত হন, কারণ তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল একবার ইসলামী বিশ্বাসের এই মৌল চেতনাটি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তার মেঘ কাটানো এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে।

ইকবাল যদিও তাঁর জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণার কোন পরিপূর্ণ চিত্র আমাদের দেননি কিংবা এ প্রসঙ্গে কোন পূর্ণাঙ্গ লেখনী তিনি রেখে যাননি কিন্তু তাঁর বিভিন্ন কবিতা এবং বক্তব্য বিবৃতি ও বিচ্ছিন্ন নিবন্ধ পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর জাতীয়তাবাদী ধারণা ও বিশ্বাসের একটি অবকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব।

ইকবালের এই বিশিষ্ট ধারণার একটি সম্যক চিত্র অবগত হতে হলে প্রথমেই আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে এবং একই সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে

আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার এই মৌল দিকটির সাথে ইসলামের সামঞ্জস্যহীনতা কতটুকু। কার্যত ইকবালের চিন্তা ও ভাবনা সমীকৃত হয়েছে ইসলামের অন্তর্লীন বিশ্বাস ও গভীর জীবনবোধের প্রেক্ষিতে। তাই স্বভাবতই ইসলাম ও জাতীয়তাবাদের একটি তুলনামূলক বিবেচনাও ইকবালের চিন্তার স্বরূপটি উন্মোচনে সহায়ক হবে।

মনীষী বর্ট্রান্ড রাসেল স্বদেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের একটি সুন্দর চিত্র পেশ করেছেন। স্বদেশপ্রেমের জন্ম ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করেছেন এর বয়স খুব বেশী নয়। জোয়ান অব আর্কের ত্যাগের মধ্য দিয়ে তা সর্বপ্রথম ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপোলিয়ন তা জার্মানীতে আমদানী করেন। মেটারলিংক তার বীজ ইতালীতে বপন করেন এবং শেক্সপিয়রের মত এমন মধুর ও চিত্তহারী ভাষায় এ বিষ আর কেউ পরিবেশন করতে পারেনি।

জাতীয়তাবাদের সূচনায় থাকে মানুষের আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও পরিণতিতে তাই আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার নিয়ামকে পরিণত হয়। বর্ণ, ভাষা ও গোত্র প্রভৃতি কেন্দ্র করে এই আধিপত্য বিস্তারের প্রতিযোগিতা চলে এবং অবশেষে অপরাপর জাতি-গোষ্ঠীর উপর আপন প্রাধান্য সৃষ্টির মাধ্যমে জুলুম ও শোষণ বিস্তৃত হয়। অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য যা জাতীয় চেতনার জাগরণ ঘটায় পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা লাভের পর নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অন্যকে মোক্ষণ করবার ধারণা এদেরকে পেয়ে বসে।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদ একটি মন্ত্র শক্তিতে পরিণত হয় এবং ইউরোপীয় জাতি-গোষ্ঠীর কাছে অনেকটা বিশ্বাসের অবয়ব লাভ করে। আধুনিককালেও জাতীয়তাবাদ তার বিস্তর সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সভ্যতার একটি প্রলম্বিত উপাদান হিসেবে বর্তমান। একটি সুসমন্বিত সংগঠিত কাঠামো ব্যতিরেকেই জাতীয়তাবাদ মানুষের একটি শক্তিশালী অনভূতি। অনেকটা ধর্মান্ধতার সাথে যার তুলনা চলে। এই কারণেই জাতীয়তাবাদ কোন যুক্তি কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধার ধারেনা এবং প্রচণ্ড আবেগময়তা যার শরীরকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

অনেকটা ধর্মের মত জাতীয়তাবাদও মানুষের কাছে কিছু আনুগত্য আশা করে, পরিণতিতে ত্যাগ ও উৎসর্গের প্রশ্নটিও জাতীয়তাবাদের সাথে অস্তিত্ব লাভ করে।

মানবতার জন্য জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় অবদান, উদ্দেশ্যের সততা, আত্মত্যাগের সীমাহীন অনুভূতির জন্য, আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মানুষের সুপ্ত শক্তিকে নিয়োগ। হ্যারল্ড জে. লাসকীর ভাষায়–

In so far as we can give to each nation , the power to express itself as a state, it seems to me clear that we liberate a spiritual energy which beyond discussion adds to the happiness of mankind. (Nationalism and the Future of Civilization, Harold J. Laski)

আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতার প্রগতি ও উন্নয়নে জাতীয়তাবাদ একটি কার্যকর শক্তি হিসেবে কাজ করলেও তার বিপরীতে মানব প্রগতির দুয়ার রুদ্ধকারী শক্তি হিসেবেও এর আবির্ভাব। জাতীয়তাবাদী ধারণার মৌলিকত্ব নিহিত রয়েছে সামরিক বিজয়ে এবং এক জাতি কর্তৃক অন্য জাতির উপর বিদ্বেষ পোষণে। ভৌগোলিক আগ্রাসনের মধ্যে যার গৌরব নিহিত এবং পারস্পরিক খুন ও জখমে যার ইতিহাস কালিমা লিপ্ত। জাতীয়তাবাদের এই অন্ধকার চিত্র উঠে এসেছে ওয়াল্টার লেকারের কলমে–

Nationalism is distinguished by the over estimation of ones own nation and the denigration of others, the lack of the spirit of self criticism and

responsibility, an ambivalent appraisal of the destiny of one's nation based on a feeling of inferiority and a general tendency to attribute anything wrong with one's nation to the evil doing of others, who should consequently be fought. (Communism and nationalism in the Middle East, Walter, Lacquer)

পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের এই মর্মান্তিক অনাচার দর্শনে ইকবাল পীড়িত হয়েছেন। বর্ণ ও গোত্রের ভাগাভাগি তাঁকে ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ধারণা। যা ভূগোলের সীমানাকে অতিক্রম করেছে এবং স্থান-কাল-পাত্রের ঠিকানাকে মুছে দিয়েছে। সমগ্র মানবজাতি ছিল তাঁর কাছে আল্লাহর এক পরিবার। তাঁর প্রতীতি হয়েছিল আল্লাহর সর্বশক্তিমানত্বের যে ধারণা তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির সূচনা করতে পারে। একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ডের আওতাধীন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব শুধু পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ ও রক্তপাতের নিশ্চয়তাই বিধান করে।

ইসলামে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে তা গোত্রীয় প্রাধান্য কিংবা ভূখন্ডগত অস্তিত্বের ভিত্তিতে নয়। কওমিয়াত (জাতীয়তা) ও ওয়াতানিয়াত (জাতীয়তাবাদ) এ দুটি উপকরণই ইসলামের মৌলিকত্বের পরিপন্থী। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের যে ধারণা আরোপ করা হয়েছিল এবং ঐশী প্রত্যাদেশ দ্বারা মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রিত হবার যে পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল তার কাছে বর্ণ, গোত্র ও ভূখণ্ডের কোনই তাৎপর্য নেই। প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহম্মদ আসাদের ভাষ্য এরকম–

জাতীয়তা তার সকল রূপ এবং আবরণেই, সকল মানুষ সমান, ইসলামের এই মূলনীতির বিপরীত। এই জন্য জাতীয়তাকে মুসলিম সমাজের সম্ভাব্য ভিত্তিরূপে একেবারেই বর্জন করতে হবে। আল কুরআন এবং সুন্নাহর শিক্ষানুযায়ী সে ঐক্য হওয়া চাই আদর্শিক প্রকৃতির যা জাতি ও জন্মের সমস্ত বিবেচনাকে অতিক্রম করে যায়; সে ভ্রাতৃত্ব এমন সব লোকের ভ্রাতৃত্ব যারা শুধু একই বিশ্বাস এবং একই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা ঐক্যবদ্ধ, অন্য কিছুর দ্বারা নয়। ইসলামের শিক্ষানুসারে শুধু আদর্শের এমন ঐক্যই মানুষের সকল দল গঠনের ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি হতে পারে। পক্ষান্তরে নিজের জাতির বা দেশের বাস্তব অবস্থা কাল্পনিক স্বার্থকে নৈতিক বিচার-বিবেচনার উর্ধে স্থাপন করাকে রাসূল (সঃ) কঠোরতম ভাষায় নিন্দা করেছেন ঃ গোত্রগত স্বার্থের কথা যে ঘোষণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয়; গোত্রগত স্বার্থের জন্য যে লড়াই করে, সে আমার দলভুক্ত নয়; গোত্রের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যে মারা যায়, সে আমার দলভুক্ত নয়।

(ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি, অনুবাদ– শাহেদ আলী)

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে বিশ্বাসী মানব গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার লক্ষ্যই ছিল পৃথিবীতে আল্লাহর কানুনকে প্রতিষ্ঠা করা। ঐশী ইচ্ছার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ও সমাজ পরিচালনার মধ্যে এর সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। স্থান, কাল ও সময়ের গন্ডিতেই ঐশী ইচ্ছাকে বন্দী করা সম্ভব নয়। ইসলামের এই মৌলিক চরিত্রই খিলাফতের মধ্যে অস্তিত্ব লাভ করেছে। খেলাফতের নেতৃত্ব দানকারী আমীর-উল-মুমেনীন এই সার্বজনীন মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। মুমেনীন কোন বিশেষ স্থানের জন্য প্রযোজ্য নয়, পরন্তু সারা দুনিয়ার সকল বিশ্বাসীদের জন্য যারা আল্লাহ ও রাসূলের পথের পর্যটক।

দুঃখজনক হলেও সত্য, মুসলমানদের এই রাজনৈতিক ঐক্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। গোত্রীয় আধিপত্য ও বিচ্ছিন্ন চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশের ফলে খেলাফতের সার্বজনীন উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

এতদসত্ত্বেও খেলাফতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক চরিত্র বজায় থাকে বহুদিন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মুসলমানরা এমনকি স্বাধীন নরপতিরা খেলাফতের প্রতি এই আনুগত্য বজায় রাখার ঐতিহ্য রক্ষা করে চলে। গজনীর সুলতান মাহমুদের মত অনেক স্বাধীন ও শক্তিশালী নৃপতিরাও খেলাফতের আইনগত স্বীকৃতি কামনা করেছিলেন। খেলাফতের কাঠামোগত অস্তিত্ব যত দুর্বলতর হোক না কেন এটা বলা আবশ্যক মুসলিম সম্প্রদায় কার্যত, না হলেও তাত্ত্বিকভাবে সর্বদাই এক সার্বজনীন বিশ্বাসী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ইসলামী আদর্শের প্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই অমূলক। কারণ, মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বজনীন চরিত্র স্থান, কাল ও পাত্রের সীমানায় আটক নয়। এক সময় খেলাফতকে দ্বিমাত্রিক অর্থে বোঝানো হত; রাজনৈতিক ও ধর্মীয়। কিন্তু সময়ের আবর্তনে এর রাজনৈতিক চরিত্র খসে পড়লেও ধর্মীয় চরিত্র অক্ষুণ্ন ছিল। তুরস্কের উসমানী খেলাফতের বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এর ধর্মীয় পরিচিতিটুকুও বিলুপ্ত হয়।

উনবিংশ শতাব্দী থেকেই মুসলিম দুনিয়ায় পাশ্চাত্যের ধর্মহীন রাজনৈতিক বিশ্বাসসমূহের অনুপ্রবেশ ঘটিতে থাকে; যার ফল স্বরূপ মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও নবতর চেতনার জাগরণ ঘটে। তখন থেকেই তারা ইসলামী আদর্শের সাথে জাতীয়তাবাদের এক সাংঘর্ষিক চিত্র তুলে ধরতে আরম্ভ করেন। তুরস্কের বুদ্ধিজীবীরা সর্বপ্রথম এই পাশ্চাত্য দর্শনের বিরুদ্ধে একত্রিত হন। তুরস্কেই প্রথম ইসলামী খেলাফতের পতন ঘনিয়ে এসেছিল এবং এখানেই পাশ্চাত্যের ধর্মহীন তরংগাভিঘাত ঝড়ের সূচনা করেছিল। তাই তুরস্কের ইসলাম-পাবন্দ বুদ্ধিজীবীরা জাতীয়তাবাদের অনৈসলামী মুখোশ তুলে ধরেন। তাদের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় ছিলেন সিবদেত পাশা, নামিক কামাল এবং জিয়া পাশা। শরীয়তের সংরক্ষণে তাদের অপরিসীম অবদান তুরস্কের সমাজদেহে আলোড়ন তুললেও পরবর্তীকালে তা জাতীয়তাবাদীদের হাতে বন্দী হয়ে পড়ে। সিবদেত পাশা ১৮৫৬ সালে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন–

Today we have lost Our sacred national rights which our ancestors gained with their blood. While the Islamic nation used to be the ruling nation, it is bereft of this sacred right. This is a day of tears and mourning for the Muslim brethern. (Islam in the Modern National State. E.I.J. Rosenthal)

নামিক কামাল সর্বপ্রথম দেশপ্রেম অর্থে ওয়াতন শব্দের সূচনা করেন যা ইকবালের সীমিত অর্থে মিল্লাতের পরিপূরক। একইভাবে জিয়া পাশা ইসলামী ঐক্যের প্রতীক হিসাবে খিলাফতের সংরক্ষণের উপর জোর দেন। রসেন্থাল এ বুদ্ধিজীবীদের আদর্শ ও বিশ্বাসের সমীকরণ করেছেন এভাবে–

....Unity of all Muslims in the Umma or Jamma (Community) is understood not only on the international universal level but also within the Muslim Turkish millat on a national level. In this, we undoubtedly see the prevailing political situation. Yet the Islamists who understood this two fold love of religion and of nation as a divine gift opposed nationalism (qaumiyyet) and tribalism (asabiyyet).

The Islamists only recognijed one unity, that of all muslims under the Shariat. (E. I. J. Rosenthal—Islam in the Modern National State)

তুরস্কে যখন জাতীয়তাবাদীরা ক্ষমতায় আসে তখন তার সাথে ইসলামী মিল্লাতের স্বপ্নও

ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মোস্তফা কামাল পাশা এ ধূলিসাৎ কর্মে নেতৃত্ব দেন। ইকবাল তাঁর জাভিদ নামায় সাঈদ হালিম পাশার মুখ দিয়ে মোস্তফা কামাল পাশার এ ধর্মহীন রাজনৈতিক বিপ্লবের চিত্র তুলে ধরেছেন–

নবজীবনের সেতার তুলে এনেছে তুর্কী কামাল
পুরনো মন্দির ধুয়ে মুছে ঝকঝকে
বানানোর কাজে সে ব্যস্ত
সে জানে না পশ্চিমীদের রং ও কলা
কাবার প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত
তুর্কীদের বাজনায় নেই নতুন কোন কাফেলার ঘন্টাধ্বনি
য়ূরোপের পুরনো চেহারা ঢাকা পড়েছে
নতুন সাজে মাত্র
তুর্কীদের হৃদয় উত্তাপহীন
অন্তর সঙ্গীত হারা
জরা ও মৃত্যুর পৃথিবীকেই ঘিরে আছে ওরা
যেমন অগ্নিশিখায় জ্বলে মোম
য়ূরোপের প্রজ্বলিত শিখা
তেমনি দহন করছে তুর্কীদের।

এসময় আফ্রিকায় শেখ আহমদ সেনৌসীর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় নিয়ে যে দুর্বার আন্দোলন অস্তিত্ব লাভ করে এবং পরবর্তীকালে মিসরে হাসানুল বান্না ও সাইয়েদ কুতুবের পরিচালনাধীন ইখওয়ানুল মুসলেমীন যে সমজাতীয় আন্দোলন গড়ে তোলে তাদের চেতনায়ও জাতীয়তাবাদ কখনো প্রশ্রয় পায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসে সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী যে ঐতিহাসিক প্যান ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন এবং মুসলিম দুনিয়ায় যা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে তাও এই জাতীয়তাবাদের স্থানিক বাষ্পের ঊর্ধে ছিল।

আধুনিককালেও অনেক অমুসলমান মনীষা জাতীয়তাবাদের এই খরতরঙ্গ মুক্ত হয়ে এক বিপুল মহামানবিক পৃথিবীর অস্তিত্ব কামনা করেছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ দুনিয়ার দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে যে অনাচার ও রক্তস্রোত তার অবসানে এক বিশ্ব সরকার প্রতিষ্ঠার নৈতিক ধারণা পোষণ করেছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংবেদনশীল আত্মাও জাতীয়তাবাদের মর্মান্তিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।

জাতিপ্রেম ছুটিয়াছে মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থতরী গুপ্ত পর্বতের পানে। (চৈতালী)

সমকালে জাতীয়তাবাদের বৈরী বিষে আক্রান্ত হয়ে পৃথিবীব্যাপী যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছিল তার থেকে উপমহাদেশের আসমানও মুক্ত ছিল না। ১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে ভারতীয় মুসলিম সমাজে নৈরাশ্যের রাহু তার অভিশপ্ত পাখা বিস্তার করে। এমনি দিনে কওমের ত্রাণকর্তা হিসাবে অবতীর্ণ হন উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, মাওলানা শিবলী নোমানী ও আলতাফ হোসেন হালী এবং বাংলাদেশে স্যার সৈয়দ আমীর আলী। এদের অক্লান্ত পরিশ্রমে হতাশাগ্রস্ত মুসলিম প্রাণে জাগরণের ঢেউ প্রবাহিত হতে শুরু করে।

ভারতীয় সমাজদেহে ইতোমধ্যে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী চেতনা পল্লবিত হতে শুরু করেছে এবং শিক্ষিত হিন্দু শ্রেণী ভারতের এ নববিধানকে মানসিকভাবে গ্রহণ করতে লেগেছে। ইংরেজ আশীর্বাদপুষ্ট হিন্দুরা এই পশ্চিমী চিন্তার পক্ষপুটে আশ্রয় লাভের জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়কেও উজ্জীবিত করতে আরম্ভ করে, কারণ, তারা নিশ্চিত ছিল ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী এই বৃক্ষতলে তারা সর্বদাই নিরাপদ থাকবে। কোন কোন বিচ্ছিন্ন মুসলিম নেতৃত্ব এই ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাবাহীদের ক্রীড়নকে পরিণত হলেও অধিকাংশই কওমের পতনোন্মুখ চিত্রপটে ইসলামের শাশ্বত মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যাশা করেছিলেন। স্যার সৈয়দ, শিবলী,হালী এবং আমীর আলী তাদের কর্তব্য কর্মে এবং সর্বোপরি লেখনীতে ইসলামের উৎকৃষ্ট পরিচয়কেই সমুন্নত রেখেছেন।

স্যার সৈয়দ তাঁর লেখনীতে ইসলামের মুক্তবুদ্ধি ও মানবিক মূল্যবোধের দীপ্তিকে ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাঁর গভীর প্রত্যয় ছিল ইসলাম আধুনিককালেও মুসলমানের জড়তাকে লুপ্ত করে এক গতিশীল প্রাণের মধুচ্ছন্দা জবাকুসুমকে প্রোজ্বল করতে পারে। মাওলানা শিবলী ছিলেন ঐতিহ্যের ধারক; মুসলমানের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করিয়ে তিনি প্রত্যাশা করেছেন বর্তমানকালেও সে এমনি ইতিহাস রচনা করুক। আলতাফ হোসেন হালী ছিলেন কবি; মুসলমানের প্রাণবীণাকে কবিতার নির্ঝরে তুলে কামিয়াবির উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি; সে স্বপ্নের রক্তলেখা অনুপম গীতি মূর্ছনা হয়ে তাঁর সুবিখ্যাত মুসাদ্দাসের মধ্যে ভাস্বর হয়েছে। এদের সকলের মধ্যে যিনি দীপ্তিমান ব্যক্তিত্ব, ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ আগ্রাসন যার কঠিন বাজুতে প্রতিহত হয়ে ফিরেছে তিনি স্যার সৈয়দ আমীর আলী। পাশ্চাত্যের ইসলামবিরোধী মানসিকতা ও বিদ্বেষের বিপরীতে তিনি ইসলামের মহামানবিক বাণীকে পেশ করেছেন। তার স্মরণীয় কীর্তি The Spirit of Islam-এ এ চেতনাই প্রজ্বলিত হয়েছে।

এ শতকের সূচনাতে উপরোল্লিখিত নেতৃবৃন্দের ভূমিকা, জনতার উদ্বেল জাগরণীতে মুখর হয়ে উঠেছে আরো দুইজন ক্ষুরধার ব্যক্তিত্বের প্রাণস্পর্শে; এরা হলেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও আল্লামা ইকবাল।

মওলানা আযাদ তার সুবিখ্যাত **আল হিলাল** পত্রিকার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক চিন্তার দিকটি উজ্জীবিত করেন এবং উল্লেখ করেন পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম দুনিয়ায় কি বিপর্যয় ঘটিয়ে চলেছে। ইকবাল তাঁর কবিতায় মুসলিম জনতার প্রাণে জাগরণের অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার, হল এই মাওলানা আযাদ জীবনের প্রারম্ভে ছিলেন ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদের সফরসঙ্গী, কিন্তু পরবর্তীকালে তাকেই দেখা গিয়েছিল জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র হিসেবে। অন্যদিকে একজন জাতীয়তাবাদী থেকে ইকবালের রূপান্তর ঘটেছিলো ইসলামী আদর্শের পুনর্জীবনবাহী হিসেবে।

ইকবালের চিন্তার দিগন্তে জাতীয়তাবাদের বিকৃতি ধরা পড়েছিল দুটি দিক থেকে; রাজনৈতিক ও ধর্মীয় উভয় প্রান্ত থেকেই তিনি এর বিচ্যুতিসমূহ নির্দেশ করেছিলেন। উপমহাদেশে তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি আদর্শ হিসেবে জাতীয়তাবাদের নিরীক্ষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। সূচনাতে জাতীয়তাবাদ তাকে প্রলুব্ধ করেছিল কিন্তু ইউরোপ পর্যটনের পর তাঁর মানসিকতায় জাতীয়তাবাদ যে কালিমার ছাপ রেখে যায় তা তাঁকে এর দিগন্ত থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য করে। তাঁর গোচরীভূত হয়, ইউরোপীয় জাতিসমূহ তাদের ভৌগোলিক স্বার্থ রক্ষার খাতিরে কি

ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে। বিশ্বযুদ্ধের যন্ত্রণাকাতর চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি অবলোকন করেন জাতীয় গৌরব অক্ষুণ্ন রাখার খাতিরে মানবতার জমিন কেমন রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠেছে। স্থানিক অখন্ডতা অপরাপর মানুষের প্রতি কেমন ছড়িয়ে চলেছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

এ সময় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে তার আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে এবং উসমানী খেলাফতের শক্তিকেন্দ্রগুলি একে একে কেড়ে নিতে শুরু করে। উপরন্তু মুসলিম আদর্শের নির্জীবন ও পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী ধারণার অনুপ্রবেশের ফলে খেলাফতের অবশিষ্ট অংশটুকুও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটানো হয়। বহু বছর পর ইকবাল এ ঘটনার ইঙ্গিত দিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছিলেন–

Very early from the writings of the European scholars I had come to know that the basic scheme of western Imperialism was to dismember the unity of the Muslim world by popularizing territorial nationalism among its various components. (Maqalat-i-Iqbal. S.A.V Mueeni)

ইকবালের সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তাবাদবিরোধী মানসিকতা নির্মাণে উপরোক্ত ঘটনা প্রবাহ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং এ পর্যায়ে তিনি মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও প্যান ইসলামী ঐক্যমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে কবিতার কারুকাজ গড়ে তুলেছেন। **বাঙ্গ-ই-দারার** দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলো যেন মুসলিম ঐতিহ্যের এক স্মৃতি ভারাক্রান্ত নষ্টালজিয়া, সাথে সাথে মুসলিম পুনর্জীবনের গৌরব গীতিকাও বটে। এ প্রসঙ্গে ইকবালের **জজিরা-ই-সিসিলী** বা সিসিলী দ্বীপ কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে মুসলিম ঐতিহ্যের গৌরবময় চিত্রপটে বর্তমানের ভগ্নদশায় তাঁর বেদনা মথিত হয়ে উঠেছে। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ইকবাল নিশ্চিত হয়েছেন, জাতীয়তাবাদ–

Poisonous for the Modern Civilization of man; and it is particularly so in the case of Muslims because it is contrary to the fundamentals of their faith. (Iqbal kai Talimi Nazriat. Muhammad Ahmad Siddiqi)

এখন থেকে ইকবালের কবিতা কর্ম ইসলামের প্রাণশক্তি ধারণ করেছে এবং জাতীয়তাবাদের বৈরী প্রাণকে ক্ষত বিক্ষত করতে শুরু করেছে। তার কবিতায় উঠে এসেছে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ ও বিকৃত স্বাদেশিকতার অনিষ্টকর দিকসমূহ যা ইসলামের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যাহত করে এবং সকল সুস্থ মানসিকতার বিপর্যয় ঘটায়। বর্তমান রাজনীতির ধ্বংসলীলা, বিচ্ছিন্নতা ও রক্তপাতের মূলে রয়েছে এই মনোভাব। এই বিচ্ছিন্নতা দলীয় অনৈক্য ও আঞ্চলিকতা, ইকবালের ধারণায় যার ভাল দিকটি হলো আপাতঃ অস্থায়ী রাজনৈতিক সংহতি কিন্তু বিপরীতে রয়েছে এক অন্তহীন রাজনৈতিক বিরোধ, দুর্নীতি ও ধ্বংসমালা যা স্থায়ীরূপেই বিদ্যমান। এই রাজনৈতিক কদর্যতার নজির হিসেবে ইকবাল কখনো কখনো ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ ম্যাকিয়াভেলীর উপমা দিতেন। তিনি রাষ্ট্রকে দেবত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন এবং ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের অনুগ্রাহীতে পরিণত করেছিলেন–

সেই ফ্লোরেন্সবাসী অসত্য পূজারী
অন্ধ করেছে মানব আঁখি
তার অঞ্জন স্পর্শে

লিখেছিলো সে নতুন কানুন
শাসকদের পথ নির্দেশের জন্য
বপন করেছে সে যুদ্ধের বীজ
আমাদের দেহ মৃত্তিকায়।
তার কার্য ছিল মূর্তি নির্মাণ
আজরের মত,
বুদ্ধি তার উদ্ভাবন করেছে বহু নবরূপ।
ধর্ম তার
রাষ্ট্রকে পরিণত করেছে উপাস্যে
আর অন্যায়কে দিয়েছে ন্যায়ের রূপ।
চুম্বন করেছে সে দেবতার পদযুগ,
সত্যকে বিচার করেছে সে
লাভের মাপকাঠিতে। (রমূযে বেখূদী, অনুবাদ- সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক মতবাদসমূহ (জাতীয়তাবাদ, নাৎসীবাদ, ফ্যাসীবাদ) মানুষের সকল মূল্যবোধ ও নৈতিক বিবেচনা বর্ণ বা জাতিসমূহের অধীন করবার প্রক্রিয়াকে বলবৎ করেছে। ইকবাল তার নিন্দা করেছেন-

তারা অবলুপ্ত করেছে উখওয়াতের ভিত্তি
আর প্রতিষ্ঠা করেছে জাতীয়তা
দেশের ভিত্তিতে;
এই ধারণাকে যখন করেছে তারা
মাহফিলের দীপ
মানবজাতি বিচ্ছিন্ন হয়েছে
কলহমান দলে ঃ
মানবতা পরিণত হয়েছে রূপকথায়,
অপরিচিত হয়েছে মানুষ মানুষের কাছে ঃ
পলায়ন করেছে আত্মা দেহ থেকে,
কেবল রয়েছে তার বাইরের রূপ,
মানবতা অন্তর্হিত হয়েছে
বিশ্ব থেকে
রয়েছে কেবল স্বতন্ত্র জাতিপুঞ্জ। (রমূযে বেখুদী, অনুবাদ সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

এই জাতিপূজার পরিণাম এত ভয়াবহ ও ধ্বংসকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না-

মানবের চিন্তাধারা
চিরকাল সৃষ্টি ও পূজা করে চলেছে মূর্তির
সন্ধান করে যাচ্ছে নবনব রূপ;
আবার সে নতুন করে গড়ে তুলেছে
আজরের ঐতিহ্যকে;
সে রূপ দিয়েছে নবতর উপাস্যের;

এই দেবতার তুষ্টি হয় রক্তপাতে,
নামকরণ করেছে তার বিভিন্ন রূপে–
বর্ণ, জাতি ও দেশে।
মানব জাতি বলি হচ্ছে ছাগের মতো
এই অশুভ মূর্তির বেদীমূলে। (রমূযে বেখূদী, অনুবাদ– সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

এই বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী মতবাদের বিপরীতে ইসলাম যে মানব সমাজ নির্মাণের পরিকল্পনা দিয়েছে তার ভিত্তি ভৌগোলিক সীমারেখার উপর নির্ভরশীল নয়। তার বুনিয়াদ স্থাপিত হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের মধ্যে এবং কার্যত তার রূপায়ণ ঘটেছে তাওহীদ ভিত্তিক মানব সমাজে। ইকবাল উল্লেখ করেছেন বর্তমান কালের সর্বপ্রকার বিরোধ ও জাতীয়তাবাদী অনৈক্যের অবসান ঘটানো সম্ভব 'এই সর্বমানবিকতার প্রসারী ইসলামের কল্যাণময় রূপায়ণের মধ্যে; যার আশ্রয়ে কোন বর্ণ কিংবা জাতিপূজা স্বীকৃত নয় বরং অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি ইজ্জত করা হলো সে আদর্শের লক্ষ্য। জাতীয়তাবাদের অবসানে ইকবাল তাই সংস্থাপন করেছেন ইসলামের আন্তর্জাতিক চিত্র–

অন্তর আমাদের যুক্ত নয়
সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে,
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া;
মুসলিম তুমি–
আবদ্ধ করোনা তোমার অন্তর
কোনো দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলোনা তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে;
জয় কর অন্তর
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্মবিলুপ্ত হতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থ নিবাস। (রমূযে বেখূদী, অনুবাদ– সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

সুতরাং পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের সাথে ইসলামী উম্মার মৌলিক পার্থক্য মুসলিম সমাজকে ভিন্ন চরিত্র দিয়েছে–

তোমাদের মিল্লাত পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সাথে তুলনীয় নয়
এ একটি একক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
পাশ্চাত্যের একতার ভিত্তি হলো দেশ ও জাতি,
তোমাদের মযহাবী একতা ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিত্তিক।

মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্য তাই শ্রেণীগত আনুগত্য থেকে মুক্ত ও মানবপ্রেমের মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল; আধুনিক সভ্যতার ঝকমারি তাকে স্পর্শ করে না–

দরবেশের খোদা নয়
পূর্ব অথবা পশ্চিমের
বাসভূমি নহে আমার
দিল্লী, ইসফাহান অথবা সমরকন্দ।

প্রকাশ করি আমি সেই কথা,
যা আমার কাছে অনুভূত হয় সত্য বলে,
বিভ্রান্ত হইনা আমি আধুনিক সভ্যতা দ্বারা।
বন্ধু হয় আমার প্রতি ক্রুদ্ধ
আর 'বেগানা' হয় না-খোশ।
কারণ তীব্র হলাহলকে
আমি বলতে পারি না শর্করা।
যে মানুষ দেখে ও বোঝে সত্যকে;
তার পক্ষে মুশকিল
ভস্ম স্তূপকে অভিহিত করায়
কোহে দামাওয়ান্দ বলে। (বাল-ই-জিব্রীল, অনুবাদ- সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

কবি উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) কেমন করে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় ইসলামী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। ভৌগোলিক প্রাণ চেতনা তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি কিংবা স্বাদেশিকতাও তাঁর নতুন সমাজ নির্মাণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সুতরাং মুসলমানের নিকট জাতীয়তার কোন বিশেষ তাৎপর্য থাকতে পারে বলে মনে হয় না-

মহান নবী হিযরত করলেন জন্মভূমি থেকে,
এমনি করে তিনি উদঘাটন করলেন
মুসলিম জাতীয়তার তথ্য;
দূরদৃষ্টি তাঁর স্থাপন করলো
এক বিশ্ববিথারী সমাজ
কলেমার ভিত্তিতে;
তাঁর অফুরন্ত দানের মহিমায়
সমগ্র বিশ্ব পরিণত হলো মসজিদে
আমাদের জন্য;
বাস করো মহাসমুদ্রে
মীনের মতো,
মুক্ত হয়ে স্থান গন্ডির সীমানা থেকে;
যে কেহ মুক্ত করে আপনাকে
সীমানার কারাগার থেকে,
হয়ে ওঠে দিগন্ত প্রসারী
আকাশের ন্যায়। (রমূযে বেখুদী, অনুবাদ- সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

সুতরাং প্রকৃত মুসলমান জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে মানবপ্রেমের সিংহাসনকে সংস্থাপন করবে; পরিণতিতে জাতীয়তার সাংঘর্ষিক চিত্র বিলুপ্ত হবে দুনিয়া থেকে-

নেশনগুলির থামাও ঐ বেসুরো ঝংকার
তোমারই সঙ্গীতে আমাদের কানকে করো স্বর্গীয়
ওঠো, বাঁধো সুর ভ্রাতৃত্বের বীণায়,
ফিরে দাও পেয়ালা ভরে প্রেমের সুরা! (অনুবাদ- অমিয় চক্রবর্তী)

ইকবালের দৃষ্টিতে ইসলাম উন্মোচিত হয়েছিল এক পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে এবং এ ব্যবস্থার অনুসারীদেরকে তাই কোরআনী জীবন বিধানের আলোকে তিনি উম্মাহ বলতে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন; কারণ উম্মাহর মধ্যে বিধৃত হয়েছে এক বিশ্বাসী চেতনায় সংঘবদ্ধ জাতি। পাশ্চাত্য জাতীয়তার ভিত্তি যখন ভূখন্ডগত সীমানা কিংবা বর্ণ ও গোত্র; মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি তেমনি ধর্ম। ইকবাল মিল্লাত শব্দ ব্যবহার করেছেন দেশপ্রেম অর্থে। তাঁর কাছে স্বাদেশিকতার মূল্য ছিল। যে বিচিত্র সংস্কৃতির আচ্ছাদনে তিনি লালিত কিংবা যে আবহাওয়ায় তিনি পরিপুষ্ট সেই বিশেষ স্থানটিকে প্রীতির চোখে দেখা তাঁর নীতির স্বপক্ষ কর্ম হিসেবেই বিবেচিত হত কিন্তু স্বাদেশিকতার নামে কোন অবিবেচক রাজনৈতিক কর্মকান্ড কিংবা স্থিতিহীন মূল্যবোধ চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়া তার কাছে ইসলামের আন্তর্জাতিক রীতি-বিরুদ্ধই মনে হতো।

খ্রীস্টান জগতে উগ্র স্বাদেশিকতা কিংবা জাতীয়তাবাদ যে পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অনৈক্যের বীজ উপ্ত করেছে ইকবাল তার বিরুদ্ধে হুশিয়ার করেছেন এবং ইসলাম জগতে এ মনোভাবের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ডঃ নিকলসনের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে তিনি এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন–

Since I find that the idea of nationality based on race or territory is making headway in the world of Islam and since I fear that the Muslims, losing sight of their own ideal of a universal humanity, are being lured by the idea of a territorial nationality, I feel it is my duty as a Muslim and lover of all mankind, to remind them of their true function in the evolution of mankind. Tribal or national organizations on the lines of race or territory are only temporary phases in the unfoldment and upbringing of collective life and as such I have no quarrel with them; but I condemn them in the strongest possible terms when they are regarded as the ultimate expression of the life of mankind.

একই চিঠিতে তিনি নিজেকে বিশ্বমানবতার বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ, তিনি যে ইসলামী ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন তাকে অনেকেই উগ্র স্বধর্মপ্রীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ইকবাল মনে করতেন ইসলামী সমাজ পুনর্গঠনের যে প্রক্রিয়া তা পৃথিবী থেকে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তার বিলোপ ঘটাবে এবং ইসলাম এক সর্বমানবিক ঐশী সমতা বিধান করতে সমর্থ হবে। তিনি বুঝতে চেয়েছেন ইসলাম তার কাছে নিছক ধর্মের চেয়ে আদর্শের নমুনা হিসেবেই মঞ্জুরিত হয়েছে। কবি তাঁর জাভিদনামায় পাশ্চাত্যের এই অনৈক্যের মন্ত্র বিলোপ করে মুসলমানদেরকে এক বিশ্ব পর্যটকের আসনে সমুন্নত করেছেন–

পশ্চিমীরা ইসলামী দুনিয়ায়
জাতিপ্রেমের ঘোড়া হাঁকিয়েছে
হায়! জাতির দেবতা পৃথিবীতে এনেছে
হিংসা ও বৈরিতার রাহু
মুসলিম তুমি মুক্ত হও স্থানের আকর্ষণ থেকে
তুমি আটক নও সিরিয়া, প্যালেস্টাইন
কিংবা ইরাকে ।।

ইকবালের জীবদ্দশায় লীগ অব নেশনস আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে হঠাৎ আলোর ঝলকানীর মতো আবির্ভূত হয়েছিল। ইকবাল সুপরিজ্ঞাত ছিলেন পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ যতই একত্রিত হবার মহৎ মন্ত্রে উজ্জীবিত হোক না কেন লীগ অব নেশনসের নৈতিক ভিত্তি বলতে কিছুই নেই। সুতরাং সর্বজাতির ঐক্যের ধারণা শুধু পাশ্চাত্যের ফাঁকা বুলি মাত্র। এক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন–

বিশ্ব জাতিপুঞ্জ এখন ঝড় ও বজ্রে দুলছে
ওর কানে পৌছিয়েছে মৃত্যুর পরওয়ানা
যদিও খ্রীস্টান জগৎ অগ্রিম
উঠে পড়ে লেগেছে এরই জন্য ।। (যরবে কলীম)

ইকবাল তাঁর জীবন সায়াহ্নে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও হাদীস শাস্ত্রবিদ মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সাথে জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক রাজনৈতিক বিতর্কে লিপ্ত হন। ব্যক্তিগতভাবে মাওলানা ছিলেন কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী; তাই সঙ্কীর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে তিনি এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন– 'জাতিসমূহের ভিত্তি হলো ভূখন্ড।' তীব্র অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও ইকবাল মাওলানার এ দাবীর অসারতা প্রতিপন্ন করবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন, কারণ জাতীয়তাবাদের পক্ষালম্বন করেছেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সমকালীন ভারতীয় ইসলামের আলোকবর্তিকাকে হাতে রেখেছেন। ইকবাল মাওলানার কর্মকান্ডের তীব্র সমালোচনা করে ফার্সীতে একটি কবিতাও রচনা করেন–

মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সে
আহরণ করছে জাতীয়তার দ্রাক্ষারস
কিন্তু শীঘ্রই এটি পরিণত হবে বিষের পাত্রে
হযরতের দীপাধার কি উদঘাটন করেনি
তাঁর জীবনের মহিমা
কেউ যদি দেখতে চায় শাস্ত্রের বিধান
সে যেন মুখ ফিরায়
রসূলের কুটিরের দিকে । (আরমুগান-ই-হিজায)

মাওলানার জাতীয়তাবাদী কর্মসূচীর নিন্দা করে ইকবাল এসময় একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। এটি তাঁর অসামান্য প্রজ্ঞা ও মননশীলতার পরিচয় বহন করে। বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন, জাতীয়তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তার প্রকৃত উত্তর প্রাপ্তি একমাত্র আল্লাহর কোরআন ও রাসূলের জীবনের মধ্যেই সম্ভব হতে পারে। এখানে তিনি কোরআনী বিশ্বাসের আলোকে কওম, মিল্লাত ও উম্মাত শব্দের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন দেশপ্রেম মুসলমানের কাছে একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হলেও তার জাতীয়তা নির্মাণে দেশ, জাতি কিংবা গোত্র কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু নয়।

দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানরা একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত; একটি পর্যায়ে মিল্লাতের দেশীয় চরিত্র বর্তমান যেখানে ব্যক্তি কিংবা সমাজ তার স্থানিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হবে কিংবা একটি পারস্পরিক প্রীতি ও কল্যাণের সম্পর্কের বিকাশ ঘটাবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই ভৌগোলিক সীমানা অন্তর্হিত হবে উম্মতের মধ্যে যেখানে অন্তরের বিশ্বাসই উপজীব্য হবে জাতি গঠনের মৌলিক উপকরণ। মুসলমানের আন্তর্জাতিক চরিত্র এমনিভাবে সীমানার বন্ধন ঘুচিয়ে দেবে।

কবি এক কবিতায় উল্লেখ করেছেন–

অন্তরের ঐক্য মিল্লাতকে আনে অস্তিত্বে;
এই সিনা প্রদীপ্ত সেই একক অগ্নিশিখায়;
জাতির থাকবে ধারণার ঐক্য,
একই উদ্দেশ্যের প্রবাহ থাকবে তার অন্তরে;
মনোভাবের ঐক্য
অনুপ্রাণিত করবে তার সত্তাকে;
তার ভালো মন্দের থাকবে একই নিদর্শন;
কি নির্বুদ্ধিতা দেশের সাথে মিল্লাতকে
অভিন্ন করা।
কি বোকামী আব, হাওয়া, আর কর্দমের
পূজা?
বংশ গৌরবে স্ফীত হওয়া বোকামী,
কারণ তার আধিপত্য শুধু দেহের উপর
আর দেহ হচ্ছে নশ্বর।
মুসলিম মিল্লাতের আছে সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তি
যে ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে
আমাদের অন্তরের তীর্থভূমিতে। (রমূযে বেখূদী, অনুবাদ– সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

ইকবাল ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক; জাতীয়তাবাদের মানবতা সংহারী চিত্র তাঁকে পীড়িত করেছিল। দেশ, কাল ও পাত্রের বিভাজন মুছে দিয়ে তিনি সার্বজনীন মানবতাবাদী ইসলামের বিভূতি অঙ্গে মেখেছিলেন। তার এ মানবিক বন্দরে নোঙ্গর করেছিল দুনিয়ার সকল জাহাজ– যেখানে ভীড় করেছিল ইসপাহানী নীলা, আরবীয় চিন্তার মণি, ভারতীয় তাম্রপত্র আর পশ্চিমের আলো ঝলোমল কারিগরি। নেশনের চেয়ে যেখানে বড় হয়ে প্রতিভাত হয়েছে মানবতা; গোত্রীয় স্বার্থের চেয়ে মানবপ্রেম।

ইকবাল ও কমিউনিজম

ইকবাল কাব্যের প্রত্যয়শীলতা ও মধুকরী দীপ্তি আমাদের চেতনার বহ্নিকে প্রজ্বলিত করেছে। বিংশ শতাব্দীর কদর্যতার অন্ধকারে ঢাকা বিকৃত সভ্যতার চোরাগলিতে তাঁর বিশ্বপর্যটক মন আলো ফেলে আমাদের উজ্জ্বল পথের ইশারা দিয়েছে। ইকবালের কাব্য এক বাহির-প্রবাসী দূরচারী সমুদ্রের কল্লোলে মুখরিত যা সর্বমানবিকতার তীর্থভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর কবিতার রাজপ্রাসাদ বহুবর্ণ আলোকচ্ছটায় দীপ্ত; হীরকোজ্জ্বল চিত্রকল্পে সমৃদ্ধ।

ইকবালের দৃষ্টিতে উন্মোচিত হয়েছে কমিউনিজমের আত্মগত চিত্রাবলী যা পৃথিবীর আধ্যাত্মিক মানব সমাজের জন্য নিরাপদ বিবেচিত হয়নি। কমিউনিজমের মানবিক প্রকল্প ইকবালের সংবেদনশীল মনে সাময়িক ক্রিয়া করলেও অধ্যাত্মজীবীর প্রাণস্পর্শ বঞ্চিত এ রুক্ষ মরুচারী আদর্শের আপাতঃ বৈভবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ইকবালের চেতনায় ক্রিয়া করেছে ইসলামের নৈতিক বিবেচনাসমূহ এবং তার প্রতীতি জন্মেছে এ প্রকল্প যদি আধুনিক মানুষের মর্মবেদনার প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা যায় তবে তা কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে। তিনি টের পেয়েছিলেন কমিউনিজমের বহিরংগের জেল্লা এবং এর অন্তঃসম্পদের সীমাবদ্ধতা। ইকবালের গোচরীভূত ছিল ইউরোপের পুঁজিবাদী পাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কমিউনিজম নামীয় দানবের শৃঙ্খলমুক্তি ঘটেছে এবং ধর্মহীনতার নৈরাশ্য এ অবচেতনার শরীরকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

আধুনিককালে কমিউনিজম এক বিপ্লবী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনায় যে জুলুম ও বেইনসাফীর পাহাড় উদগত হয়েছে এবং সাধারণ মানুষের রক্ত ও ঘামে এক শ্রেণীর মানুষের হাতে জমে উঠেছে বিত্তের অথৈ মেলা, তার বিপরীতে কমিউনিজম যে শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের পোষকতা করেছে তা দেশে দেশে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর কমিউনিজম বিশ্ব রাজনীতির এক নবতর শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে আতংক ও বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইকবালের চিন্তার মৌল কেন্দ্রটি প্রসারিত হয়েছিল মানব সমস্যার বিচিত্র ও বহুগামী পথ ধরে এবং একই কারণে বিশ্বদর্শনের পল্লবিত প্রশাখাগুলি তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন নিখুঁতভাবে। সমকালে কমিউনিজম যেহেতু মানব সমস্যার চিরায়ত ও আবহমান দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিল, তাই অতি অনিবার্যভাবেই ইকবাল এর গভীরে প্রবেশ করেছিলেন এবং স্বীয় অন্তর্দৃষ্টির পুষ্পিত আলোতে কমিউনিজমের কারুকাজ ও শিল্পের বিন্যাস করেছিলেন।

ইকবাল তাঁর জীবদ্দশায় কমিউনিজম, কার্লমার্ক্স, লেনিন এবং সর্বোপরি পুঁজিবাদের দুর্গন্ধবিস্তারী দিকটির প্রতি ইংগিত করে বিস্তর কবিতা লিখেছেন এবং বিভিন্ন পটভূমিতে বিবৃতি ও নিবন্ধ রচনা করে তাঁর বিশিষ্ট চেতনার দীপমালাকে 'সজ্জিত করেছেন'। কমিউনিজমের মানবিক চেতনার সম্মোহনী চিত্রটি তাঁকে বারংবার আকৃষ্ট করলেও তাঁর অন্তর্গত বোধ তাঁকে বারংবার বিপরীতমুখী করেছে। কারণ, কমিউনিজমের সাথে ইসলামের কিছু আপাতঃ সাদৃশ্য থাকলেও মৌলিক তফাৎ রয়েছে বিস্তর। কমিউনিজমের নাস্তির ধারণা ইসলাম প্রত্যাখ্যান

করেছে এবং এর নৈতিকতা বর্জিত বস্তুগত চেতনার উপযোগিতাকে ইসলাম স্বীকৃতি দেয়নি। আবদুস সালাম নদভী ইকবালের এই বিশিষ্ট কমিউনিজম ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছেন–

Comunism is an interesting aspect of Iqbal's poetry. In Bal-e-Jibrael and other works he has written on this doctrine with such enthusiasm and fervour that he can easily be declared a socialist; but in spite of this he differs strongly from source of the fundamentals of this movement.

(Iqbal-e-Kamel, Abdul Salam Nadvi)

ইকবালের চিন্তার দীপ্তি প্রখরতর হয়েছিল ইসলামের উজ্জ্বল আলোকে; তাই স্বভাবতই তাঁর কমিউনিজম ভাবনার প্রসারতা ও ব্যাপ্তিকে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে ইসলাম ও কমিউনিজমের মৌলিক পার্থক্যটির প্রতি আমাদের নজর ফেরাতে হবে।

সূচনাতেই উল্লেখিত হয়েছে, কমিউনিজম তার মানবিক কার্যক্রমের দ্বারা সর্বত্র নজর কেড়েছিল এবং সামাজিক শোষণ ও অর্থনৈতিক অসাম্যাবস্থার বিরুদ্ধে তার আপাতঃ সম্মোহনী বিপ্লবী প্রচারণা বিশ্বের নিগৃহীত মানুষের মনে আবেদন সৃষ্টি করেছিল।

উনিশ শতকে ইহুদী পন্ডিত কার্লমার্কস ও তার বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের যৌথ প্রচেষ্টায় কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয় এবং এটি প্রকাশের সংগে সংগে বিশ্বের বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিক মহলে চিন্তার নয়া দিগন্তের সূচনা হয়।

কমিউনিজমের মৌলিক চেতনাটি সম্প্রসারিত হয়েছিল এভাবে ঃ সকল সম্পত্তির ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার বিলোপ করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োগ করে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্যের অবসান এবং সম্পদের সমবন্টনের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণ ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। সকলের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে তা পরিপূরণ করা এবং শ্রমের সমবিভাজনের মাধ্যমে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উত্তরণ ঘটানো।

কমিউনিজমের এ ধারণা মূলত মার্কস ও এঙ্গেলসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত। তাদের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা একটি ক্রমাগত শ্রেণী-সংঘাত এবং জালিম ও মজলুমের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পরিণতি। এ দ্বন্দ্ব নিশ্চিতভাবেই অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত। আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই কমিউনিজম একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসেবে বিকাশ লাভ করলেও পরবর্তীকালে মার্কস এর একটি দার্শনিক রূপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেন এবং একই প্রেক্ষাপটে তিনি সমকালের প্রতিষ্ঠিত নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, সামাজিক সংস্কার সর্বোপরি মানুষের ধর্ম ও জীবন বিশ্বাসের যে চিরায়ত ফলগুধারা তার বুকে ছুরি চালিয়ে দেন। মার্কস মনে করতেন ধর্ম হলো সকল সামাজিক অনগ্রসরতার কার্যকারণ। দেশে দেশে যে শোষণ ও নির্যাতন বর্তমান তা ধর্মের ছদ্মাবরণে চলে আসছে এবং ধর্মকে নির্যাতক তার জুলুমের হাতিয়ারে পরিণত করেছে। মার্কস আরো মনে করতেন, ধর্ম হলো জনগণের আফিম–

Religion is the sigh of the oppressed creature, the sentiment of a heartless world, the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. (Selected Writings in Sociology and Social Philosophy, Karl Marx)

সুতরাং ধর্মের কোন উপযোগিতাকে কমিউনিজম স্বীকৃতি দেয়নি এবং এর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 'মূল্যমানকেও' সে প্রত্যাখ্যান করেছে। মার্কসের ধারণা ছিল, মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন

পরিপূরণের মধ্যে তার সকল ইচ্ছা ও অনুভবের কার্যকরী বিকাশ ঘটবে। একই কারণে তিনি ধর্মের বিনাশ সাধনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

The abolition of the religion, as the illusory happiness of men is a demand for their real happiness.

(selected writings in sociology and social philosophy. Karl Marx)

অতি অনিবার্যভাবেই ইকবালের পক্ষে তাই ধর্মহীনতার এ বিপজ্জনক দানবকে অভিনন্দন জানানো সম্ভব হয়নি। কারণ, ধর্ম এ যাবৎকালের মানব সভ্যতার বিকাশে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং মানব প্রগতি ও সমৃদ্ধির মূলে ধর্মের রয়েছে প্রভূত অবদান। সাম্প্রতিককালে কমিউনিজমের এ ধর্মহীন আয়োজন তাই ইকবাল অনাকাঙ্ক্ষিত হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

ইসলামের যেমন রয়েছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচী, তেমনি রয়েছে এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনাসমূহ। শরীয়তের মৌলিক নীতিমালার আলোকে যে ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা নির্মাণ করা হয়েছে। ইকবাল মনে করতেন এই সামাজিক ও নৈতিক পরিবেশেই অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং মূল্যবোধের জাগরণও সেখানে সম্ভব।

মূল্যবোধের বিপর্যয় ও নৈতিক বন্ধ্যাত্ব মানুষের সীমাহীন লালসার অংকুরোদগমের জন্য দায়ী। সমভাবে ন্যায়-নীতির বিলোপ সামাজিক নৈরাজ্যের বিকাশের পথকে অনুকূল করে। সাম্যবাদী ব্যবস্থায় শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার দাবী নৈতিকতার জরাগ্রস্ততার কারণে তাই অর্থহীন বিবেচিত হয়।

ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রেই সাম্যের জাগরণ ঘটে। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহর, স্বভাবতঃই এই সম্পদ ব্যবহৃত হবে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণে। ইসলামী রাষ্ট্রে তাই সকল সম্পদ নিয়োজিত হয় প্রতিটি নাগরিকের প্রয়োজনে এবং সকল সুযোগ-সুবিধার দুয়ারও সমভাবে সকল নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত থাকে। এখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব সকল নাগরিকের মৌলিক চাহিদার প্রতি নজর দেয়া এবং যোগ্যতা অনুসারে সকলের কাজের দায়িত্ব নির্ধারণ করা।

ইসলামী অর্থনীতির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো যাকাতের কুরআনী বিধান। ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য দূরীকরণে এবং সামাজিক অসন্তোষ বিলোপে জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী রাষ্ট্রে সম্পদের অবাঞ্ছিত সঞ্চয়কে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং অন্যায়ভাবে সম্পদের পাহাড় গড়ার বিরুদ্ধে হুশিয়ারীও উচ্চারিত হয়েছে।

ইসলাম ও কমিউনিজমের এ চিত্র পাশাপাশি রাখলে একটি সাদৃশ্য নির্মাণ করা হয়ত যায়, কিন্তু এর বৈসাদৃশ্যই বেশী প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

কমিউনিজমে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন পরিপূরণের মধ্যে সকল কার্যকারণ নিহিত। কারণ তাদের ধারণা, ঔদরিক সমস্যা সমাধানেই মানুষের সকল আকাঙ্ক্ষার নির্বাণ লাভ ঘটতে পারে। উপরন্তু কমিউনিজমে ধর্মের কোন অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। যেমন নয় বিশ্বস্রষ্টার। মানব সভ্যতা একটি ক্রমাগত বৈরীতা ও পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছে– এ হলো কমিউনিজমের মৌল চেতনার অঙ্গীকার।

কিন্তু ইসলাম একটি ধর্ম যা জীবন ব্যবস্থার আকৃতিতে মানুষের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

ইসলামী আদর্শে মুসলমানদের সকল বস্তুগত উপযোগিতা আল্লাহর ইচ্ছাতে সমর্পিত। এমনকি ইসলামী রাষ্ট্র যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের অঙ্গীকারাবদ্ধ– তাও এই খোদায়ী ইচ্ছার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়োজিত। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতা একটি ক্রমসম্প্রসারণশীল পল্লবিত তরু যা মানুষের পারস্পরিক মৈত্রী ও কল্যাণময়তার প্রস্রবণে নিষিক্ত।

এখানে উল্লেখ্য, ইসলামী আদর্শের মৌল চেতনাটি আহরিত হয়েছে ঐশী প্রক্রিয়ায়। পক্ষান্তরে কমিউনিজম হলো মানব মস্তিষ্কের আবিষ্কার।

ইকবালের কমিউনিজম নীরিক্ষণ তাঁর চিন্তা ও দর্শনের বিরাট প্রসারতা ও ব্যাপ্তির মধ্যে একটি জংলী ফুলের সৌরভ নির্গমনের মতো। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় পুঁজিবাদের মানবতা বিধ্বংসী চিত্র দেখেছেন। লাগামহীন পুঁজিবাদ জন্ম দিয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও আধিপত্যবাদ এবং পরিণতিতে ঘাতক বিশ্বযুদ্ধ। পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী অর্থনীতি যে জুলুম, শোষণ ও বেইনসাফীর কদর্যতা পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে কমিউনিজমের স্তুতি রচনা করেছেন কিন্তু তার অর্থ এই নয়, কমিউনিজমকে তিনি মানব সমস্যা সমাধানের মোক্ষম উপায় মনে করতেন। পুঁজিবাদী কৃপাণে বিক্ষত খেটে খাওয়া মানুষের জন্য তার দরদ ছিল অপরিসীম এবং সংগত কারণে তিনি শ্রমিক ও পুঁজিপতির বৈষম্যপূর্ণ সম্পর্কের তীব্র সমালোচনা করেছেন। ইকবালের বিভিন্ন কবিতায় শ্রমিক শ্রেণীর এ দুর্দৈব ও জিল্লতির চিত্র মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবি তার সুবিখ্যাত 'খিযর-ই-রাহ' কবিতায় হযরত খিজির (আঃ)-এর মুখ দিয়ে শ্রমিক ও মজুরদের বেদনার আখ্যায়িকা নির্মাণ করেছেন। কবি আশা করেছেন, পুঁজিপতির এ কপট চালচিত্র বেশী দিন স্থায়ী হবার নয়। শীঘ্রই শ্রমিক জনতা তাদের অবস্থানকে সংহত করতে পারবে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে তাদের অমানিশার অবসানে মুক্তির রক্তিম সূর্যোদয় প্রতিভাত হবে–

> শ্রমিকে শোনাও তুমি, প্রাণদ এ বাণীটি আমার
> খিজিরের বাণী নয়,– বাণী এযে জগৎ সত্তার
> কপট এ পুঁজিপতি করিয়াছে নিঃশেষ তোমারে,
> শত শত বর্ষ ধরে ভাগ্য তুমি সঁপেছ যাহারে।
> তোমারি সম্পদ তুমি এতদিন করিয়া যতন
> ধনীদের হাত হতে লভিয়াছ ভিক্ষার মতন।
>
> ....
>
> কপট পাশার চালে পুঁজিপতি জিতিয়াছে বাজি,
> সারল্য করেছে তোমা, হে মজুর সর্বস্বান্ত আজি।
> দাঁড়াও, জীবন বীণা সুরে আজ নতুন ব্যঞ্জনা,
> হয়েছে পশ্চিমে পুবে তোমারই যুগের সূচনা। (বাঙ্গ-ই-দারা, অনুবাদ– মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

আর এক কবিতায় কবি উল্লেখ করেছেন ঃ গরীবের রক্ত শোষণ করে চলেছে ধনীরা। ধনীদের শরীর আবৃত হয় মূল্যবান পরিচ্ছদে পক্ষান্তরে দিন মজুরের গায় শোভা পায় শতচ্ছিন্ন জীর্ণ পোশাক–

> বিত্তবানেরা রচেছে নতুন পৃথিবী
> ওদের দেহ তনিমা গুপ্ত হয়ে আছে
> রেশমী পোশাকের জেল্লায়

আর দিনমজুরের হাড্ডিসার জিরজিরে দেহ
মুখ ব্যাদান করে হাসছে
কাপড়ের স্বল্পতায়
বিত্তবানের বিভব সৌরভ ছুটিয়েছে
গরীবের রক্ত ও ঘামে। (পায়াম-ই-মাশরিক)

ইকবালের ধারণা ছিল শ্রমিক, কৃষক, মজুরেরাই সম্পদের প্রকৃত স্রষ্টা। একজন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে তিনি পুঁজিবাদকে স্বাগত জানাতে পারেননি। কারণ, ইসলামের মৌলিক নীতিভঙ্গী পুঁজিবাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুষ্টক্ষতের পরিপন্থী।

সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি তার মমতা ছিল অপরিসীম। শ্রমিকদের মতই তিনি দেখেছেন কৃষকদের উপরে সামন্তবাদ কি মর্মান্তিকভাবে দুঃখ ও লাঞ্ছনার উর্মিমালাকে সজ্জিত করেছে। 'পাঞ্জাবের কৃষকদের প্রতি' কবিতায় তার অনুরণন কেমন শোকার্ত ছন্দে বেজে উঠেছে। এমনি বেদনার আবহের মধ্যেও কবি স্বপ্ন দেখেছেন নতুন দিনের রাঙা প্রভাতের–

কৃষাণ মজুর ডুবে আছে
অন্ধকার পল্লীতে
যুগের বেদনা ঝড় তোলে
ওদের অন্তরে
জীবনের উত্তাপ নিভে গেছে.......
ঐ দেখ প্রভাতের লালিমা স্বপ্ন ছড়ায়
তোমাদের হাত হোক এবার
জেগে ওঠার হাতিয়ার। (বাল-ই-জিব্রীল)

শ্রমিক, কৃষক, মজুরদের প্রতি তার এই দরদ তাকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ মুখর করে তুলেছে, কারণ তারাই মানবতার এই লাঞ্ছনার জন্য দায়ী। লেনিনের উপর লেখা তাঁর অদ্ভূত সুন্দর কবিতা (খোদার সম্মুখে লেনিন) তাঁর এই মানব-প্রীতিরই উচ্চারণ, কমিউনিজম ভক্তির নয়। মৃত্যুর পর লেনিন নিজেকে দেখতে পায় বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থিত সেই খোদার মুখোমুখী যাকে সে এতকাল মনে করে এসেছে পুরোহিতদের উদ্ভাবন। কিন্তু সে ভয় পায়না বা দমেও যায় না। সে তার আপন বক্তব্য বলে যায়। খোদা আছে ঠিক কিন্তু সে কাদের খোদা? ক্ষুধিত কৃষকদের, বিত্তহীন মজুরদের? তিনি কি প্রাচ্যের সেই লোকদের খোদা যারা শাদা মানুষদের পূজা করে? অথবা কি সেই পাশ্চাত্যের লোকদের যারা সর্বশক্তিমান ডলারের পূজারী–

প্রভু বলি দাবী কর, তুমি প্রভু কোন মানবের?
যাহারা নির্বিঘ্নে আছে বুকে তব ঐ শিবিরের?
প্রাচ্যের বিধাতা? সেতো পাশ্চাত্যের শ্বেতাঙ্গ জাতিরা,
পাশ্চাত্যের পূজা নেয় মুদ্রারূপী সুবর্ণ মূর্তিরা।
....
তুমি সর্বশক্তিমান বিচারক, ভুবনে তোমার,
কাটিতে চাহেনা দিন, শ্রমিকের ব্যথা তিক্ততার
কখন ডুবিবে এই পুঁজিবাদ স্বর্ণ তরী খানি,
ফরিয়াদ তুলে তার আজ প্রভু ত্রিভুবন বাণী। (বাল-ই-জিব্রীল, অনুবাদ– মনির উদ্দীন ইউসুফ)

ফেরেশতারা পরলোকগত এই কমিউনিস্টের স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হয় এবং তারা গ্যাটের ফাউস্টের দেবদূতের মতো আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকে, যদিও ঠিক সেই সুরে নয়–

বুদ্ধিবৃত্তি আজও বল্গাহীন। প্রেম শৃঙ্খল হারা।
হে স্বর্গীয় শিল্পী তোমার চিত্র আজও অসম্পূর্ণ
মানুষকে মারতে ওৎ পেতে আছে ছন্নছাড়া, শোষক
আর এই ধর্ম যাজকের দল।
তোমার বিশ্বে পুরনো ব্যবস্থা আজও চলছেই। (বাল-ই-জিব্রীল, অনুবাদ– সুলতানা ইব্রাহীম)

সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালা লেনিনের এই সমালোচনা মেনে নিলেন। তিনি ফেরেশতাদের আদেশ দিলেন, যে শস্যক্ষেত্র কৃষাণ-মজুরের আহার যোগায়না তা জ্বালিয়ে দিতে এবং যাজক ও মোল্লাতন্ত্রের অবসান ঘটাতে। তিনি চড়ুইকে দিলেন বাজের সাথে লড়াই করার শক্তি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার ভঙ্গুর সৌধকে গুঁড়িয়ে দেবার কথাও বললেন–

ওঠো দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।
করো ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন
বাজের সম্মুখে টেকের ভয় ভাঙিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন দুঃখীর রাজ
পাপের চিহ্ন মুছে দাও ধরা রাঙিয়ে দাও।
কিষান মজুর পায়না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও...... (বাল-ই-জিব্রীল, অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

ইকবাল পুরোপুরি সচেতন ছিলেন পুঁজিবাদ মানবতার জন্য কি বিপর্যয় ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়ে চলেছে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন–

পুঁজিবাদীর দেহটা প্রজা হিতৈষী
বাদশাহর মতো
কিন্তু অন্তরে কুসিদজীবীর অন্ধকার
হক কথা বলার ভনিতা তার সর্বত্র
কিন্তু হৃদয় পূর্ণ হয়ে আছে মিথ্যার কালিতে। (পস চেহ বায়াদ করদ)

কিন্তু তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, মতবাদ বিশ্বে হানাহানি ও মানবিক সংকটের বিকাশের জন্য দায়ী এবং সমাজে শোষণ, জুলুম, বেইনসাফী ও নৈতিক স্খলনের কার্যকরণ তার বিনাশ ও পতন অবশ্যম্ভাবী। ইকবাল তাই কামনা করেছেন মুসলমানরা খেটে খাওয়া মানুষের কল্যাণে সর্বতোভাবে অংশগ্রহণ করবে। তিনি তাঁর সাকীনামা কবিতায় উল্লেখ করেছেন, পুরনো দিনের সামন্তবাদী রাজনীতির অবসান ঘটবে, পৃথিবী এখন জমিদার ও রাজন্যবর্গের জুলুমে ভারাক্রান্ত। পুঁজিবাদী নৈরাজ্যের অবসান তাই নিশ্চিত হয়ে উঠেছে–

কালের পুরনো চাল বাতিল হয়েছে,
নূতন রাগিনী বাজে; সে বীণা ভেঙ্গেছে।
পাশ্চাত্য চাতুরী যত হয়েছে প্রকাশ,

সে কাঁচ বিক্রেতাদল আজি হতাশ্বাস।
পুরাতন রাজনীতি ভেঙ্গে চুরমার,
দুনিয়া চাহেনা রাজা মহারাজা আর।
পুঁজিবাদ চলে গেল চিরকাল তরে
খেলা শেষে বাজিকর ফিরে গেছে ঘরে।
চীনের গভীর ঘুম ভাঙ্গিতেছে আজি,
হিমালয়ে জাগিতেছে প্রস্রবণ রাজি।
সিনাই ও ফারানের অন্তর চিরিয়া
আবার জাগিবে জ্যোতিঃ মর্ম উজলিয়া। (বাল-ই-জিব্রীল, অনুবাদ- মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

ইকবালের জীবদ্দশায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। দার্শনিক কবিও এই মতবাদের মানবিক প্রকল্প দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ইকবাল এরই প্রেক্ষাপটে কমিউনিজমের প্রবক্তা মার্কসের ব্যক্তিত্ব ও বাণীকে তার কবিতায় বিধৃত করেছেন অনিন্দ্যসুন্দর কুশলতার সাথে।

কমিউনিজমের নেতিবাচক দিক ও মার্কসের বস্তুবাদী নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে তিনি সর্বতোভাবে সোচ্চার ছিলেন এবং তাঁর কবিতায় ও অন্যান্য রচনায় তার স্বাক্ষর রয়েছে। কিন্তু প্রথমত আমরা ইকবালের দৃষ্টিতে বিশ্বজ্ঞানের আঁধারে মার্কসীয় চিন্তা যে আলোড়নের ঢেউ তুলেছিল তা বিবেচনায় আনব। ইকবাল মনে করতেন, মার্কসীয় চিন্তা ও দর্শন পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যে এক চরম আঘাত হিসেবে এসেছে। ইকবাল তাঁর 'ইবলিস কি মজলিস-ই-শূরার কবিতায় মার্কসকে চিত্রিত করেছেন এক পথপ্রদর্শক কালিম হিসেবে অথচ তার হাতে নেই আলো; তিনি ক্রুশ নেই এমন যীশুখ্রীষ্ট, ধর্মগুরু তিনি নন কিন্তু তার আছে গ্রন্থ। তারই আহবানে ক্রীতদাসেরা পরাজিত করেছে প্রভুর দলকে এবং পূর্ব ও পশ্চিমে নব চেতনার আলো জ্বলে উঠেছে–

জ্যোতিহীন এক মুসা সে যেন গো, ক্রুশহীন যেন ঈসা সে নবী
রসুল যদিও নাই, তবু তার কেতাবে যে আছে প্রতীতি ছবি।
কি বলিব সেই অবিশ্বাসীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি যেন সে তীর
পূর্বে পশ্চিমে আনিয়াছে আজ কেয়ামত এক চিরস্থির।
মানব স্বভাবে আর কিবা তুমি গভীর ওলট পালট চাও
গোলামেরা মিলি কাটিয়া দিতেছে মনিবের তাঁবু তন্ত্রী তাও।
(আরমুগান-ই-হিজায, অনুবাদ- মনির উদ্দীন ইউসুফ)

'বলশেভিক রুশ' কবিতায় কবি বস্তুবাদী রাশিয়াকেও নবযুগের প্রবর্তকদের মধ্যে ভেবেছেন। কারণ মার্কসবাদী দর্শন ক্রুশবাদী ইউরোপের যাজকতন্ত্রের অনাচারের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিয়েছে–

বিশ্ব প্রভু নিয়ন্ত্রিত নিয়তির অবাক চলন
জগতের স্বভাবের একি মহা আবর্তন।
ক্রুশবাদী ইউরোপের তরে ইহা নব উপহার,
শূলীকে ভাবিত যারা মানুষের পাপের উদ্ধার।
বস্তুবাদী রুশ পরে ঐশীবাণী হয়েছে নাজেল
লাৎ ও মনাৎ যত গীর্জার আজি ভেঙ্গে ফেল। (যরবে কলীম, অনুবাদ- মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

ইকবালের এ ধারণা একান্ত ব্যক্তিগত হলেও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে মানবতার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক লাঞ্ছনার জন্য দায়ী তা তার গভীর প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তাঁর এ

পুঁজিবাদ বিরোধিতা কমিউনিজম-প্রীতির জন্য নয়, কোরআনী জীবন দর্শনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগই তাঁকে এই মানবতার শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার উত্তোলনে উৎসাহিত করেছিল। ইসলাম সর্বপ্রকার বেইনসাফীর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। বিশ্ব নিখিলের রাজত্ব আল্লাহর। তাই এখানে তারই ইচ্ছার বাস্তবায়নের মাধ্যমে এক ঐশী সমতার বিধান হবে- এটাই স্বাভাবিক। ইকবাল কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, সম্পদ সীমিত হাতে গচ্ছিত হওয়া খোদায়ী ইচ্ছার পরিপন্থী। সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষের ভাগ্যোন্নয়নই হলো কোরআনের বাণী। ইকবাল বলেন-

কুরআন কি জান? পুঁজিবাদীর মৃত্যু পরোয়ানা
এই কুরআন।
যার কিছু নেই সেই কৃষক শ্রমিকের এ বন্ধু,
সুদ দীলকে কালো করে। টাকা জমানোর
কোন ফায়দা নেই,
তুমি যা ভালোবাস তার থেকে দান না করলে
কোন সওয়াব পাবেনা,
জমি থেকে রুজি সংগ্রহ কর
কিন্তু এই জমি খোদার [অনুবাদ- হাসান জামান]

মুসলমান হলো খোদায়ী রাজত্বের জিম্মাদার। সম্পদের মালিকানা হলো আল্লাহর হাতে। সুতরাং একজন মুসলমান তার ভাগ্যোন্নয়নের জন্য পরিশ্রম করতে পারে, অর্থ উপার্জন করে তার সৌভাগ্য ফিরিয়ে আনতে পারে কিন্তু প্রয়োজনের যা অতিরিক্ত তা অপরের জন্য ছেড়ে দিতে হবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে নিখিল পৃথিবীর মালিকানা যেহেতু খোদার এবং তাঁর সকল সৃষ্টি সমান। স্বাভাবিকভাবেই সম্পদের অসম বন্টন এবং গুটি কয়েক মানুষের হাতে সম্পদের গচ্ছিতকরণ হলো মানবতার জন্য বেইনসাফীর নামান্তর। ইকবাল তাঁর পস্ চেহ বায়াদ করদে পুঁজিবাদীর রক্ত মোক্ষণের বেদনার্ত চিত্র তুলে ধরেছেন এবং কি করে পুঁজিপতি দিনমজুরের ন্যায্য পাওনা আত্মসাৎ করে তারই নমুনা পেশ করেছেন-

দিনমজুরের রুটি ও রুজিতে
পুঁজিপতির জেল্লা বাড়ে
নিজে হারিয়ে যায় দুর্দৈব ও
অন্ধকার নগরীতে
সে তৈরী করে অন্যের প্রাসাদ
কিন্তু নিজের জন্য নেই মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই।

তাই পুঁজিবাদ হলো একজনের গলায় ছুরি চালিয়ে অন্যজনের উপরে ওঠার সিঁড়ি-

পুঁজিবাদ মানবতাকে দিয়েছে একটি জিনিস
তা হলো একজনের বুকে খঞ্জর চালিয়ে
অন্যজনের বিত্তবান হবার শিক্ষা।
(পায়াম-ই-মাশরিক)

সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মস্বরূপে যে পুঁজিবাদ অস্তিত্বলাভ করেছে তার নীতি হলো দীন-

মজুরের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দেয়া –

পাশ্চাত্য সভ্যতার বুক জুড়ে পুঁজিবাদের ঘা
পুঁজিবাদ কি জান? পুঁজিবাদ হলো
দীন মজুরের রক্তমোক্ষণকারী
এ ঘা যদি না শুকায়
বুদ্ধিবৃত্তি হবে বল্গাহারা
সভ্যতা ও ধর্মের সুবেশ যাবে হারিয়ে। (পস্ চেহ বায়াদ করদ্)

এ কবিতা তাঁর আবেগ ও অনুভূতির প্রবল হৃদয়াবেগকেই ধারণ করেনি, তাঁর বিশ্বাসের প্রাচুর্যকেও সংহতি দিয়েছে। তিনি মনে করতেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার এই পুঁজিবাদী অনাচার মানবতার হৃদয়ে অনবরত রক্তক্ষরণ করে চলেছে এশিয়ার নবজাগ্রত স্বাধীনতাকামী, জাতিসমূহের জন্য তাই এ ব্যবস্থা মোটেই উপযোগী নয়। ১৯৩২ সালের ২১ মে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্যে ইকবালের এ চিন্তারই অনুরণন ঘটেছে–
This is the inevitable outcome of a wholly political civilization which has looked upon man as a thing to be exploited and not as a presonality to be developed and enlarged by purely cultural forces. The people of Asia are bound to rise against the acquisitive economy which the west has developed and imposed on the nations of the East. Asia can not comprehend modern western Capitalism with its undisciplined individualism. The faith which you represent recoginzes the worth of the individual and disciplines him to give away his all to the service of God and man.

পুঁজিবাদের এই মানবতা বিধ্বংসী চিত্রাবলী যেমন ইকবালকে পীড়া দিয়েছে, তেমনি কমিউনিজমের খোদাদ্রোহী নৈতিকতা ও মূল্যবোধবর্জিত কার্যকরণ তাঁকে এর প্রতিও অনাগ্রহী করে তুলেছে।

একজন পরিপূর্ণ মুসলমান হিসেবে তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহর অস্তিত্ব এবং তাঁর সর্বশক্তিমানত্বের ধারণায়। রাসূল (সঃ)-এর বিপ্লবী বাণী ও জীবনব্যাপী সাধনার ধারাকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধকার বিদূরণে তিনি মোক্ষম উপায় মনে করতেন।

ইকবাল তাঁর জাভিদ নামায় এশিয়ার সূর্যপুরুষ জামালুদ্দীন আফগানীর মাধ্যমে কমিউনিস্ট রাশিয়ার নেতৃবৃন্দের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি সে দেশের নেতৃবৃন্দকে কোরআনের বিশ্বজনীন বাণীর প্রতি দৃকপাত করতে অনুরোধ করেছেন এবং রাসূল (সঃ)-এর মহামানবিক জীবনের থেকে শিক্ষা গ্রহণের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাম্যবাদীরা যদি ইসলামের অন্তরংগ ভুবন আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের সাধনা ও অবদানের কোনই মূল্য থাকবেনা। তিনি সোভিয়েট দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বেচ্ছাচারী চরিত্রকেও চিহ্নিত করেছেন একই সাথে–

একবার তাকিয়ে দেখ সবুজ বর্ণাবলীর দিকে
কোরআনের মহাজীবন জ্যোৎস্না হয়ে
খেলা করে যেখানে
রসূলের পথ চলে যায় যে

খেজুর ও উটের নগরীতে
ইসলামের আলো থেকে
যদি আহরণ না করতে পারো
জীবনের রোশনাই–
তোমাদের সাধনা
তোমাদের পথচলা
একদিন হবে শুধু স্মৃতি
কোরআনের উদ্দেশ্য হলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র
মুসলমানের কানুন হলো গৌরব মহিমায় দীপ্ত
তোমরা রাজতন্ত্রের নিশান পুড়িয়ে দিয়েছ ঠিক
কিন্তু রাজার আসনটি রেখেছ একই রকম। (জাভিদ নামা)

ইকবালের কমিউনিজম প্রীতিহীনতার আর একটি কারণ হলো, এ ব্যবস্থা মানবজীবনের একটি বিশেষ প্রয়োজনকেই অন্যান্য প্রয়োজনের উপরে আধিপত্য দিয়ে জীবনের নেতিবাচক মূল্যায়নের সূচনা করেছে। তিনি দেখেছেন কমিউনিজম যাজকতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের অবসান ঘটালেও ধর্মের মহাজৈবনিক ও শাশ্বত লক্ষ্যকে খতম করবার কথা বলেছে। ইকবাল বিশ্বাস করতেন ধর্মের বিলোপ ঘটলে জীবনের মহৎ মূল্যমানসমূহও অন্তর্নিহিত হয়।

ইকবাল মনে করতেন, মানুষের মানবিক চাহিদা পূরণের সাথে ইসলাম জাগতিক প্রয়োজন পরিপূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে কিন্তু কমিউনিজম জীবনের এই দ্বৈত সত্তার সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। ইকবাল তার পস চেহ বায়াদ করদে কমিউনিজমের এই অন্তর্গত চিত্র উপস্থাপন করেছেন–

তুমি রাজতন্ত্রের অস্থিমজ্জা ধ্বংস করেছ
চার্চ ও খোদার প্রজ্বলিত মহিমার বিরুদ্ধে
নেজাবাজি করে।
কিন্তু এ পথ হচ্ছে বাষ্প ও বিজলীতে ঢাকা
এখানে জীবনের স্বচ্ছতোয়া ঝর্ণাধারা
হারিয়ে যায় অন্ধকার গলিতে
এতে আছে শুধু বিয়োজন।
সংযোজনের কোন পথ নেই
সংযোজন ও বিয়োজন এ দুয়ে মিলে
জীবনের সুর মেলে ডানা
তাকে বাদ দিলেই জীবনের দৃষ্টি প্রদীপ
যায় নিভে।

জাভিদ নামা'য় ইকবাল তাই বলশেভিক নেতৃবৃন্দকে খোদাদ্রোহিতা পরিত্যাগের আহবান জানিয়েছেন–

ফিরে এস ঐ নাস্তির গিরিকন্দর থেকে

আলো হাওয়া আর সবুজের
খোদায়ী রাজত্বে ।

ইকবাল মনে করতেন কমিউনিজম যতই মানুষের অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা দিক না কেন এবং মানবতার জন্য যত কল্যাণকর কার্যক্রমই হাজির করুক না কেন এর অন্তর্গত নাস্তির ধারণা সকল প্রচেষ্টাকেই ব্যর্থ করে দিয়েছে। কমিউনিজম বস্তুতান্ত্রিক সমতার বিধান করতে পারলেও মানুষের মানবিক মর্যাদার উন্নয়ন ও বিকাশে কার্যকর কোন উপযোগিতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ইকবাল উল্লেখ করেছেন–

নাস্তিক্যবাদীদের নবী (মার্কস) কবুল করেছে
ঔদরিক সাম্যবাদের
এটা সত্য একতা ও সমতা হলো
একই বৃন্তে দুটি ফুলের মতো
জীবনের মহৎ গুণাবলী যে আয়নায় ভেসে ওঠে
কিন্তু বস্তুবাদী আলো হাওয়ায় তা বিকশিত হবার নয়। (জাভিদ নামা)

ইকবাল তাঁর কবিতায় ও লেখনীতে একটি জিনিসের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন তা হলো মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং এটি তাঁর ধারণায় সম্ভব একমাত্র ধর্মীয় আবরণীতে। স্বাভাবিকভাবেই তিনি জাতীয়তাবাদের মতো নাস্তিক্যবাদী সাম্যবাদকেও মানব প্রগতির অন্তরায় বিবেচনা করতেন। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাজ বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন–

Both nationalism and altheistic socialism at least in the present state of human adjustments must draw upon the psychological forces of hate, suspicion and resentment which lend to impoverish the soul of man and close up his hidden sources of spiritual energy. Neither the technique of medieval mysticism nor nationalism nor alteistic socialism can cure the ills of a dispairing humanity.

(The Reconstruction of Religious Thought in Islam)

সমকালীন দার্শনিক ও সংস্কারকরদের মতো ইকবালকেও মুসলিম সমাজের হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করতে হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকর থাবা যেমনি মানবিক আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তেমনি পুঁজিবাদের কালো হাত শোষণ ও জুলুমের দৈত্যকে শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজে যে দারিদ্র, হতাশা ও বেদনার চিত্রাবলী ডানা মেলেছিল তা মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কেও ক্ষণকালের জন্য কমিউনিজমের মরীচিকা মোহমুগ্ধ করে ফেলেছিল। ইকবাল তাঁর প্রখর দূরদৃষ্টির দ্বারা এ বাস্তবতাকে অনুভব করেছেন। তাই তিনি কমিউনিজমের আপাতঃ বৈভব ও উজ্জ্বলতায় বিমুগ্ধ না হয়ে ইসলামের শাশ্বত আদর্শের উজ্জীবন ঘটিয়েছেন যাতে মুসলিম মানস কোরআনী আদর্শের গীতিকায় পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। ইকবালের কমিউনিজম ভাবনার একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করেছেন মাযহারুদ্দীন সিদ্দিকী–

All that Iqbal wrote against capitalism might have been written word for word by a communisl poet; so great was his hatred of injustice, slavery and nationalist imperialism. Yet Iqbal was neither a communist nor an atheist. On the other hand he was violently opposed to atheistic communism. How

could a poet philosopher, who believed in the worth of human personality, who was so individualistic that he heard the pulsations of egohood, even in lifeless matter, believe that a totalitarian system out to crush freedeom, individuality, religion and spirituality, could become a source of human welfare or an instrument for the progress of mankind.

(The Image of the West in Iqbal, Muzheruddin Siddiqi)

ইকবাল দ্রষ্টা ও ধ্যানীর দিব্যচক্ষে মুসলিম মিল্লাতের ভবিষ্যতকে কল্পনা করেছেন। তিনি জানতেন, কমিউনিজমের আলেয়া মুসলিম সমাজের মাযহাবী একতা ও কোরআনী মূল্যবোধের বিপর্যয় ঘটাবে। তাই তিনি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকেই বর্তমান সমস্যার সমাধানকল্পে একমাত্র উত্তম বিবেচনা করেছেন।

ইকবাল ও পাশ্চাত্য সভ্যতা

ইকবাল কাব্যের বিচিত্র ও বহুবর্ণচ্ছটার দীপ্ত অরুণিমা বিশ্বমানসের গৌরবদীপ্ত সত্তার জাগরণ ঘটিয়েছে। তাঁর দর্শন মানবতার প্রীতিময় চিত্রেরই এক রূপদক্ষ কারুকাজ।

সমকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার অভূতপূর্ব কারিগরী সমৃদ্ধি ও বিকাশের ধারা সৃষ্টি করে বিশ্বের এযাবৎকালের মানবিক প্রগতি ও উন্নয়নকে অস্বীকৃতির চোরাগলিতে নিক্ষেপ করেছে। ইকবাল মানবতার এ বিপর্যয়কে নিরীক্ষণ করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্দর মহল থেকে। ইকবাল দর্শনের মৌল চেতনাটি ছিল বিশ্বমানবতার জন্য গ্রহণযোগ্য একটি পথের নির্দেশ যা সকল মানুষের অন্তরংগ ও বহিরংগের কল্যাণকামিতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে।

উপমহাদেশে ইউরোপীয় আগ্রাসনের পরবর্তী সময় থেকেই এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য সভ্যতার চিত্র উন্মোচিত হতে শুরু করে। ইউরোপীয় বণিক শ্রেণীর আগমনের সাথে তাদেব সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প ও দর্শনের জাহাজও এদেশের বন্দরে নোঙ্গর করে। অতি স্বাভাবিকভাবেই সত্য– ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সভ্যতা এই বৈদেশী আক্রমণ প্রতিহত করবার চেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফলকাম হয়নি এবং এই নতুন প্রেক্ষাপটে মুসলিম সমাজদেহে ইউরোপীয় চিন্তা ও মননের বীজ উপ্ত হতে শুরু করে।

ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মমূলে প্রবেশ করেছিলেন ; তাঁর শিক্ষা জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অতিবাহিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীতে। দর্শনের ছাত্র হিসেবে তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকৃত রূপটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। ইকবালের গোচরীভূত ছিল আধুনিক ইউরোপের প্রযুক্তি ও কৌশলগত সমৃদ্ধি যত ব্যাপক হোক না কেন এর নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। ইউরোপীয় সভ্যতার যে চাকচিক্য তা নির্মিত হয়েছে ধর্মহীনতার সৌধের উপর। মধ্যযুগে সীজার ও পোপের আধিপত্যের লড়াইয়ে পোপের ক্ষমতা খর্ব করা হলে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে বিযুক্ত করা হয় এবং মানবতার উপর ধর্মহীনতার নৈরাজ্য চাপিয়ে দেয়া হয়। এই সামাজিক অব্যবস্থার মধ্যে জন্ম নেয় পুঁজিবাদী জুলুম। এ জুলুমের রাষ্ট্রিক পরিণতি হিসেবে আসে জাতীয়তাবাদ যা জাতিতে জাতিতে হানাহানি আর বিপর্যয়ের সূচনা করে। ইকবাল লক্ষ্য করেছেন, এই ঘোরতর দুর্দৈবের মধ্যে ত্রাণকারীর ভূমিকায় আসে কমিউনিজম যা কিনা নৈতিকতাহীন এক নতুন রাষ্ট্রিক স্বৈরাচারের জন্ম দেয়।

উপমহাদেশে বণিক শাসনের সূচনার পর থেকে মুসলিম সমাজ বিশেষত মুসলিম তরুণ সম্প্রদায় ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও দর্শনের অনুরাগী হতে শুরু করে। এ অনুরাগ পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যপ্রীতিতে পরিণত হতে শুরু করলে ইকবাল এ প্রক্রিয়াকে আত্মঘাতী হিসেবে বিবেচনা করেন। কারণ তাঁর কাছে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রতীয়মান হয়েছিল বস্তু সভ্যতার জ্বলজ্বলে চিত্র হিসেবে। পাশ্চাত্যের কারিগরী সমৃদ্ধি ও কৌশলগত প্রযুক্তি তাঁকে আকৃষ্ট করলেও এর অন্তঃসম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং নৈতিক অনগ্রসরতা এর অনিবার্য ধ্বংসকে ডেকে আনতে পারে বলেও ইকবালের প্রতীতি জন্মেছিল।

ইকবাল তাই মুসলিম সমাজকে বণিক সভ্যতার এই ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের দিকে ইঙ্গিত করে স্বীয় ঐতিহ্যতরুর সংলগ্ন হবার জন্য আহবান জানিয়েছেন। ইকবাল দেখেছেন, মূল্যবোধের বিপর্যয়

হেতু ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তিসমূহ কেমন মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে এবং তার অনিবার্য ফলাফল কদর্য মানবিকতার আকৃতিতে প্রাচ্যের দেশগুলোকেও গ্রাস করে চলেছে। তিনি তাঁর এক সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় পাশ্চাত্যের নগরবাসীদের এই সতর্কবাণী শুনিয়েছেন, ভঙ্গুর শাখায় বাঁধা নীড় কখনো স্থায়ী হতে পারেনা–

হে পাশ্চাত্যবাসী
আল্লাহর পৃথিবী একটি দোকানঘর নয়।
আর তোমরা যাকে সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা মনে করেছ
তা মেকী বলেই প্রমাণিত হবে।
তোমাদের নিজেদের খঞ্জরের উপরই
আপতিত হবে তোমাদের সভ্যতা।
ভঙ্গুর বৃক্ষশাখায় নির্মিত কুলায়
ভেঙ্গে পড়বে– আজ নয় আগামীকাল।
কখনো এ স্থায়ী হবার নয়।

ইকবাল ইউরোপীয় সভ্যতার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছেন। তিনি একথা বলে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, বণিক সভ্যতার মর্মস্বরূপে বস্তুবাদী নৈরাজ্যের ফলস্বরূপ যে নির্মানবিকতার অন্ধকার ঘনীভূত হয়েছে তা ক্রমে বিশ্বজনীনরূপে দেখা দেবে। এই সাবধানবাণী কবির দার্শনিক প্রজ্ঞারই নিদর্শন। কিন্তু তখনকার দেয়া কবির এ সাবধানবাণী ইউরোপ কানেই তোলেনি কিংবা মনে করেছে, এটি একটি নতুনতর পূর্বদেশীয় দুর্জ্ঞেয় চিন্তার প্রতিফলন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত অর্থে যখন বণিক সভ্যতার বুনিয়াদ নড়ে উঠলো, পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ যখন পৃথিবী কাঁপিয়ে তুললো তখন ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা ইকবালের বিশ্বদৃষ্টির সমর্থন দিলেন এবং তা অবশ্য অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে।

ইকবাল কোন এক সময় মুসোলিনীর দিকে ঝুঁকেছিলেন; তার প্রশস্তি রচনা করেছিলেন; কিন্তু তার মধ্যেও যোগ করে দিয়েছিলেন বণিক সভ্যতার এই আধিপত্যবাদী চিত্র–

ইম্পিরিয়ালিজম এর দেহটা প্রকাণ্ড,
হৃদয়টা অন্ধকার ...... (অনুবাদ অমিয় চক্রবর্তী)

ইকবাল পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক দুর্বলতাটি ধরতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন কেমন করে মানুষের মানবিক বৃত্তির শুভ জাগরণকে পাশ্চাত্য সভ্যতা অশুভ বৃত্তির দানবীয় ধাক্কায় ঠেকিয়ে দিচ্ছে। অন্তরের শুভ উপলব্ধির হয়েছে মৃত্যু, যদিও আপাতদৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের আলো ঝলোমল চিত্র চোখে বিমুগ্ধতার অঞ্জন বুলিয়ে যায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সভ্যতার বুক জুড়ে ব্যর্থতার ক্রন্দনই তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিজলী বাতি পশ্চিমীদের নৈশকালীন অন্ধকার দূর করেছে ঠিক, কিন্তু চিন্তার দিগন্তকে যেমনি অস্বচ্ছতা থেকে মুক্ত করতে পারেনি তেমনি পারেনি তাতে স্বর্গীয় আভা যুক্ত করতে। ইকবাল তাঁর বহু নন্দিত লেনিন কবিতায় পরলোকগত এই বলশেভিকের জবানীতে ইউরোপের বিরুদ্ধে ছুটিয়েছেন ক্রুদ্ধ শ্লেষাত্মক ধিক্কার–

য়ুরোপে আলো, জ্ঞান এবং শিল্প দেখো আজ অপর্যাপ্ত।
তার প্রমাণও দেয়া হয়েছে সাথে সাথে–
স্থাপত্য চাও তো দেখো ব্যাঙ্কগুলির দিকে,
ধনিকের সৌধগুলি চার্চের চেয়ে ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন,

বাণিজ্য নিশ্চয় আছে, বস্তুত সেটা জুয়া খেলা,
একজনের লাভে হাজারজনের মৃত্যু।
যে মহাজাতি হারালো ভগবানের প্রসাদ,
চরম তার উৎকর্ষ ইলেকট্রিসিটি এবং স্টীম।.....
লক্ষণ স্পষ্ট, তকবীর নামক দাবা খেলিয়ে
করল বাজীমাত তদবীর দাবাড়ুকে।........
সরাই রক্ষকেরাও বসে ভাবছে ভাগ্যের কথা।.......
রাত্রে পথের লোকের মুখে দেখছ স্বাস্থ্যের রক্তিম আভা
তার কারণ ওদের শরাবপান, অথবা কসমেটিক। (অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী)

ইউরোপের সামাজিক নৈরাজ্যে ইকবাল শংকিত হয়েছিলেন।

তাঁর সামনে প্রকটিত হয়েছিল পশ্চিমীদের নৈতিকতা বিযুক্ত খোদাবিহীন সাম্রাজ্যের চিত্র। তিনি ইউরোপে বিরাজমান অস্থিরতা ও মানবিক প্রকল্পের নিবীর্যতাকে যেমন সমীকৃত করে দেখেছেন, তেমনি এর গৌরবোজ্জ্বল বৈজ্ঞানিক প্রগতিকে স্বাগত জানিয়েছেন। ইকবালের চিন্তা ও উপলব্ধি আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ধর্মের নৈতিক বাতাবরণে পুষ্ট হয়ে এবং তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় মূল্যবোধ ব্যতীত মানবতার শাশ্বত জয়যাত্রা কখনো স্থায়িত্ব পেতে পারেনা। মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধর্ম এক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে এবং মানব প্রগতির ইতিবাচক সঞ্চয়টুকু ধর্মের কল্যাণকামিতায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে। ইকবাল মনে করতেন, ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ধর্মের বিয়োজন শুধু নৈরাজ্যের পথ খুলে দেয়। ইউরোপীয়রা ধর্মকে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনে পরিত্যক্ত ঘোষণা করে সেই বিশৃঙ্খলাকেই আমদানী করেছে। যেমন–

রাষ্ট্রশক্তি মুক্ত হল চার্চের হাত থেকে
য়ূরোপীয় পলিটিক্স সেই দানব যার শিকল কেটেছে;
কিন্তু অন্যের সম্পত্তি যখন দানবের চোখে পড়ে,
চার্চের দূতেরা চলে যুদ্ধবাহিনীর আগে আগে।
['দিন সিয়াসত'– রাষ্ট্রনীতি, অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী]
অথবা–
য়ূরোপের দার্শনিককে প্রশ্ন করা দরকার
কেননা হিন্দুস্তান এবং গ্রীসও তার অনুসরণ করছে ঃ
"তোমাদের সভ্যতার চরম কি এই যে পুরুষেরা চাকরি পায়না
আর মেয়েরা পায়না স্বামী?" ['এক সওয়াল'– এক প্রশ্ন, অনুবাদ– অমিয় চক্রবর্তী]

ইকবাল তাঁর পস্ চেহ্ বায়াদ করদে উল্লেখ করেছেন, ইউরোপীয় সভ্যতার দুষ্টক্ষত কেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সত্য সন্ধানী মানুষ নিয়ত যার সাথে লড়াইয়ে ব্যস্ত। নতুন করে ইউরোপীয়রা কাবার প্রাংগণে লাত ও উজ্জার মূর্তিকে উন্মোচন করেছে। তারা মানবতার হৃদয়কে করেছে মসীলিপ্ত এবং আত্মাকে মৃতবৎ। সভ্যতারূপী এ ডাকাতই মানুষকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে–

ইউরোপীয়দের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে নাস্তিকতার দানব
খোদামস্ত পুরুষের সাথে চলছে যার লড়াই
এ দানব প্রসব করে নিত্য নতুন উপাচার

হরমে সে তুলেছে নতুন লাত ও উজ্জা
তারই উৎপাতে হৃদয়ের চোখ হয়েছে অন্ধ
আত্মা এখন ধূসর
ট্যুলিপ গোলাপও কেঁদে বলছে 'আমার জীবনের
সে অন্তরঙ্গিতা গেল কোথায়?'

এই সভ্যতার লক্ষ্য তাই নিবদ্ধ হয়েছে মানুষকে নিয়ে বেসাতী করায় এবং মানবিকতার বিপর্যয় ঘটানোর মধ্যে। ইউরোপীয় চিন্তার মর্মস্বরূপে যে বণিক চরিত্র অস্তিত্ব লাভ করেছে, ইকবাল মনে করেন তার অপনোদন না ঘটলে প্রেম-প্রীতি ও শান্তি-সম্প্রীতির কোন স্থান পৃথিবীতে থাকতে পারবেনা–

হায় ইউরোপ যদি জানতো রহস্য গ্রন্থি
কিন্তু তার চক্ষু জ্যোতিষ্মান নয় খোদার নূরে
জীবন রহস্যের ঠিকানা তাই তার অজানা
সে জানেনা ভালো ও মন্দের প্রভেদ
তার চিন্তা কত অপরিচ্ছন্ন এবং
উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ।
তার দৃষ্টিতে আলোকিত নয় পৃথিবী
সে শিখিয়েছে জাতিতে জাতিতে ঘৃণা
আর যে বীজ রোপণ করে
সেই কৃষকের ফসল হরণ
দুর্বলের জীবিকায় হানা দেয়া তার অভ্যাস
ভাইয়ের বুকে খঞ্জর চালানো তার প্রকৃতি।

ইকবালের ধারণা, বণিক সভ্যতার প্রাণ লুকিয়ে আছে ইহুদী মেধা ও মননের সৌকর্যে। পশ্চিমীদের চিন্তা ও দর্শনের মৌল কাঠামোটি যেমন নিয়ন্ত্রণ করছে অভিশপ্ত ইহুদীরা তেমনি ওদের বণিক চরিত্রের বিকাশের পথ ধরে বর্তমান ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী মুখোশপ্রাপ্তির পেছনে ইহুদী কূটনীতিও কার্যকর রয়েছে। ইকবাল জানতেন, কোরআনের বর্ণনা অনুসারে এবং ইতিহাসের সূত্র সন্ধান করলে ইহুদীদের কদর্য চরিত্রই বেরিয়ে আসবে। আল্লাহর নির্দেশকে লংঘন করে ইহুদীরা বারবার লাঞ্ছিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। সেই নির্দেশ অমান্যকারীরাইএখন খ্রীষ্টীয় সাম্রাজ্যের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছে। ইহুদী চিন্তা ও কপটতার মহামারীতে সুবুদ্ধি ও ধর্মও আক্রান্ত হতে শুরু করেছে–

ইউরোপীয়রা শুরু করেছে নতুন ব্যবসা
মানবতা হচ্ছে তার পণ্য
ব্যাঙ্কের যত ঝকমারি দেখছ
এ হলো ইহুদী আবিষ্কার।
হৃদয় থেকে শাদা গোলাপেরা শুকিয়ে যাচ্ছে
পৃথিবীতে যতদিন এ পদ্ধতি থাকছে
জ্ঞান, ধর্ম ও সংস্কৃতি স্বপ্নাচ্ছন্নই রয়ে যাবে।

পশ্চিমী সভ্যতার আলো ঝলোমল চিত্রাবলী তবে কি প্রহেলিকা? ইকবালের বিশ্বাস,

ইউরোপিয়ানদের চাকচিক্য ও জাঁকজমক ঠিকই আছে, কিন্তু তাতে নেই হযরত মুসার স্বর্গীয় জ্যোতি। সেখানে অনুপস্থিত ইব্রাহীম খলিলের (আঃ) স্পর্শ যার কারণে আগুন পরিণত হয় ফুলের সৌরভে। বৈজ্ঞানিক প্রগতি ইউরোপে বর্তমান কিন্তু মানবিক বিকাশের ধারা স্তব্ধ। এমনকি আধুনিক কালের যে বহুল আলোচিত বিপ্লবী দার্শনিকেরা তারাও জ্ঞাত নয় এর পরিণতি কোথায় এবং এই শৃঙ্খল মুক্তির উপায় কি–

ইউরোপের শ্বেত প্রদীপের দিকে একবার তাকাও
সিকান্দারের আরশির চেয়ে মদের সুরাহী
ওদের বেশী রোশনাই।
সাকীর তনুকা ঝলসে ওঠে শরাবীর চোখে।
কিন্তু হায়!
মুসা কলিমের দীপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত।
কোথায় পাবে তারা খলিলের উত্তাপ?
জড়তার মাঝে আচ্ছন্ন যে জ্ঞান
মুহব্বতের মন্ত্রশক্তি সেখানে বিলুপ্ত;
পশ্চিমের দিগন্ত অস্থির নিঃশ্বাসে পূর্ণ
ওদের চিন্তায় নেই স্থিরতার লক্ষণ
জ্ঞানের দিকপালেরা এখন পোষণ করছে
অধৈর্য আত্মা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্বরূপে যে বস্তুবাদী কারুকীর্তি ডানা মেলেছে তার পরিণতিতে চার্চের মহিমা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। ধর্মের নৈতিক ও কল্যাণ বন্ধন বঞ্চিত যে সমাজ ব্যবস্থা, সেখানে উপ্ত হয়েছে জড়বাদী উপাচার। দারিদ্র ও বেকারত্বের পাশাপাশি যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও মদ্যপান যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমন সামাজিক জুলুম ও বেইনসাফীর দিগন্ত হয়েছে প্রসারিত। পশ্চিমের বস্তুবাদী নৈরাজ্যের একটি সুন্দর চিত্র ইকবাল তাঁর বহু নন্দিত মাদ্রাজ বক্তৃতায় তুলে ধরেন এভাবে–

..... Wholly shadowed by the result of his intellectual activity, the modern man has ceased to live soulfully i.e from within. In the domain of thought he is living in open conflict with himself : and in the domain of political life he is living in open conflict with others. He finds himself unable to control his ruthless egoism and his infinite gold hunger which is gradually killing all higher striving and bringing nothing but life weariness. Absorbed in the 'fact' that is to say, the optically present source of sensation, he is entirely cut off from the unplumbed depths of his own being. In the wake of his systematic materialism has at last come that paralysis of energy which Huxley apprehended and deplored ....

(Reconstruction of Religious Thought in Islam)

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ যে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ তার অস্থির পীড়নে মানবতা জর্জরিত। পুঁজিবাদের দংশনে যেমন সামাজিক জুলুম হয়েছে বর্ধিত তেমনি সমাজবাদের বিনিময়ে পৃথিবী লাভ করেছে খোদাহীনতার দৌরাত্ম। এমনি যে ইউরোপীয় সভ্যতা তার অন্ধ অনুকরণ ভারতীয়

মুসলমানদের জন্য হবে আত্মঘাতী। ইকবাল মনে করতেন মুসলিম তরুণদের ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আঁচ না করেই তার পেছনে ছোটা নিরর্থক–

তোমার সোফা ইউরোপের, তোমার গালিচা ইরানের–
তরুণদের মধ্যে যখন আমি এসব বিলাসিতা
প্রত্যক্ষ করি তখন অশ্রু হয়ে ঝরে আমার রুধির।
পদ আর পদবির কি মূল্য– খসরুর জাঁকজমকেরই বা কি দাম
যখন হায়দারের মতো বীরদর্পে বিশ্বের মোকাবিলা করনা,
বা সালমানের মতো জগতকে তুচ্ছজ্ঞানে করনা ত্যাগ,
চাকচিক্যময় আধুনিক বিশ্বে যে তুষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়না
তা হচ্ছে অকৃত্রিম ঈমানদারের গৌরব, তার সেই বিশ্বাসের
উপর প্রতিষ্ঠিত। (অনুবাদ– কে, এ, রহমান)

মুসলিম তরুণদের ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনে ভারাক্রান্ত হওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি তাদের নৈতিক বিপর্যয়ের কার্যকারণ হিসেবে দায়ী করেছেন। ইকবাল উল্লেখ করেছেন আধুনিক তরুণদের অন্তরে ধর্মানুরাগ নেই। তাদের আছে ক্ষুরধার জবান কিন্তু চোখে অনুতাপের অশ্রু অর্থাৎ খোদাভীরুতা থেকে তারা বঞ্চিত। ইকবাল প্রশ্ন করেন, যে সভ্যতার নিজের বিপর্যয় ঠেকানোর মতই শক্তি নেই, কি করে সে অন্যের বিপদ হরণ করবে। আশ্চর্য যার নিজের নেই আলো সে কি করে অন্যকে পথ দেখাবে–

চোখ ঝলসানো সূর্যকর যাদের ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনা
কিংবা যাদের দৃষ্টি প্রদীপ হয়েছে নিষ্প্রভ
কি করে পারস্য হেজায আহরণ করবে
ওদের কাছে জীবনের রং
যারা নিজেরাই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়েছে
তারা কি করে দেখাবে অন্যে বাঁচবার আশা।

ইকবাল তাই প্রাচ্যের আধুনিকায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কারণ, বণিক সভ্যতা প্রাচ্যের নৈতিক রীতি বন্ধনকে কেটে ফেলতে উদ্যত। এক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ইউরোপীয়রা সর্বদাই প্রাচ্যের অধিবাসীদেরকে বক্র দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে। প্রাচ্যের কল্যাণ ও সুমিত আচরণের বিনিময়ে তারা তাদের দিয়েছে বরং বিদ্বেষেরই মর্মপীড়া। যেমনি সিরিয়া তাদের দিয়েছে খ্রীস্টের নৈতিক ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা, প্রকারান্তরে ইউরোপীয়রা সিরীয়দের শিখিয়েছে মদ, জুয়া আর বারবণিতার কদর্য ব্যবসা–

সিরিয়ার ধুলিকণায় অনুরণিত হয়েছে খ্রীস্টের বীণা
ফিরিঙ্গিরা পেলো সেই আলো
খোদায়ী পুরুষ তাদের শিখালেন মুহব্বতের মন্ত্র
কিন্তু য়ূরোপীয়রা সিরীয়দের কি দিলো
আশ্চর্য!
মদ, জুয়া আর পতিতাবৃত্তি।

সুতরাং প্রাচ্যের আধুনিকায়নের তাগাদা নিরর্থক। কারণ, এর অর্থ হলো পশ্চিমী জীবন দর্শনের কাছে প্রাচ্যের অধিবাসীদের বিক্রি হয়ে যাওয়া–

ইউরোপিয়ানদের চাকচিক্য ও জাঁকজমক ঠিকই আছে, কিন্তু তাতে নেই হযরত মুসার স্বর্গীয় জ্যোতি। সেখানে অনুপস্থিত ইব্রাহীম খলিলের (আঃ) স্পর্শ যার কারণে আগুন পরিণত হয় ফুলের সৌরভে। বৈজ্ঞানিক প্রগতি ইউরোপে বর্তমান কিন্তু মানবিক বিকাশের ধারা স্তব্ধ। এমনকি আধুনিক কালের যে বহুল আলোচিত বিপ্লবী দার্শনিকেরা তারাও জ্ঞাত নয় এর পরিণতি কোথায় এবং এই শৃঙ্খল মুক্তির উপায় কি–

ইউরোপের শ্বেত প্রদীপের দিকে একবার তাকাও
সিকান্দারের আরশির চেয়ে মদের সুরাহী
ওদের বেশী রোশনাই।
সাকীর তনুকা ঝলসে ওঠে শরাবীর চোখে।
কিন্তু হায়!
মুসা কলিমের দীপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত।
কোথায় পাবে তারা খলিলের উত্তাপ?
জড়তার মাঝে আচ্ছন্ন যে জ্ঞান
মুহব্বতের মন্ত্রশক্তি সেখানে বিলুপ্ত;
পশ্চিমের দিগন্ত অস্থির নিঃশ্বাসে পূর্ণ
ওদের চিন্তায় নেই স্থিরতার লক্ষণ
জ্ঞানের দিকপালেরা এখন পোষণ করছে
অধৈর্য আত্মা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্বরূপে যে বস্তুবাদী কারুকীর্তি ডানা মেলেছে তার পরিণতিতে চার্চের মহিমা হয়েছে ভূলুণ্ঠিত। ধর্মের নৈতিক ও কল্যাণ বন্ধন বঞ্চিত যে সমাজ ব্যবস্থা, সেখানে উপ্ত হয়েছে জড়বাদী উপাচার। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের পাশাপাশি যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও মদ্যপান যেমন বিস্তৃত হয়েছে তেমন সামাজিক জুলুম ও বেইনসাফীর দিগন্ত হয়েছে প্রসারিত। পশ্চিমের বস্তুবাদী নৈরাজ্যের একটি সুন্দর চিত্র ইকবাল তাঁর বহু নন্দিত মাদ্রাজ বক্তৃতায় তুলে ধরেন এভাবে–

..... Wholly shadowed by the result of his intellectual activity, the modern man has ceased to live soulfully i.e from within. In the domain of thought he is living in open conflict with himself : and in the domain of political life he is living in open conflict with others. He finds himself unable to control his ruthless egoism and his infinite gold hunger which is gradually killing all higher striving and bringing nothing but life weariness. Absorbed in the 'fact' that is to say, the optically present source of sensation, he is entirely cut off from the unplumbed depths of his own being. In the wake of his systematic materialism has at last come that paralysis of energy which Huxley apprehended and deplored ....

(Reconstruction of Religious Thought in Islam)

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ যে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ তার অস্থির পীড়নে মানবতা জর্জরিত। পুঁজিবাদের দংশনে যেমন সামাজিক জুলুম হয়েছে বর্ধিত তেমনি সমাজবাদের বিনিময়ে পৃথিবী লাভ করেছে খোদাহীনতার দৌরাত্ম। এমনি যে ইউরোপীয় সভ্যতা তার অন্ধ অনুকরণ ভারতীয়

মুসলমানদের জন্য হবে আত্মঘাতী। ইকবাল মনে করতেন মুসলিম তরুণদের ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ আঁচ না করেই তার পেছনে ছোটা নিরর্থক–

তোমার সোফা ইউরোপের, তোমার গালিচা ইরানের–
তরুণদের মধ্যে যখন আমি এসব বিলাসিতা
প্রত্যক্ষ করি তখন অশ্রু হয়ে ঝরে আমার রুধির।
পদ আর পদবির কি মূল্য– খসরুর জাঁকজমকেরই বা কি দাম
যখন হায়দারের মতো বীরদর্পে বিশ্বের মোকাবিলা করনা,
বা সালমানের মতো জগতকে তুচ্ছজ্ঞানে করনা ত্যাগ,
চাকচিক্যময় আধুনিক বিশ্বে যে তুষ্টি খুঁজে পাওয়া যায়না
তা হচ্ছে অকৃত্রিম ঈমানদারের গৌরব, তার সেই বিশ্বাসের
উপর প্রতিষ্ঠিত। (অনুবাদ– কে, এ, রহমান)

মুসলিম তরুণদের ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনে ভারাক্রান্ত হওয়ার শিক্ষা ব্যবস্থাকে তিনি তাদের নৈতিক বিপর্যয়ের কার্যকারণ হিসেবে দায়ী করেছেন। ইকবাল উল্লেখ করেছেন আধুনিক তরুণদের অন্তরে ধর্মানুরাগ নেই। তাদের আছে ক্ষুরধার জবান কিন্তু চোখে অনুতাপের অশ্রু অর্থাৎ খোদাভীরুতা থেকে তারা বঞ্চিত। ইকবাল প্রশ্ন করেন, যে সভ্যতার নিজের বিপর্যয় ঠেকানোর মতই শক্তি নেই, কি করে সে অন্যের বিপদ হরণ করবে। আশ্চর্য যার নিজের নেই আলো সে কি করে অন্যকে পথ দেখাবে–

চোখ ঝলসানো সূর্যকর যাদের ঘুম ভাঙ্গাতে পারেনা
কিংবা যাদের দৃষ্টি প্রদীপ হয়েছে নিষ্প্রভ
কি করে পারস্য হেজায আহরণ করবে
ওদের কাছে জীবনের রং
যারা নিজেরাই মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়েছে
তারা কি করে দেখাবে অন্যে বাঁচবার আশা।

ইকবাল তাই প্রাচ্যের আধুনিকায়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কারণ, বণিক সভ্যতা প্রাচ্যের নৈতিক রীতি বন্ধনকে কেটে ফেলতে উদ্যত। এক কবিতায় তিনি উল্লেখ করেছেন, ইউরোপীয়রা সর্বদাই প্রাচ্যের অধিবাসীদেরকে বক্র দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে। প্রাচ্যের কল্যাণ ও সুমিত আচরণের বিনিময়ে তারা তাদের দিয়েছে বরং বিদ্বেষেরই মর্মপীড়া। যেমনি সিরিয়া তাদের দিয়েছে খ্রীস্টের নৈতিক ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা, প্রকারান্তরে ইউরোপীয়রা সিরীয়দের শিখিয়েছে মদ, জুয়া আর বারবণিতার কদর্য ব্যবসা–

সিরিয়ার ধুলিকণায় অনুরণিত হয়েছে খ্রীস্টের বীণা
ফিরিঙ্গিরা পেলো সেই আলো
খোদায়ী পুরুষ তাদের শিখালেন মুহব্বতের মন্ত্র
কিন্তু য়ূরোপীয়রা সিরীয়দের কি দিলো
আশ্চর্য!
মদ, জুয়া আর পতিতাবৃত্তি।

সুতরাং প্রাচ্যের আধুনিকায়নের তাগাদা নিরর্থক। কারণ, এর অর্থ হলো পশ্চিমী জীবন দর্শনের কাছে প্রাচ্যের অধিবাসীদের বিক্রি হয়ে যাওয়া–

আমার হৃদয় কম্পিত হয়
যখন শুনি প্রাচ্যের আধুনিক সজ্জার কথা
কিন্তু এ হলো ইউরোপীয় নগ্নিকার উন্মাতাল অনুকরণ।

ইকবালের মনোভাবনায় ক্রিয়া করেছিল এক বিশ্বাসী জীবনের সংহত চিত্র; এই বিশ্বাসের আলোকে তিনি জীবনের প্রতিটি কেন্দ্রে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্বচ্ছ ও নৈতিকতা-বর্জিত ঘৃণিত রূপটিকে তাই তিনি জীবন বিকাশের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করেছিলেন। তার অর্থ এই নয়, ইউরোপীয়দের সকল কর্মকাণ্ডকেই তিনি পরিহার করবার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের অসাধারণ কারিগরি সমৃদ্ধি তাকে মুগ্ধ করেছিল এবং তিনি এর সফলতাকে প্রাচ্যের অধিবাসীদেরও কাজে লাগানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ মানব প্রগতির সহায়ক যে কোন উপকরণ তা যে স্থানেরই হোকনা কেন, আহরণ করবার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। পশ্চিমী সভ্যতার যা কিছু কল্যাণকর তা গ্রহণ করবার কথাও কবি একস্থানে উল্লেখ করেছেন–

পাশ্চাত্যের শক্তি নিহিত রয়েছে জ্ঞানবিজ্ঞানে
তোমার পাগড়ী তো জ্ঞান আহরণের পথে কোন বাধা নয়। (অনুবাদ– হাসান জামান)

পাশ্চাত্যের প্রতি তার ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল মূলত এর নৈতিক উদ্বন্ধনহীন জীবনাচরণের জন্য যে আচরণ মানব সমৃদ্ধি ও মানব উন্নয়নের ধারাকেই শুধু ব্যাহত করে। খোদায়ী বিধানের কার্যকারিতাকে দূরে সরিয়ে মানবমস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শের আধিপত্যই পাশ্চাত্যের বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থার জন্য দায়ী বলে তিনি মনে করতেন। ইকবালের বিশ্ববীণায় শাশ্বত সুরের এই আনন্দলহরী তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে।

ইকবাল কাব্যে রাসূল প্রশস্তি

মানবতার মুক্তির দিশারী নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সুন্দরতম জীবন ও আদর্শের মধুর রূপকল্প ও সুদৃশ্য চিত্র ইকবাল কাব্যে অনিন্দ্য সুন্দর দীপ্তি ও আনন্দোজ্জ্বল অবয়বে প্রকাশ পেয়েছে। রাসূল (সঃ) এর অসাধারণ ও কালজয়ী চরিত্রের সুধা মাধুর্য ইকবালের চিন্তায় ও মননে বিপুলভাবে ক্রিয়া করেছে এবং পরিণতিতে তার কবিতার রাজপ্রাসাদ বিনির্মাণে এটি হয়েছে জ্বলজ্বলে উপকরণ।

ইকবালের রাসূল-দৃষ্টি সাধারণ মানুষের সমতুল্য ছিলনা; একজন পূর্ণ পরিণত, বুদ্ধিবৃত্তিতে অগ্রসর, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মুসলমানের অন্তঃস্রাবী ভক্তি ও ভালবাসার মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল।

বিশ্ব সভ্যতায় রাসূল (সঃ)-এর অসামান্য অবদান এবং তাঁর বাণী ও কর্মের বিপুল প্রভাব ইকবাল চিত্তকে উদ্বেলিত করেছিল। তাঁর নবুয়তির মধ্য দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন মানব সমাজে যে নবজাগৃতির আলোকরশ্মি আগমনের দুয়ার উন্মোচিত হয়েছিল ইকবাল তা অনুভব করেছেন তার বিপুল প্রসারী মানবিক হৃদয় দিয়ে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে যে, জীবনের শেষ দিনগুলিতে ইকবালের কবিতা, চিঠিপত্র এবং নিবন্ধসমূহে আদর্শ মানুষ হিসাবে রাসূল (সঃ)-এর উপস্থিতি খুব বেশী; এমনকি তাঁর মরণোত্তর কবিতা সংকলন **আরমুগান-ই-হিজাযের** (হিজাযের সওগাত) নামকরণের মধ্যেও ইকবালের এই অনুভূতি লক্ষ্যণীয়। এ সময় রাসূল (সঃ)-এর জীবন ও আদর্শভিত্তিক একটি গদ্য কবিতার বই রচনার পরিকল্পনা তিনি নিয়েছিলেন; নাম দিয়েছিলেন **'দি বুক অব এ ফরগটেন প্রফেট।'** মৃত্যু এসে তাঁর এ কাজে বাধ সেধেছিল।

রাসূল (সঃ)-এর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ইকবালকে যে সমৃদ্ধিশীল জীবনের সন্ধান দিয়েছিল তা তাঁর পরিপূর্ণ মানবের ধারণার মধ্যে স্থিতি লাভ করেছে, ইকবালের কাছে রাসূল (সঃ) ছিলেন ইনসান-ই-কামিল।

এই কামিল নবীর প্রতি ইকবালের জাগ্রত চেতনার পরিচয় দেয়ার আগে তাঁর জীবনের অনুপম রূপমাধুরী, চরিত্র সুষমা এবং নবুয়তের অপরিসীম গুরুত্ব, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যের একটি চিত্র আমরা ফুটিয়ে তুলব, যা কি-না ইকবালকে আমৃত্যু অনুপ্রাণিত করেছে, উজ্জীবিত করেছে।

ইসলামী ইতিহাসের সতর্ক অথবা সন্দিগ্ধ পাঠক যিনিই হোননা কেন, স্বীকার করবেন, রাসূল (সঃ) ছিলেন এক তুলনারহিত ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে অথবা রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সর্বত্রই সফলতার নজির রেখে গেছেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে মুসলমানরা খুঁজে পেয়েছিল উসওয়াতুন হাসানা– সুন্দরতম আদর্শ। গিব তার সুবিখ্যাত Studies on the Civilization of Islam গ্রন্থে রাসূল (সঃ)-এর অফুরান প্রভাবের স্বীকৃতি দিয়েছেন–

It would be difficult to exaggerate the strength and the effects of the Muslims attitude toward Muhammad. Veneration for the Prophet was a natural and inevitable feeling, both in his own day and later, but this is more than veneration. The personal relationship of admiration and love which he

inspired in his associates have echoed down the centuries. (Hamilton, A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam)

রাসূল (সঃ)-এর মধ্যে সমাবেশ ঘটেছিল সকল মানবীয় গুণের। আল্লাহর বাণীবাহক হিসাবে তাঁর স্থান অবশ্যই মর্যাদার আসনে সংরক্ষিত; কিন্তু তিনি ছিলেন বাণীবাহকের অনেক উর্ধ্বে। তিনি তাঁর উম্মতদেরকে পরিচালনা করেছেন এক অসাধারণ মানবীয় নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়ে। সৈন্যদলের প্রধান হিসেবে, সন্ধিকর্তার বেশে কিংবা নৈতিকতার পরম উপাসকরূপে তিনি ছিলেন অনুপম। মানবতার উজ্জীবন ছিল তাঁর জীবনের পরম আরাধ্য এবং সে লক্ষ্যকে সম্প্রসারিত করবার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

পরম পরাক্রমশালী শাসক হিসেবে কিংবা বিশ্বনবীর সীমাহীন শ্রদ্ধার আসনে উপবিষ্ট হয়েও তাঁর অন্তরে তিলমাত্র অহংকার ছায়াপাত করেনি। তিনি মুক্ত কণ্ঠে অঙ্গীকার করেছেন–

আনা বাশারুম মিছলুকুম–
আমি তোমাদের মতই মানুষ–

এই অপরূপ সত্যভাষণ কে কোথায় শুনেছে!

তিনি তাঁর পরম শত্রুকেও ক্ষমা করেছেন; দয়া আর প্রেম ছিল তাঁর জীবনের অলংকার। সৈয়দ আমীর আলী রাসূল চরিত্রের এই বিশেষ দিকের প্রতি ইংগিত করে বলেছেন–

Man always attaches the idea of greatness to the character of a person, who whilst possessing the power of returning evil for evil not only preaches but practises the divine principle of forgiveness. Muhammad, as the chief of the state and guardian of the life and liberty of the people in the exercise of justice sternly punished every individual guilty of crime. Muhammad the prophet, the teacher, was gentle and merciful even to his greatest enemies. In him were combined the highest attributes that the human mind can concieve. (The Spirit of Islam, Syed Ameer Ali)

মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল তাঁর ঘৃণিত শত্রুদেরকেও ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন এবং পুরনো শত্রুতার শিকড় উপড়ে ফেলেছেন। রাসূল (সঃ)-এর অভূতপূর্ব জীবন দর্শনের ছায়াতলেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে মানবতা এবং সকল ভেদাভেদ ভুলে বর্ণ ও গোত্রের চিহ্ন তারা মুছে ফেলেছে, ভ্রাতৃত্বের বাণীকে তারা রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছে। রসূল (সঃ)-এর সংগ্রামী জীবনের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো– তিনি আরবীয় সমাজ জীবন থেকে বর্ণ, গোত্র ও জাতীয়তাবাদের চিন্তাকে উৎখাত করেছেন। বিশ্বের ইতিহাসে মানবভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় এর কোন তুলনা নেই।

এই ভ্রাতৃত্বের পাশাপাশি তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিচারকেও নিশ্চিত করেছেন। নবুয়তের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো এই পৃথিবীতে আল্লাহর ওয়াহদানিয়াতের বাণীকে বুলন্দ করা। এ বাণীর বাস্তবায়নের মধ্যে বিনাশ ঘটবে সকল অসাম্যের,তদস্থলে প্রতিষ্ঠিত হবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ঐক্যের; পৃথিবী থেকে মুছে যাবে বৈষম্যের কালো ছায়া। রাসূল (সঃ)-এর প্রচারিত এ দ্বীনের সুদূর প্রসারী গুরুত্বের মূল্যায়ন করেছেন একজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী–

Muhammad's monotheism was, from the very beginning, linked up with humanism and a sense of social and economic justice whose intensity is no

less than the intensity of the monotheistic idea, so that whoever carefully reads the early revealation of the prophet can not escape the conclusion that the two must be regarded as expressions of the same experience. (Islam, Fazlur Rahman)

অন্যত্র এক জায়গায় বলেছেন–

The prophet enunciated and formally pronounced those principles which succinctly summed up all the developments that had underlain the Islamic movement in its actual progress and towards which it had tended as its goal. These are the principles of humanitarianism, equalitarianism, social justice, economic justice, righteousness and solidarity. (Islam, Fazlur Rahman)

মনে রাখা প্রয়োজন, এ শতকের গোড়ার দিকে বিশ্বজুড়ে যে মুসলিম জাগরণের বাণী পুনরুত্থিত হতে শুরু করে, ইকবাল ছিলেন এ প্রজন্মের সন্তান। ইসলামী দেশগুলিতে যে ঔপনিবেশিক নৈরাজ্যের ছায়া বিস্তৃত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা অনুধাবন করেন এর থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হচ্ছে রাসূল (সঃ) এর প্রচারিত জীবন বিধানের যথাযথ অনুসরণ। তারা এও বুঝতে পারেন পাশ্চাত্য দর্শণের শূন্যতা অনেক বেশী এবং তা দিয়েসমকালীন সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গী পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে জাগরণের এ উন্মুখর দিনগুলিতে। তিনি তাঁর কবিতা ও নিবন্ধাবলীতে রাসূল (সঃ) এর প্রতি নিবেদন করেন অপরিসীম শ্রদ্ধা। তাঁর প্রাথমিক পর্যায়ের উর্দূ কবিতাবলী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে প্রায় প্রত্যেকটি রচনায় ফুটে উঠেছে রাসূল (সঃ) এর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও প্রত্যয়। একজন ভক্তের হৃদয়ের ভালবাসা অনুরণিত হয়ে উঠেছে এভাবে– বিশ্বের ইতিহাসে রাসূল (সঃ)-ই হলেন একমাত্র আদর্শ মানুষ যার দেখানো পথ মানবতাকে নিয়ে যেতে পারে মুক্তি ও কল্যাণের রক্তিম ভোরের দিকে।

কওমী জিন্দেগী নামে এক প্রবন্ধে তিনি এই সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন–

The prophet of Arabia was the first to preach man's natural right to freedom and issued injunctions that the rights and privileges of masters and slaves were the same. This was a social revolution, whose impact is being felt even in the world of today. What was the result of this auspicious teaching of the prophet? In Muslim history, slaves became kings and prime ministers.

ইসলাম প্রচারের পূর্বে পৃথিবীর সামাজিক অবস্থা ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন। রাসূল (সঃ) সেই অন্ধকারের মধ্যে সূচনা করলেন দীপ্ত দিনের আলোকরশ্মি বিচ্ছুরণের–

পৃথিবীতে ইসলাম আসার আগে
সামাজিক অবস্থা ছিল নৈরাজ্যপূর্ণ,
সর্বত্র মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল
বৈষম্যের পর্বত।
প্রিয়নবী এসে গুঁড়িয়ে দিলেন
সব ভেদাভেদ
মানবতার ভিতরকার যত অনাসৃষ্টি
অনৈক্যের মধ্যে তিনি আনলেন ঐক্য

তাঁর বাণী দূর করে দিল যত অনিয়ম
রক্ত ও বর্ণের বাঁধন গেল টুটে ।।
(রমূযে বেখূদী)

ইকবাল মনে করেন, কোন জাতি বা সম্প্রদায় অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না যদি তারা নবুয়তের কল্যাণময় উদ্দেশ্য পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। একজন নবীর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐশী প্রেরণা ছাড়া সম্প্রদায়ের আত্মিক উন্নতি বিধান সম্ভব নয়। ইকবাল বলেন–

মিল্লাত গড়ে ওঠে
ব্যক্তির মিলনে
কিন্তু মিল্লাতের বিকাশ হয়
নবুয়তের পরিচর্যায়।
আল্লাহর রাসূলই দিতে পারেন
মিল্লাতের একটি উদ্দেশ্য
নতুন জীবন এবং স্বপ্ন ।।
(রমূযে বেখূদী)

ইকবালের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল রাসূলের ঐশী বিধান ও উদ্দেশ্যের মর্মবাণীর প্রতি। তিনি মনে করতেন মুসলমানরা হচ্ছে ঐশী বিধানের কার্যকারিতা পরিপূরণের জন্য নিয়োজিত এক জাতি এবং রাসূলের আবির্ভাব ছিল এই মহৎ লক্ষ্যকে যথাযথভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমর্পিত।

রাসূলের প্রতি দরদ ও মমতায় ইকবালের অন্তর ছিল পূর্ণ। সাম্প্রতিককালে ফকীর সৈয়দ ওয়াহিদ উদ্দীন কৃত রোজগার-ই-ফকীর গ্রন্থে তাঁর এই আশ্চর্য আন্তরিকতার কয়েকটি নিদর্শন মিলেছে।

ত্রিশের দশকে আর্য সমাজ নামে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক একটি গোষ্ঠী মুসলমানদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচার শুরু করে এবং রাসূলের পবিত্র চরিত্রে কালিমা লেপন করতে থাকে। জনৈক হিন্দু 'রঙিলা রাসূল' নামে নবীর চরিত্র হননকারী একটি বইও রচনা করে। এর ফলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে তীব্র নিন্দাবাদ উচ্চারিত হয় এবং এক পর্যায়ে ইলম দ্বীন নামে একজন সাহসী মুসলিম যুবা কর্তৃক এই পুস্তক রচয়িতা নিহত হয়। বৃটিশ সরকার ইলম দ্বীনকে ফাঁসী দেয়, কিন্তু স্বসমাজে সে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। ইকবাল এ ঘটনায় গভীরভাবে বিচলিত হন এবং তাঁর অন্তর বেদনামথিত হয়ে ওঠে।

এ সময় পাঞ্জাবী ভাষায় ইলম দ্বীনকে উদ্দেশ্য করে তিনি একটি পংক্তিও রচনা করেন–

'আসি গাল্লান কারদেই রেই তাই তারখান দামুন্দা বাজী লে গায়া'
যখন আমরা কথার মালা সাজাতে ব্যস্ত,
ছুতারের ছেলে আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেল
তার কাজে ।।

উল্লেখ্য, ইলম দ্বীন ছিল ছুতারের সন্তান। কিন্তু ইকবাল মনে করেন, সে তার কর্মেই তার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছে। রাসূলের প্রতি মুহব্বতে সে সবাইকে অতিক্রম করেছে।

একই রকম একটি ঘটনা ঘটে ১৯৩৩ সালে। এখানেও ইকবালের রাসূলপ্রীতি লক্ষণীয়। এ সময় আর্য সমাজের সাধারণ সম্পাদক নথুরাম 'হিস্ট্রি অব ইসলাম' নামে একটি বই লিখে পুনরায় রাসূল চরিত্রের উপর আঘাত হানে। এ ঘটনায় মুসলিম জনতার ক্ষোভ রোষায়িত হয়ে ওঠে। ফলশ্রুতিতে সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন এবং লেখককে এক বছরের কারাদন্ড দেন। ১৯৩৪

সালের সেপ্টেম্বর মাসে নথুরাম করাচীর আদালতে জামিনের জন্য আবেদন করেন। শুনানি চলাকালে হাজারা জেলার আবদুল কাইয়ুম নামে একজন তরুণ পাঠান তাকে ছুরি চালিয়ে হত্যা করে। পরবর্তীতে সরকার তাঁকেও ফাঁসি দেয়। কিন্তু মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে তার মৃত্যুদণ্ড রহিত করবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তদবির চলে। এক পর্যায়ে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধি দল ইকবালের সাথে দেখা করে অনুরোধ জানায় তিনি যেন ব্যক্তিগতভাবে ভাইসরয়কে অনুরোধ করেন আবদুল কাইয়ুমের দন্ড লঘু করার জন্য। ইকবাল তাদের দাবীর উত্তরে যা বলেন তা কেবল একজন রাসূল প্রেমিকের পক্ষেই উপযুক্ত–

'যখন আবদুল কাইয়ূম সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সে শাহাদাতের দরজা লাভ করতে চায় তখন কেন আমরা তার এ মর্যাদা প্রাপ্তির পক্ষের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াই। তোমরা কি বল আমি এমন একজনের জন্য ভাইসরয়ের কাছে অনুরোধ করি যে বাঁচলে হবে গাজী, মরলে শহীদ।'

পরবর্তীকালে ইকবাল এই শহীদ যুবকদ্বয়ের উদ্দেশ্যে **'লাহোর আওর করাচী'** নামে একটি কবিতা উৎসর্গ করেন। এখানে তিনি মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেন–

প্রকৃত মুসলমান ভয় পায় না মৃত্যুতে
মৃত্যু হলো চিরন্তন জগতে স্থানান্তর মাত্র
কারো উচিত নয় শহীদের রক্তের
বিনিময় চাওয়া
নাসারা বাদশাহের কাছে–
কেননা তাদের কর্ম হল তুলনাবিহীন। (যরবে কলীম)

রাসূল (সঃ) ছিলেন ইকবালের কল্যাণ আদর্শের প্রতিভূ এবং তিনি মনে করতেন বর্তমান সামাজিক নৈরাজ্যের তিনি একমাত্র পরিত্রাণকারী। রাসূল (সঃ)-এর জ্বলন্ত আদর্শ অনুসরণের জন্য মুসলমানদের তিনি আহ্বান জানান, কেননা এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাদের প্রকৃত সফলতা–

মুস্তফার প্রতি ভালবাসা যিনি পোষণ করেন
ভূভাগ এবং জলভাগ তার আস্তিনে জড়ানো ।।

রাসূল (সঃ)-কে ইকবাল মানবতার এক বড় শিক্ষক হিসেবেও বিবেচনা করতেন। এটি ছিল তাঁর রাসূল-দৃষ্টির একটি ভিন্নতর দিক। তিনি শুধু কবি ছিলেন না; পাশাপাশি দার্শনিক ও সংস্কারক ইকবালও কাজ করে চলেছিলেন। মানবজাতির জন্য রাসূল (সঃ) যে বিশিষ্ট বাণী নিয়ে এসেছিলেন নবুয়তের মধ্য দিয়ে, ইকবাল তা নিরীক্ষণ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। তিনি তাঁর পস্ চেহ্ বায়াদ করদে 'হিকমত-ই-কলিমী' অধ্যায়ে নবুয়তের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, মুসলমানরা যদি প্রকৃত অর্থে সফলকাম হতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের রাসূলের শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। এ কবিতাংশে তিনি নবুয়তের অসাধারণ গুরুত্বের দিকটি বিবেচনা করেছেন এবং তার দর্শনের রাজ্যে নবুয়তের স্থানটিও চিহ্নিত করেছেন। যেমন তিনি বলেন–

রাসূলের কানুন হচ্ছে
সকলের উর্ধে;
তাঁর কাজ নয় আল্লাহ ছাড়া
অন্য কারো কাছে পদানত হওয়া।

তাঁর বাণী হল পূর্ণতর জীবনের;
সংগ্রাম ও বিপ্লবের ।।
রাসূলের বাণীর শানপাথর হলো
আল্লাহতে বিশ্বাস
আর উদ্দেশ্য হলো ঃ মানবতার বিকাশ।
আল্লাহর ইচ্ছাতে সমর্পণের মধ্যে
অর্জিত হয় এই সাফল্য
সত্য ন্যায় আর প্রেম হলো
তার অস্ত্র।

'পস চেহ বায়াদ করদে'র শেষাংশে 'দর হুজুর-ই-রিসালত মাব' শীর্ষক একটি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। এ কবিতা রচনার পটভূমি যেমন কৌতূহলউদ্দীপক তেমন প্রেমিক হৃদয়ের উচ্ছ্বাসেও পরিপূর্ণ। ১৯৩৬ সালের ১৩ই জুন অধ্যাপক ইলিয়াস বারনীর কাছে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল উল্লেখ করেছেন–

On the third of April at three O' Clock at night (I was staying at Bhopal that night), I saw sir Sayyid Ahmad khan in my dream. He enquired for how long I had been ill: I said for more than two years. He said "Make a request to the Holy Prophet". I woke up at once and wrote my request in the form of a poem. (Iqbalnama, Ataullah Sheikh)

কবিতাটিতে বিধৃত হয়েছে সমকালীন ইসলামী দুনিয়ার জিল্লতি ও বেদনাময় চিত্র। ইকবাল উল্লেখ করেছেন রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুতিই হলো এর একমাত্র কারণ–

বিশ্বাসীরা মুখ ফিরায়েছে
রাসূলের কুটির থেকে–
তাই তারা ডুবে আছে
দুর্ভোগের কর্দমে।
মুল্লা ও তরুণ উভয়ই আজ বিচ্যুত;
মুল্লার শিক্ষায় নেই কোন জেল্লা।
ওরা হারিয়েছে জীবনের রং,
সাহস ও স্থৈর্যের বীণা।

একই কবিতায় তিনি ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন ফিরিঙ্গি শাসকদের উদ্দেশ্য করে; যারা মুসলমানদের অন্তরে পয়দা করেছে অবিশ্বাস–

ওরাই মুমিনের দিলকে
করেছে অপরিষ্কার ;
ওদের শৃঙ্খল
মিল্লাতের ঝঙ্কারকে বানিয়েছে মৃৎ।
আদর্শের সুরা হারিয়ে গেছে
উত্তপ্ত মরুর শুকনো মাটিতে।

পরিশেষে তিনি, রাসূলের পাক দরবারে মুনাজাত করেছেন এই বলে–

হে উম্মতের কান্ডারী!
আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ জানাই
এই বার্ত্যাহত জাহাজকে দাও
চিরন্তন জীবনের সন্ধান;
এই সত্য ভ্রষ্টের দলে পাঠাও একজন নাবিক
যে মৃত মানুষের কর্ণরন্ধ্রে পৌছাতে পারে
জীবনের বাণী।
মিল্লাত যেন লাভ করে অন্তরের উত্তাপ
চন্দ্রের দীপ্তি;
তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছে
কল্যাণের যত দ্রাক্ষারস।

কবিতাটি একান্ত ব্যক্তিগত নিবেদন হলেও এর মধ্যে স্ব-সমাজের প্রতি ইকবালের মমতা বাঙময় হয়ে উঠেছে এবং রাসূলকে তিনি কান্ডারী মেনে কওমের এই দুর্ভোগ মুক্তির জন্য আবেদন করেছেন।

রাসূলের অসাধারণ চারিত্রিক দৃঢ়তা ও হৃদয়বৃত্তির উপর যেমন ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা তেমন খতমে নবুয়তের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। সঙ্গত কারণেই রাসূলের অবমাননাকে যেমন তিনি কোনদিন মেনে নিতে পারেননি তেমন পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যা তিনি কখনো সহ্য করেননি। তাঁর জীবদ্দশায় ব্রিটিশ শক্তির ইন্ধনে মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ধর্মমত প্রচার করে এবং খতমে নবুয়তের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে সন্দেহ ভারাক্রান্ত করে তোলে। ইকবাল ইসলামী জীবন দর্শনের এই মৌলিক বিষয়টিকে গভীরভাবে বিবেচনা করেন এবং তাঁর শাণিত লেখনীর দ্বারা বিষয়টিকে পরিষ্কার করে তোলেন। এক পর্যায়ে ইকবাল জওহরলাল নেহেরুর সাথেও এ বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। কেননা, নেহরু বিষয়টি সম্পূর্ণ অনবহিত থেকেও এর ভুল ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

ইসলামের অনেক মহৎ কবির মত ইকবালও রচনা করেছেন অনেক প্রশস্তিমূলক নাতিয়া। এগুলো শুধু রাসূলের প্রতি ভক্তিরসেরই প্রস্রবণ নয় তাঁর মহৎ জীবন, কর্ম ও চরিত্রের এক একটি উজ্জ্বল কণিকাও বটে। নাত রচনায় ইকবালের অবস্থান সাদী, নিযামী, আত্তার, আমির খসরু প্রমুখ প্রতিভাবান কবিদের পাশেই। ইকবালের এ সমস্ত রচনা সমকালীন কবিদের মতো আধ্যাত্মিক গীতি রসাশ্রিত হয়েই থাকেনি, তিনি এখানে দেখাতে চেয়েছেন রাসূল (সঃ) হলেন- আদর্শ চরিত্র- মানুষের যোগ্যতা ও শক্তির তিনি হলেন শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ।

কল্যাণ ও সত্যব্রত জীবন পরিচালনার জন্য চাই রাসূলের নির্দেশনা। তাঁর জীবন সৌন্দর্য ও মহৎ রূপকল্প হল মানবতার চিরদিনের স্বপ্ন সম্ভাবনা। ইকবাল তাঁর জাভিদনামায় দেখিয়েছেন কেমন করে রাসূলের আদর্শের সামনে আবু জাহল তার রাজত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। আবু জাহলের কথা ঃ

এই মুহম্মদ আমার বক্ষকে বিদীর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলেছে;
তার নিঃশ্বাস কা'বার জ্বলন্ত প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছে।
তার নীতি রাজশক্তি ও বংশ মর্যাদাকে ধূলি লুণ্ঠিত করেছে,
আরবদের উপর কুরায়েশের আধিপত্যকে সে অস্বীকার করেছে।

তার দৃষ্টিতে উচ্চ নীচে ভেদ নেই–
নিজের ক্রীতদাসের সাথে সে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করেছে।
আরবদের সম্ভ্রান্তির নেই কোন মূল্য তার কাছে;
অথচ কদর্য হাবশীর সাথে তার মেলামেশা।
রক্তবর্ণ আর কৃষ্ণবর্ণে চলেছে মিশ্রণ;
জাতি ও পরিবারের সম্মান আজ বিনষ্ট
এসব সাম্য মৈত্রীর ভড়ং আসলে বিদেশ থেকে আমদানী;
আমি ভাল করেই জানি যে, সলমান একজন মযদকপন্থী ।।

রাসূলের কালজয়ী আদর্শ দেশ, কাল, পাত্রের সীমানা অতিক্রম করে দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য উপযোগী বিবেচিত হয়েছে। তাঁর আদর্শ যেমন পৃথিবীর সব অনাচার বিদূরণের নিশ্চয়তা দিয়েছে তেমন মানবতার অশেষ কল্যাণের আলোক মালাকেও সজ্জিত করেছে। ইকবাল তাঁর কোন কোন কবিতায় মুসলিম মিল্লাতের জন্য, রাসূলের অপরিসীম গুরুত্বকে মূল্যায়ন করেছেন। তাঁর বিশ্বাস–

মিল্লাতের মূল প্রোথিত রয়েছে
রাসূলের আদর্শের মৃত্তিকায়
তিনিই কওমকে শিখিয়েছেন
কানুন ও শৃঙ্খলা।
তিনিই হলেন সকল কল্যাণের উৎস
ঐক্য ও সহযোগিতার বীজ তো
তিনিই লাগিয়েছেন। (রমূযে বেখূদী)

ইকবালের বিবেচনায় রাসূলের প্রতি দরদ ও মমতার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হ'ল তাঁর জীবন ওকর্মের যথাযথ অনুসরণ–

From Iqbal's point of view, the finest expression of love for the prophet is found in immaculate conformity to the latter's way of life and the principles of individual and Social goodness enunciated by him.

(Gawhar-i-Iqbal, Abdur Rehman, Tariq)

এ অনুসরণের প্রক্রিয়াটা কেমন হবে? তাঁর মহৎ জীবনের মধ্যে যে অনুপম চরিত্র মাধুরী সন্নিবেশিত হয়েছে, তার চিত্র জীবনে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলবার মধ্যেই প্রকৃত সফলতা মূর্ত হয়ে উঠবে।

সত্যবাদিতা, সততা, বিশ্বাস, ক্ষমতা, দৃঢ়তা, শক্তি, ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম, বিশ্বজনীন প্রেম এ সবেরই তিনি চর্চা করেছেন আজীবন এবং ইকবাল মনে করেন প্রকৃত মুসলমান এসব গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে উঠবে। তার জিন্দেগীর প্রতিটি মুহূর্ত রাসূল চরিত্রের এই কল্যাণময় দিকগুলি বিবেচনায় নিঃশেষ হবে। ইকবাল তাঁর রমূযে বেখূদীতে মুসলিম জীবনে রাসূলের কল্যাণময় আদর্শের উপযোগিতার স্থান নির্দেশ করেছেন–

অন্তরের ঐক্য হলো মুসলমানের
চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা–
শক্তি হলো অনন্ত সম্ভাবনা
মুমিনের দিল ক্ষমতাধর হয়

রাসূলের শিক্ষার আলোতে
তার দর্শন মিল্লাতের পাথেয়
প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে এ হলো
ঝড়ের মতো।
রাসূলই মিল্লাতকে দেন
উদ্দেশ্যের সততা
একটি সাধারণ লক্ষ্যের জন্য কোরবানী
জন্ম দেয় ঐক্যের
ঐক্য নির্মাণ করে মিল্লাতের।
মুসলিম মিল্লাতের স্থায়িত্ব আসে
ইসলাম থেকে–
এ মিল্লাতেরই গৌরবোজ্জ্বল নেতা হলেন
আমাদের প্রিয় নবী।

সাম্য ও স্বাধীনতা হলো মানুষের মৌলিক অধিকার. কিন্তু এ অধিকার বঞ্চিত মানুষের সংখ্যাই পৃথিবীতে বেশী। যুগে যুগে এ অধিকারহারা মানুষের আহাজারীতেই পৃথিবীতে এসেছে বিপ্লব; সূচিত হয়েছে যুদ্ধ। এ অনাচারের উৎপত্তি স্বৈরশাসক ও দুর্নীতিবাজ ধর্মীয় নেতাদের হাত দিয়ে। ইকবাল মনে করেন রাসূলের আগমন পৃথিবীতে এ অনাচার ও শোষণের অবসান ঘটিয়েছে–

তাঁর বাণী পৃথিবীতে এনেছে যুদ্ধ ও বিপ্লব
বন্ধনহীন নৈতিকতার বিরুদ্ধে হুশিয়ারী;
তিনিই শিখিয়েছেন তরবারী হাতে নিতে
ক্ষমতা মদমত্ত শাসকের বিরুদ্ধে।
তাঁর বাণী হলো জুলুমের বিরুদ্ধে
মানবতার প্রতিরোধের অঙ্গীকার।
মানুষ ছিল মানুষের দাস
জাহেলিয়াতের শৃঙ্খল থেকে বানিয়েছিল পশু
রাসূল নিয়ে এলেন নতুন সূর্যের বার্তা।
তিনি তাঁর কল্যাণময় নেতৃত্বে
মানবতাকে শেখালেন শৌর্য্য;
অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।
তাঁরই কল্যাণ স্পর্শে
ইসলামের ইতিহাস, হলো স্বর্নাভ
দাস পরিণত হল বাদশাহে। (রমূযে বেখূদী)

ইকবাল উল্লেখ করেছেন, রাসূলের জীবন ছিল পবিত্র কোরআনের প্রতিচ্ছবি এবং কোরআনী অনুশাসনকেই তিনি আমৃত্যু যথাযথভাবে অনুসরণ করেছেন।

রাসূলের মধ্যেই তিনি সন্ধান পেয়েছেন আদর্শ মানবের প্রকৃত ছবি; যিনি সকল প্রতিকূলতার মুখে চারিত্রিক স্থৈর্য্য ও অপরিসীম দৃঢ়তার নজীর স্থাপন করেছেন।

ইকবাল এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন– আধুনিককালে ইসলামী সমাজদেহে যে জড়তা ও আবিলতা বাসা বেঁধেছে তার একমাত্র কারণ হলো রাসূলের অমলিন আদর্শ থেকে বিচ্যুত। ইকবাল তাঁর বহুনন্দিত শিকওয়া কাব্যে স্বয়ং খোদার বিরুদ্ধে মুসলিম মিল্লাতের উপর আপতিত জিল্লতির জন্য যে দোষারোপ করেছেন তার উত্তরে মুসলিম মিল্লাতের রাসূল প্রীতিহীনতার উল্লেখ করে খোদা বলেছেন একমাত্র তাঁর দেখানো পথই সর্বকল্যাণের দিকনির্দেশক। প্রকাশের ভঙ্গি বিশিষ্ট ইকবালীয়–

তুমি যদি হও মুহম্মদের প্রেমিক, আমিও তবে
তোমার প্রেমিক হবো;
দুনিয়াতো ছোট, লওহ কলম দেব আমি তোমাকেই
চিরদিন আমি তোমার প্রেমিক রবো। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

ইকবাল ছিলেন রাসূল প্রেমিক। রাসূলের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা তাঁর সর্বকর্মকে করছিল দীপ্তিমান। তার মধ্যেই তিনি অবলোকন করেছিলেন মুক্তির রাজপথ। যে রাজপথ ধরে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন নতুন পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে।

ইকবাল ও নান্দনিকতা

নন্দনতাত্ত্বিক হিসেবে ইকবালের বৌদ্ধিক মনন ও ঋদ্ধশিল্প জিজ্ঞাসা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমকালীন চিন্তার জগতকে অতিক্রম ক.র চিরকালীন জীবনানুভূতির ভাবমৃত্তিকাকে আশ্রয় করেছে। ইকবালের মনন নিঃসৃত নন্দন ভাবনা গভীর স্থায়ী মূল্যে মূল্যবান এবং ব্যাপকতা সন্ধাণী মানবমনের বৃহত্তর চৈতন্যের জগতে উদ্বোধিত। এই গৌরবদীপ্ত মনীষার নন্দন চর্চা তার দীর্ঘ-বিস্তৃত সাহিত্যিক জীবনের বিপুল সবুজ প্রান্তর জুড়ে আমোদিত। তার নন্দন জিজ্ঞাসা মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ জুড়ে বিভিন্ন সাামাজিক-সাংস্কৃতিক পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে বিকাশ লাভ করে। একজন কবি ও শিল্পীর ক্ষেত্রে নন্দন-ভাবনা যেমন জাগ্রত হয় তার কালসীমায় তার পারিপার্শ্বিকও সমকালীন বৈশ্বিক ও জৈবনিক বিবর্তনের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে তেমন নৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক আবেদনের প্রেক্ষিতে ইকবালের যন্ত্রণা-জর্জর মানসিক অবস্থা তার শিল্পচিন্তায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করে। সত্যসন্ধানী মর্মাশ্রিত জীবনের স্পর্শলব্ধ বলে ইকবালের নন্দন ভাবনায় মানবিকতার বৃহত্তর ঐক্য ভাবনার লক্ষণাক্রান্ত সমস্ত গুণ ও উপলব্ধি বর্তমান। এ বিষয়ে তার মনে কোন দ্বিধার প্রশ্রয় ঘটেনি যে, একমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাসসম্ভূত নান্দনিক ক্রিয়া-কান্ডই মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতা দূর করে সমগ্র মানব সমাজকে পরম ঐক্যের সাধনায় নিয়োজিত করতে পারে।

প্রতীচ্যের পুঁজিবাদী সমাজের সীমাহীন ভোগাকাঙক্ষা, বিলাসসর্বস্বতা, উৎকট স্বার্থপরতা ও দুর্লংঘ্য জীবনবোধ এবং প্রাচ্যের স্বাধীনতাহীনতা, ক্ষয়িষ্ণু বিশ্বাসপ্রিয়তা, সংস্কৃতবর্জিত আত্মচর্চা– এক কথায় মানবদর্শাবর্জিত অপচার ও অপঘাত থেকে তিনি এ উপলব্ধিতে ক্রমশ উপনীত হন যে, নন্দনচর্চার লক্ষ্য যদি না হয় ক্রমসম্প্রসারিত চৈতন্যের নৈকট্য লাভ, জীবনের মহৎ লক্ষ্য যদি না হয় তাতে অর্জিত এবং যে শিল্প বিচ্ছিন্ন মানবতাকে এক ঐক্য পতাকার তলে নিবিড়ভাবে আমন্ত্রণ না করতে পারে শিল্প হিসেবে তা অর্থহীন– নান্দনিক বিষয়বস্তু হিসেবে তা ব্যর্থ।

ইকবাল মূলত কবি এবং দার্শনিক। দর্শনের আন্তঃসলিলা অনুভব চেতনা তার কাব্যের শরীরে একাকার, তিনি চোস্ত গদ্য লেখক, বহুভাষা এবং জীবন পর্যটনকারী। ব্যক্তিগত জীবনে আইন বিশারদ এবং উঁচুমাপের রাজনীতিবিদ। একজন ব্যক্তির মধ্যে এত বিপুল এবং প্রসারমান গুণপনা প্রায়শই বিরল।

বাল্যকালে আধ্যাত্মিকচেতনাসম্পন্ন পারিবারিক আবহে তার মানসভূমি প্রস্তুত হয়, নৈষ্ঠিক জীবনের প্রতি তিনি প্রথমাবধি শ্রদ্ধান্বিত। প্রথম যৌবনে ইউরোপ প্রবাসকালে ভোগচঞ্চল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অতি তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষক এবং শেষাবধি বিশ্বের সামনে এক সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শের উপস্থাপন প্রক্রিয়া হিসেবে ইসলামী জীবনাদর্শের জগতে প্রত্যাবর্তন ও স্থিতি।

অতঃপর এই পুণ্য জীবন প্রবাহিত হল শিল্পের লক্ষ্য লোকহিত হওয়া উচিত– এমন ধারা বিশ্বাসের স্বী-করণ আকাঙক্ষায়। ইকবালের মতে, শিল্পীর আকাঙক্ষা বড় কথা এবং এই আকাঙক্ষার সংক্রমণ শক্তির উপর কালজয়ী সাহিত্যের লক্ষণ-নির্ভরশীল। আকাঙক্ষার দীপাগ্নিতে শিল্পী যদি নিঃশেষ না হতে পারেন তাহলে তার সৃষ্টি কেমন করে মানবিক পৃথিবীকে কল্যাণ

দাহনের উৎসবে আমন্ত্রণ জানাবে;

জীবন গীতির সুর বাসনার কেন্দ্রে জাগে।
কেন? কি কারণে ?
যা কিছু সুন্দর, শ্রেয় জানায় পথের বার্তা বিভ্রান্ত বিজনে।
তোমার অন্তর মাঝে অহর্নিশি আঁকে মূর্তি তার,
তোমার অন্তর মাঝে সৃষ্টি করে বহ্নি আকাঙক্ষার,
সুন্দর করিছে সৃষ্টি বাসনার সম্পূর্ণ জোয়ার,
প্রকাশের মুক্তছন্দে অগ্নিশিখা জ্বলে আকাঙক্ষার,
কবির অন্তর মাঝে নেকাব তুলিয়া নেয় সে চিরসুন্দর,
সিনাই পাহাড় থেকে সৌন্দর্যের তীব্র দ্যুতি পাঠায় খবর,
দৃষ্টিতে সুন্দর তার নিমেষে সুন্দরতর, প্রিয়তর অপূর্ব যাদুতে।
বুলবুল শিখেছে গান অফুরন্ত তার ওষ্ঠপুটে,
গোলাবের রক্তাধর বর্ণে তার হয়েছে উজ্জ্বল
তার অনুরাগে জ্বলে পতঙ্গের প্রেমী বক্ষতল,
প্রেম কাহিনীর পটে সেই তো জাগায় রঙ সুতীব্র উজ্জ্বল

(অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

শিল্পী তার শিল্প সৃষ্টি করেন স্বতঃস্ফূর্ত এক ভাবরসাশ্রিত উপলব্ধি থেকে।

শিল্পী সত্য বলে যা মনে করেন, যে বিচিত্র দর্শন তার মনে গভীর রেখাপাত করে নির্দ্বিধায় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তিনি শিল্প কর্মে তার রূপ দেন। ইকবালের দৃঢ় প্রত্যয়, শিল্পীর এই শিল্পসৃষ্টি সৌন্দর্যজাত হলেও তার একটি বক্তব্য আছে। এই বক্তব্যের অকৃত্রিমতা, হৃদয়স্পর্শী কারুকাজই শিল্পকে সর্বলোকাশ্রয়ী রূপ দিতে সক্ষম। যে শিল্প এমনি কোন বাণী বহন করে না কিংবা শুধু লোক নিরঞ্জনের জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সে শিল্পের আবেদন সামান্যই।

শিল্পের বসবাস শিল্পীর মনোভূমিতে। শিল্প ও শিল্পী একই চেতনার দু'টি সমার্থক অস্তিত্ব। শিল্পের স্বতন্ত্র সত্তা নিরর্থক। ইকবাল তাই বিশ্বাস করেন, শিল্পী যদি প্রকৃতির হাতে বন্দী হন তাহলে তার শিল্পের মৃত্যু ঘন্টা আসন্ন। শিল্পীর প্রাকৃতিক বর্ণনা তখন পরিণত হয় বিষণ্ন হলুদ ফুলে। বিবর্ণ চালচিত্রে। প্রকৃত শিল্পী ইকবাল তাই মনে করেন, প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়েই দৃষ্টিনন্দন প্রকৃতিকে অধিকতর মনোহর সমগ্রতায় অধিকতর পরিপূর্ণ করে তুলবে। শিল্পী সৃষ্টি করবেন নতুন পৃথিবী। কবি বহন করে আনবেন নতুন কোন বাণী। কবিরা হবেন জাতির নিদমহলার মুয়াজ্জিন। তার জ্যোতির্ময়ী বাণী নতুন কোন জাগরণের পথদ্রষ্টা হয়ে আসবে। পুরনো পচা নিবীর্য অতীতকে ভেঙ্গে চুরে নব নির্মাণের স্বপ্ন এসে দোলা দেবে। ইকবাল সেই সুন্দর ভবিষ্যতের নীড় নির্মাণ করেছেন ঃ

আজকের শ্রোতা আমি চইনা
আমি আগামী দিনের কবি।
আমার নিজের যমানা আমার গূঢ় কথা বুঝবেনা,
আমার ইউসুফ এই বাজারের জন্য নয়,
আমার গান স্বতন্ত্র এক জগতের
আমার ঘন্টা ধ্বনি অন্য পথিকদের ডাকে। (অনুবাদ– গোলাম মোস্তফা)

ইকবালের মতে, শিল্প আসলে একটি মানসপ্রক্রিয়া। শিল্পী গভীর অনুভূতি ও প্রাণ প্রাচুর্যের সাহায্যে মানব মনের অস্পষ্ট ও ছায়াঘেরা অনুভূতি আত্মস্থ করবেন তারপর সর্বজনগ্রাহ্য ভাষায় সে অস্পষ্ট চিন্তাধারাকে প্রমুক্ত করে তুলবেন। শিল্প সার্থকতা লাভের উপায় হিসেবে কবিমনের উপলব্ধিজাত এই রূপান্তর প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইকবাল মনে করেন, শিল্পীর জীবন ভাবনা যদি অসুস্থ হয়, শিল্পীর ভাববস্তু যদি নিজস্ব না হয় এবং শিল্পী যদি হন পরানুগত– গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ, তবে তার শিল্প সৃষ্টির কলা-কৌশল যত আকর্ষণীয় হোক না কেন তা পাঠক বা দর্শক অন্তরে সাড়া জাগাতে পারেনা।

ইকবাল চিন্তায় শিল্প কখনো পরানুগত দাসত্বের ঘেরাটোপে বিকাশ লাভ করেনা। শিল্পীর আত্মন বিকশিত মর্যাদায় স্থিতি লাভ করেনা। যদি গোলামীর শরীরী উপযোগিতা তাকে রুদ্ধ করে রাখে।

পরাধীন জাতি কখনো ঋদ্ধ বিশ্বাসের উচ্চারণ ঘটায়না। ইকবাল মনে করেন, তাদের প্রশ্বাসে মিশ্রিত যন্ত্রণাজ্জর মৃত্যুরই ঘোলাটে ছবি, তাদের সংগীতে অনুপস্থিত সেই অগ্নিবলাকা যার উদ্দাম ডানায় ভর করে থাকে জীবনের ছবি।

অভিনিবেশ সহকারে বিচার করলে দেখা যায় শিল্প সৌন্দর্য নান্দনিকতা বিষয়ে ইকবালের উপলব্ধি অনেকখানি মানবতাশ্রয়ী। তার মতে শিল্প হবে মানব গৌরবের সহগামী। শিল্প সাহিত্যে থাকবে সকলের প্রবেশাধিকার। শিল্পের প্রকৃতি তুলনীয় বাঁধভাঙ্গা তুফানের সাথে, যে তুফানের তোড়ে সব কিছু মালিন্য ভেসে যায়। কিন্তু জীবন লাভ ঘটে চির নবীনের।

এ পৃথিবীতে কোন কিছুই তাৎপর্যহীন নয়। ইকবালের তাই মত শিল্প সাহিত্য চিত্রকলা মননসৌন্দর্যও লাগামহীন দুর্লক্ষ্য কোন ইশারার সাথে জড়িত নয়। জীবনের পরম অভীপ্সা, জীবনের পরম প্রাপ্তির মধ্যেই এসবের যোগাযোগ ও কার্যকারণ নিহিত। শিল্প সৃষ্টিতে বিষয় গৌরব ও প্রকাশের প্রশ্নে ইকবাল তাই কলাকৈবল্যবাদীদের সাথে সমপূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। ক্রোচে, অস্কার ওয়াইল্ড, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের মতে শিল্প সৃষ্টির পরম লক্ষ্য রস সৃষ্টি। রস সৃষ্টিতে শিল্পী তথ্যকে সত্যবোধের সাহায্যে অনির্বচনীয় আনন্দলোকে পৌঁছে দেন। শিল্পীর অলৌকিক প্রতিভা স্পর্শে তথ্য যখন আনন্দলোকের সামগ্রী হয়ে ওঠে তখনি হয় রস সৃষ্টি। রসবোধের সাহায্যেই শিল্পী আপনাকে প্রকাশ করেন এবং অন্যের অন্তরে সঞ্চারিত করে আনন্দপান। কলা কৈবল্যবাদীদের ধারণা আনন্দই শিল্পী ও শিল্প উপভোগকে এক পরম ঐক্যবোধে আপ্লুত করে। এই ঐক্য ঘটানোর প্রক্রিয়াকে ইকবাল স্বীকৃতি দিলেও শিল্পের ফলশ্রুতি যে আনন্দদান তাকে তিনি অস্বীকার করছেন। ইকবাল শিল্প ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করেছেন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার সাহায্যে। তাই তার কাছে শিল্প সৃষ্টি নিছক আনন্দদানের পরিবর্তে মানব কল্যাণের অনুগামী হয়েছে। যে শিল্প ইন্দ্রিয় চেতনার পরিতৃপ্তি বিধানেই নিয়োজিত তাকে তিনি শিল্পের গুরুত্ব দিতে নারাজ।

ইকবাল তাই শিল্প-সাহিত্য ভাবনায় মোটেই প্রগতিবিরোধী নন। বিশ্বের যাত্রা আজ কর্মের শক্তির উপর এগিয়ে চলেছে। নিপীড়িত পরিশ্রমী মানুষের স্বেদসিক্ত বেদনা থেকে নতুন দিনের জাগরণের আভাস সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।ইকবাল তাই মনে করেন, যে শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দদান তা নিছক সচ্ছল অবসরবিলাসী অভিজাত শ্রেণী সৃষ্ট এবং সে শিল্পের আবেদনও সংকীর্ণ এলিট শ্রেণীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই গৌরবহীন ঢক্কানিনাদিত সাহিত্য শিল্পকে আগামী দিনের বিশ্বের জন্য ইকবাল সম্পূর্ণ অচল ঘোষণা করেছেন। মানবতাবাদী ইকবাল তাই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন তাজমহলের খ্যাতি তার সৃষ্টিতে, প্রকৌশলে, তার রূপের গৌরবে কিন্তু শিল্প

সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে যা প্রধানত স্বীকারযোগ্য সে হল, তার প্রেমের রক্তলেখায় ভালবাসার হীরকদীপ্তিতে। জ্যোৎস্নালোকিত তাজের মর্মরিত স্বপ্নে উজ্জীবিত হয় শিল্পের রহস্য, কারণ তাজের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন সুতীব্র প্রেমের মনমৌজ বলাকা। প্রেম ইকবালের কাছে এক নির্মলিন শুদ্ধতার প্রতীক। যে প্রেম স্থান ও কালের সীমানায় বন্দী নয়। এই প্রেম আমাদের অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। নিঃস্বকে করে ধনী। প্রেম কুৎসিতকে দেয় নির্মলতা, বিশ্বাসহারার জন্য বহন করে জীবনের নতুন অর্থ, এই প্রেম ছাড়া জীবন হল অশ্রুর গহীন অরণ্য। ইকবাল কাব্যে প্রেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এরই মধ্যে বিবৃত তাঁর জীবন বিশ্বাস ও সত্যোপলব্ধি। ইকবাল আকল (জ্ঞান) ও প্রেমের তুলনা টেনেছেন। শিল্পের সাথে দর্শনের পার্থক্যসীমা রচনা করেছেন। ইকবাল মনে করেন, প্রেম যা আমাদের মঞ্জিলে মকসুদে পৌছে দেয় সেখানে জ্ঞান হারিয়ে যায় চোরাগলিতে। দর্শন হল সত্য কিন্তু বিশ্বাস বর্জিত সত্য। হৃদয়ে যখন এই বিশ্বাসের দাবাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে তখনই হয় কবিতার জন্ম। সেই জ্ঞানই বিশ্বভুবনকে নাড়া দিতে পারে যার মধ্যে মিশ্রিত আছে ভালবাসার জ্বালা। ধ্রুপদ বিশ্বাসের অঙ্গীকার। বিশ্বাস বর্জিত জ্ঞান আপেক্ষিক ঃ মানব মনের পুষ্পচর্চিত জমিনে তার প্রশ্রয় নেই। একমাত্র প্রেমই পারে জীবনের চেহারা পাল্টে দিতে। বিশ্বপৃথিবীর নৈবেদ্য নতুন করে সাজিয়ে তুলতে। ইকবাল বলেন, জ্ঞান হল শয়তানের সৃষ্টি, প্রেম মানুষের স্বপ্ন পারিজাত। শিল্প সম্পর্কে ইকবালের এই ধারণা একেবারেই অভিনব এবং তার মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রত্যক্ষ লক্ষণজাত। কবির অন্তর্বেদনাই কবিতার জন্মদাতা এবং কবি অনন্ত পিপাসু নিরন্তর কোন কিছুর সন্ধানী। কবির আত্মা নিয়ত অস্থির, উৎসুক এবং আকাঙক্ষার উদগ্রশিখায় প্রজ্বলমান। কবি অনন্ত প্রত্যাশী, কোন কিছুই তাকে স্থিরতা দেয়না। কেননা স্থিরতা মানেই মৃত্যু। সন্তুষ্টি মানেই আত্মা: রুদ্ধ চিৎকার। সৃষ্টিশীলতার জন্য চাই অনন্ত প্রবহমান গতি। নয়া জি:ন্দেগীর দ্বারভাঙ্গা কলরোল। না পাওয়ার বেদনা কবিকে তাই নিয়ত পীড়ন করে। কবি তা সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেন অন্যের কাছে। কবি চেতনার স্বরূপ যেন ঃ

> The desire of the moth for the star of the night for the morrow
> The devotion to somthing afar
> Form the splure of our sorrow.

ইকবাল মনে করেন অন্তরের এই দিব্য অনুভূতি কবিতার শব্দাবলীতে ঠিক মূর্ত হয়ে ওঠে না। ভাষার এই দৈন্যতা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন ভাষার কঠিন আবরণের অন্তরালে সত্যের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। নিজের মধ্যে সৃষ্ট অনুপ্রেরণা অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করতে না পারার বেদনা তাদেরকে বিচলিত করে। ইকবালের শিল্প সাহিত্য ভাবনায় এ পর্যায়ে ইংরেজ কবি টি এস এলিয়টের ধারণার ঐক্য রয়েছে। তার কবিমনও ভাষার এই অনুপযোগিতায় যন্ত্রণাদগ্ধ হয়ে উঠেছে। যেমন তিনি বলেছেন—

> Words strain
> Crack and sometimes break under the burden.

এ হলো অন্তরের ঐশী দৃষ্টির ভার। শব্দের চিত্র এঁকে এ ভারমুক্ত হওয়া অসম্ভব। ইকবাল ও এলিয়ট দুই বিশ্বাসী কবিই স্বকীয় বিশ্বাসের প্রেরণাকে অন্যে সংক্রমণের এই প্রফেটিক ধারণা পোষণ করতেন। বিশ্বাসী মানুষের এ হলো চিরন্তন রীতি।

শিল্পী হিসেবে ইকবালের এই প্রত্যয়-গভীর এবং সদর্থক ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। আধুনিক শিল্প সাহিত্যের বিমর্ষ পরিণতির জন্য ইকবাল এই বিশ্বাসহীনতার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কবিতার মুখোশধারী ব্যবহার জীবিরাই (pseudo-poets) এজন্য দায়ী বলে

তিনি মনে করেন, আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের এই বিপর্যয়ের ধারণার সাথে ইকবাল ও টলস্টয় সম্পূর্ণ একমত। মানুষের কাছে গভীর আবেদনহীন এই ধরনের মনোরঞ্জক সাহিত্যকে টলস্টয় বলেছেন, Exclusiur Art ব্যতিক্রমী সাহিত্য; ইকবাল যাদের বলেছেন (pseudo-poets) ইকবাল মনে করেন এই ধরনের সাহিত্য শিল্পীরা বিশ্বাসহীনতার প্রশ্রয় দিয়ে জাতির দুর্দৈবকেই ত্বরান্বিত করে। ভারতবর্ষের জন্য ইকবাল তাই এ ধরনের সাহিত্য অপ্রয়োজনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, পরাধীন জাতির জন্য চাই বিশ্বাসের মৃদঙ্গ। ঋদ্ধ জীবনের উত্তাপ। কেননা বিশ্বাসই পারে শিল্পী সত্তার উদার প্রসারণ; শিল্পকর্মের ধ্রুবত্ব প্রাপ্তি। বিশ্বাস ছাড়া যে সাহিত্য তা সংকীর্ণ গন্ডীবদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেয়। শিল্পরসিকের চিত্তকে বৃহত্তর মানব জগতের সাথে সংযুক্ত করতে পারে না। ইকবালের মত তাই টলস্টয়কেও দেখি শিল্পসৃষ্টির মৌল প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছেন মানুষের চিরন্তন ধর্মবোধকে, যা সর্বশ্রেণীর মানুষকে একটি সামঞ্জস্যময় ঐক্যসূত্রে বিধৃত করে।

ইকবাল শিল্পী হিসেবে প্রত্যক্ষবাদী। তার মতে, প্রত্যেক মানুষ এক একজন শিল্পী, পাশাপাশি শিল্পসৃষ্টির এক একটি কার্যকর উপমাও। তার খূদী দর্শনের কেন্দ্রীয় স্বরূপটিও এই মানুষকে কেন্দ্র করে। স্বভাব দুর্বল মানুষকে টেনে তুলে তিনি এক অভাবনীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করার আকাঙক্ষা প্রকাশ করেছেন। তাই মানুষের সমগ্র জীবনও তার কাছে শিল্পরচনার ক্যানভাস। এই সৃষ্টিকর্মে শিল্পী মানুষ, ক্ষুদ্রতার আয়োজন ভাঙতে ব্যস্ত; দেশের সীমানা ডিঙ্গিয়ে দেশাতীত জীবন বিশ্বাসে উদ্বোধিত। ব্যষ্টি চেতনার দ্বার ভেঙ্গে সমষ্টি চেতনায়, একক জীবন বোধ থেকে বিশ্ব জীবনবোধের প্রেরণায় আলোড়িত। ইকবাল তাই ডাক দিয়েছেন অপ্রয়োজনের সাহিত্য ঝেড়ে সর্বলোকাশ্রয়ী মানবহিতকর সাহিত্য প্রসারের। বিশ্বাসহীনতা আজ মানব ব্যবস্থাকে দুঃসহ ক্লান্তি ও অবসাদের দুয়ারে নিক্ষেপ করেছে। ইকবাল মনে করেন, এর পরিণতিতে এসেছে বিচ্ছিন্নতার সুর। ব্যর্থতার বিলাপ। নান্দনিকতার ভুয়া ব্যবহারজীবীদের মনোভাবের কাছে তাই আবিষ্কৃত হয়েছে অপঘাত, যৌনশক্তি, প্রাণধর্মরহিত এক কালচারের স্ফীতি। এই কবি-সাহিত্যিকেরা অসুস্থ জীবনবোধবর্জিত লোকাচারের কথক; এ কারণে এগুলো অর্থশূন্য ও অবান্তর।

আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের এই অবক্ষয় তাকে বেদনার্ত করেছে। তাই তিনি ফিরে যেতে চান আরবের মরুভূর কাছে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কাহিনীর জগতে। সিসিলি দ্বীপে কিংবা কর্ডোভা মসজিদের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা সেই ইটের খিলানের আশপাশে। যে জীবন ছিল সুস্থ সজীব। যে জীবনবোধ সর্বশ্রেণীর মানুষের মনে এক গভীর আবেদন সৃষ্টি করে গেছে এবং আধুনিককালেও তা মোটেই কার্যকারিতা হারায়নি। ইকবালের বাণী মোটেই শুষ্ক নয়; মন ভোলানো ভঙ্গি সর্বস্বতায় তার স্থিতি ঘটেনি। তিনি চেয়েছেন এই উন্মুক্ত প্রসার বলিষ্ঠ জীবনবোধের আলোয় আধুনিক পৃথিবীকে জ্বালিয়ে দেখতে। এই দাহন-পীড়নের অন্তরাল থেকেই জাগরণ ঘটবে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার। মিল্টনের এ উক্তি তুলনীয় ঃ

Methinks I see in my mind a noble and puissant nation rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible locks. Methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid day beam, purging andunsealingher long abused sight at the fountain itself of heavenly radiance.

ইকবালের এ নবনির্মাণ ইতিহাসের পুনরাবর্তন নয় উপরন্তু ঐতিহ্যের উপকরণ ছেনেছুনে ভবিষ্যতের কাঠামোকে দাঁড় করিয়ে দেয়া। ইকবালের কবিতায় এমনি এক ভবিষ্যৎ বিশ্বের চিত্র লক্ষিতব্য। অবশ্যই সে চিত্র একজন ধর্মবিশ্বাসী কবির চেতনা থেকেই প্রতিবিম্বিত। কেননা ইকবাল মনে করেন, বর্তমান দুনিয়ার সমস্যা বহুলাংশেই আধ্যাত্মিকতার সমস্যা এবং এ

কারণেই এ সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হবে আধ্যাত্মিকতার অভাব পূরণের মাধ্যমে। ইকবালের শিল্পী মনে অবশ্য এ বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিলনা বর্তমান বিশ্বের এ সমস্যা সমাধানে মানুষকেই পালন করতে হবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা। ইকবাল নন্দন ভাবনার সাথে দর্শন ও উচ্চতর জীবন নীতির যে অভূতপুর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন তা এককথায় সমকালীন পৃথিবীতে তুলনারহিত। শিল্পী জীবনে ইকবাল মানব জীবন রহস্য ও সৌন্দর্য নিয়ে শিল্প সৃষ্টি করেছেন বিস্তর, কিন্তু সেই শিল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন উচ্চতর নীতি দর্শনের। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে চেয়েছেন, শিল্পের যে বিষয়বস্তু মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তা নীতিধর্মী হওয়া আবশ্যক। এ কথা ঠিক, ইকবাল শিল্প সমালোচক নন কিংবা শিল্প আলোচনায় তিনি তেমন কোন বিশ্লেষণাত্মক ও তথ্যধর্মী কিছু রচনা করেননি। কিন্তু বিভিন্ন সময় তাঁর কবিতায় ও লেখনীতে তিনি শিল্প ও শিল্পীর উদ্দেশ্যের প্রতি ইংগিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

অলৌকিক কর্ম বিনা জাগে নাকো জাতির জীবন।
মুসার আঘাত যাতে নাই তা কবিতা কেমন ?

(অনুবাদ– মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

মুসলিম, খ্রীষ্টান ও ইহুদী ইতিহাসে হযরত মূসার যে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যষ্টির উল্লেখ আছে এবং এর সাথে আল্লাহর এক নবীর যে আধ্যাত্মিক কর্মকান্ডের ইঙ্গিত রয়েছে তার প্রসঙ্গে ইকবাল বলতে চেয়েছেন যে, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত আবেদনকে সার্বজনীন লক্ষণাক্রান্ত দেখতে হলে চাই এমনি উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবননীতি ও দর্শন। কেননা আধ্যাত্মিক নীতি ও দর্শন ব্যতীত সমাজে উদগত হয় দুর্নীতির বিষবাষ্প। ভোগধর্মী জীবন ব্যবস্থা এবং কলুষমান ও দুর্গন্ধবিস্তারী এক সমাজ প্রক্রিয়া। শিল্পভাবনায় এই নীতিনির্ভরতা ইকবালের শিল্পাদর্শকে কি সংকীর্ণতার বৃত্তে সীমাবদ্ধ করেছে? আধুনিককালের অনেক শিল্প সমালোচক এমনি প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু একথা ঠিক প্রত্যেক শিল্পাদর্শ একটি নীতি ও দর্শনের চক্রায়িত রেখাদ্বারা আবদ্ধ এবং প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটির কিছু কিছু বর্জন ও গ্রহণের মধ্যেই সর্বাধিকভাবে পরিপুষ্টি অর্জন করেছে।

এটা জানা কথা, স্বসমাজের অবক্ষয় ও ভোগবাসনায় এতখানি বীতশ্রদ্ধ হয়েছিলেন টলস্টয় যে, পরিণামে তিনি নীতিনির্ভর হয়ে পড়েছিলেন অনেক বেশী। এ কারণে শেক্সপিয়রের অমর সৃষ্টি রোমিও জুলিয়েটকে তিনি কুশ্রী যৌন কদাচার সম্পন্ন সৃষ্টি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং একমাত্র দাযুদের সংগীত (Songs of David) বা ঐ জাতীয় রচনা তার নিকট সত্যিকারের শিল্পের নিদর্শন মনে হয়েছে। সাহিত্যে অস্পষ্টতা এবং সুররিয়ালিজমের ধারণা আধুনিক শিল্পভাবনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সুররিয়ালিজমের মোদ্দা কথা হচ্ছে অপ্রত্যক্ষ অস্পষ্টতার মধ্যে মহৎ ভাবসমূহের অভিব্যক্তির অবকাশ আছে। সুররিয়ালিজমের প্রবক্তারা অবশ্য বলেন, যে ভাব সাহিত্যে স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত তা গভীরতাহীন, ব্যপ্তিহীন। মানুষের অতলস্পর্শী যে অনুভূতি স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন রূপক বা সংকেতের অস্পষ্টতায় তা সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হয়। সুররিয়ালিস্ট প্রসঙ্গে ইকবাল কোন স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেননি। কিন্তু একথা ঠিক, সুররিয়ালিস্টরা শিল্প-সাহিত্যকে বাহন করে তুলতে চেয়েছেন এমন সমস্ত দুরধিগম্য অস্পষ্ট অপ্রত্যক্ষতার গভীরে যার মর্ম পাঠক-জনসাধারণের মধ্যে গুটি কয়েক ছাড়া সাধারণ মানুষ এর রসগ্রহণে ব্যর্থ।

ইকবাল মনে করেছেন, সাহিত্য পাঠক ও শিল্পরসিক হবে সাধারণ মানুষ। সাহিত্যের কাজ হবে এই মানুষের বোধে মননে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়া; মনুষ্যত্বের দীপ্তি দিয়ে নতুন পৃথিবীকে অভিনন্দন জানানো। সুররিয়ালিস্টরা অবশ্যই এমনিতর বৈপ্লবিক চিন্তার প্রশ্রয় দেননা। কলাকৈবল্যবাদীদের সাথে সুররিয়ালিস্টদের এদিক থেকে একটি প্রায় অভিন্ন ঐক্য রয়েছে।

উভয়েই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। ভিন্নতর এক নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের অভীপ্সু। জীবন সমস্যা ও প্রয়োজনের দাসত্ব থেকে মুক্তিই তাদের কাম্য। এ কারণেই কলাকৈবল্যবাদীরা অবকাশতত্ত্ব বলে শিল্পভাবনার নৈতিকতায় যে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন তার উদ্দেশ্য ও মানবের যন্ত্রণাজর্জর জীবন থেকে অব্যাহতি গ্রহণ। ইকবাল এ অবকাশতত্ত্বের ঘোরবিরোধী। কেননা জীবন তার কাছে পিছিয়ে থাকার নয়। জীবনে সমস্যা আছে। সংঘাত আছে। কিন্তু তার থেকে পলায়নী মানসিকতা মনুষ্যজনোচিত বলা যায় না। ইকবাল মনে করেন, সমস্যাকে জয় করাই হল বীর্যতার লক্ষণ। কাটার আঘাতে বিদ্ধ রক্তাপ্লুত যন্ত্রণাজর্জর মানব জমিনে ফুলের সৌরভ বিতরণই তো সাহিত্যের কাজ। আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের এই প্রকৃতি বিচারে ইকবাল আশ্চর্য মুক্তদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শেলীর Defence of poety থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাক ঃ

Poetry thus makes immortal all that is best and most beautiful in the world— ...poetry redeems from decay the visitations of the divinity in man.

The most unfailing herald, companion and follower of the awakeningof a great people to work a beneficial change in opinion or institutions is poetry ....poets are the hierophants of an unapprehended inspiration, the mirrors of the gigantic shadows which futurity cast upon the present ; the words which express what they understand not ; the trumpets which sing to battle and fell not what they inspire the influence which is moved not but moves poets are the unacknowledged legislators of the world.

ইকবাল সাহিত্যে মানব জীবনের দুর্মর সংগ্রাম ও কালজয়ী প্রাণচেতনার জয়গান সবেগে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। কেননা তিনি মনে করেন, কবিরাই মানুষের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মুখপাত্র। কবিরাই তো মানুষের সংগ্রাম হতাশা ও ব্যর্থতার শৈল্পিক রূপ দেবে। নন্দনতাত্ত্বিকরাই মানুষের জীবনের সমস্ত দায়ভার মাথায় টেনে নেবে এবং তারই মধ্য থেকে নন্দনকলাকে বিশিষ্ট মূল্যে মূল্যবান করে তুলবে।

ইকবাল হলেন ভবিষ্যতের কবি। তার কবিতা জীবন সংগ্রামে মানুষের চিরবিজয়ের সুসংবাদ বহন করে এনেছে। পরিপূর্ণ শিল্পকলা, তাই তিনি মনে করেন, মানব জীবন ও সভ্যতাকে পরিপূর্ণ প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যে শিল্পে প্রাণশক্তি অভিব্যক্ত হয় না, যুগে যুগে তা শুধু গতিহীনতার উপাসনা করে এসেছে। ইকবাল তাঁর উদ্দাম জীবনী শক্তিতে সেই গতিহীনতার অনড় মৃত্তিকা ছুঁড়ে ফেলে ভাবীকালের এক সজীব সপ্রাণ গতিশীল নন্দনকলার অভিব্যক্তিতে মানব জীবনকে শাশ্বতকালের উধাও যাত্রাপথে টেনে নিয়ে গেছেন।

ফররুখ কাব্যে ইকবালের অনুরণন

ফররুখ আহমদের কথায়, আল্লামা ইকবাল ছিলেন বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামুদ্দুনিক রূপকার ও দার্শনিক মহাকবি। যার নয়নে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সিকান্দার শাহার দীপ্তি। ফররুখ আহমদ তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' উৎসর্গ করেছেন আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে। যেখানে তিনি এই দার্শনিক কবিকে উল্লেখ করেছেন এক তৃপ্তিহীন সন্ধানীরূপে, যে নতুন পথের মোহে জিন্দেগীর উচ্ছল শিরাজীতে আকণ্ঠ ডুবে আছে।

বস্তুত ফররুখ আহমদের সাথে ইকবালের পরিচয় তাঁর সাহিত্য সাধনার আদিপর্বেই এবং কালগত বিবেচনায় এ সময়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা একদিকে সমগ্র মানবিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, পাশাপাশি বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি তখন নিক্ষিপ্ত হয়েছে এক সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষের লাঞ্ছনার মধ্যে। ফররুখ আহমদের মানবিক মন এ বিপর্যয়ের মুখে বিদ্রোহ করেছে এবং শান্তি ও স্বস্তি খুঁজে পেতে চেয়েছে ইকবালের প্রত্যয়শীলতার মধ্যে। আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্য ও দর্শনের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের প্রতি যে নিকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের বাণী এনেছে ফররুখ আহমদ তাতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং বিশ্বব্যাপী নৈরাজ্য ও বিক্ষোভের দোলার মধ্যে আমৃত্যু ইসলামের শান্তি পতাকাকে স্থির প্রদীপ্ত মনে প্রার্থনা করেছেন।

এ সময় ফররুখ আহমদ আরো একটি ঘটনা প্রবাহে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছেন, তাহলো বহু বছরের পরাধীনতা ও জিল্লতির অপসারণে এ অঞ্চলের মুসলমানদের আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এক তুমুল গণজোয়ার এবং এর প্রাক-প্রস্তুতি ইতোপূর্বেই সম্পন্ন হয়েছিল আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক নির্দেশনা ও 'উনিশশ' চল্লিশের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পেশের মাধ্যমে। দেশ বিভাগের আগে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছিল রেনেসাঁ আন্দোলন এবং এর মৌল উদ্দেশ্য ছিল কাব্য-সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি– এক কথায় জীবনের সমগ্রতায় স্বকীয়তা ও ঐতিহ্যের পরিচর্যা। রেনেসাঁ আন্দোলনের এ বিশিষ্ট চরিত্র ও মৌলিকতা অর্জনের পেছনে ইকবালের কাব্য ও দর্শনের ভূমিকা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল। আধুনিককালে মুসলমানদের হতোদ্যমচিত্ততায় ব্যথিত হয়ে ইকবাল ইসলামের শক্তিমত্তার পুনরুজ্জীবনের যে আশাবাদ উচ্চারণ করেছেন স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রেনেসাঁ আন্দোলনের কাণ্ডারী সৈনিকেরা তার একটি আনন্দিত গতিধারা খুঁজে পেয়েছেন। ফররুখ আহমদ ছিলেন রেনেসাঁ আন্দোলনের সাথে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট এবং এ কারণেই ইকবালের চিন্তা ও দর্শনের ব্যাপকতায় তিনি এত বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতে ফররুখ আহমদ কিভাবে ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী হয়েছেন তারই আভাস দিয়েছেন সৈয়দ আলী আহসান ঃ

"ইকবাল মুসলমানদের নিশ্চেষ্টতা ও হতোদ্যমের যথাযথ চিত্র অংকন করেছেন এবং পতন ও সর্বনাশের জন্যে তার ক্ষোভ নিদারুণ। জওয়াব-ই-শেকোয়ায় যে পথনির্দেশ আছে তাতে ইসলামের চিরশক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ইকবালের নিবিড় উপলব্ধির পরিচয় মেলে। তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন ইসলামের প্রবহমান সত্য এবং কোরানের অমোঘ

সঞ্জীবনী বাণীকে। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অর্থ স্তিমিত-প্রাণ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়, ইসলামের অর্থ শক্তিমত্তা ন্যায়ানুসরণ ও সাধনা। একই সঙ্গে ইকবালের এই বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪১-৪৩ সাল থেকে।..... কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফররুখ আহমদ ও আমি। ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেন ফররুখ আহমদ। তার কাছে পরম মূল্যবান হলো উন্মেষ যুগের ইসলাম। আজ হয়ত বিপর্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে, কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধির পথ প্রথম যাত্রায় উৎসাহ ছিল অদম্য এবং স্বস্তি ছিল প্রগাঢ়। এই হেরার রাজতোরণই তার লক্ষ্য যে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে বিশ্ব মুসলিম ঐক্যবোধ, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি খেলাফতের প্রয়োজন। (ইকবালের কবিতার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

'সাত সাগরের মাঝি' উৎসর্গ ছাড়াও বিভাগ-পূর্বকালেই ফররুখ আহমদ ইকবালের কবিতা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং একই সময় বাংলাদেশে ইকবালের কবিতা ও আদর্শের পরিচয় ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি তাঁর উপর প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। কবি ছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থক এবং তার বিশ্বাস ছিল পাকিস্তান হবে মজলুমানের মন্‌জিল মহীয়ান। পাকিস্তান আন্দোলন যখন তুঙ্গে কবি তখন রচনা করেন তার বিখ্যাত কাব্য পুস্তিকা 'আজাদ করো পাকিস্তান' এখানে তিনি ইকবালের প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন একটি কবিতায় ঃ

উচ্ছল তারুণ্যদীপ্ত পেয়েছিল একদা কামাল,
স্বাধীন স্বদেশভূমি ঐক্যবদ্ধ তুর্কী নৌজোয়ান।
পৌরুষের প্রজ্ঞা প্রাণ তুমি যার গেয়ে গেলে গান
ঘুচায়ে দেশের সীমা ছিঁড়ে ফেলে সময়ের জাল
মুসলিম জাহান মাঝে আজিকে সে হয়েছে উত্তাল
সব শৃংখলিত মনে জেগেছে আজাদ পাকিস্তান
সকল স্থানুর বুক উঠায়েছে আজ সে তুফান
ক্ষুদ্র বালুকণা দেখে বাঁধমুক্ত সাহারা বিশাল।
যে বালুতে কান পেতে আমি শুনি কাসিদা নতুন
বলিষ্ঠ সত্তার মাঝে পাই পূর্ণ ব্যাপ্তির আশ্বাস ঃ
সব মুমিনের ছিল মুস্তফার অটুট ভবন।
ধূলি মুষ্টিকণা মোর লভিয়াছে সমগ্র আকাশ
নির্জিবশিরায় শুনি উজ্জীবিত ঝড়ের স্পন্দন
খুদীর দিগন্তে জাগে জীবনের একাগ্র বিশ্বাস।

(আল্লামা ইকবাল– আযাদ করো পাকিস্তান)

বস্তুত জীবনের একাগ্র বিশ্বাসকে নির্জিত মুসলমানের শিরায় ঝড়ের বেগে প্রবাহিত করার যে স্বপ্ন ইকবাল দেখেছেন ফররুখ আহমদ এ প্রবহমানতাকে অধিকতর দীপ্তিমান করেছেন বাংলা কবিতায়। রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যে স্বকীয় উজ্জীবনের বাণী মূর্ত হয়েছে ফররুখ আহমদ তার শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। এ সময়ই তিনি অত্যন্ত সচেতন প্রয়াসে কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে উদ্যোগী হন, বিশেষ করে মধ্যযুগীয় মুসলমানী পুথি সাহিত্যের মণিরত্ন

বাংলা কবিতায় নতুন বর্ণ, বৈচিত্র্য ও বিভূতিতে মূর্ত করে তোলেন। আরব্য উপন্যাসের সাড়া জাগানো কাহিনী সিন্দাবাদের প্রতীকী উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি আধুনিক মুসলমানের জাগরণ প্রতিষ্ঠা ও বিজয়ের যে শুভ ইঙ্গিত করেছেন তা যেমন বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ ও নজীরবিহীন, তেমনি বাংলা কবিতায় মুসলমানী জবানের শিল্পিত প্রয়োগে তার মনোহরণ সার্থকতা একমাত্র বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথেই তুলনীয়।

সাত সাগরের মাঝিতে যে বলিষ্ঠতা ও প্রাণোচ্ছল প্রবহমানতা মূর্ত হয়েছে এবং যে প্রবলতার সাথে মুসলমানের জড়তাকে ভেঙ্গে-চুরে দীপ্তিমান পৌরুষ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হয়েছে তা কেবল ইকবালের প্রচণ্ড গতিশীলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ইকবাল দর্শনে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং অবিরাম প্রচেষ্টা ও অনবরত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে সফলতা আহরণের কথা ব্যক্ত হয়েছে সাত সাগরের মাঝিতে এসে দুঃসাহসী নাবিক সিন্দাবাদের জীবনে সে বলিষ্ঠতার অঙ্গীকার কেমন ফুটে উঠেছে ঃ

আমরা নাবিক জংগী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যাই টুকরা খড়ের মত।
বজ্র আওয়াজ থামায়ে গভীর দরিয়ায় উঠে চাঁদ
দিলের দুয়ারে মাথা ঠুকে মরে নাবিক সিন্দাবাদ।
ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ
ছিঁড়ে ফেলে আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ।

(সিন্দাবাদ ঃ সাত সাগরের মাঝি)

ফররুখ আহমদের কবিতায় ইকবালের আদর্শ অনুবর্তিতার এ চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবির অনূদিত ইকবালের একটি কবিতা ঃ

দুর্বার তরঙ্গ এক ব'য়ে গেল তীর তীব্র বেগে,
বলে গেল ঃ আমি আছি যে মুহূর্তে আমি গতিমান,
যখন হারাই গতি, সে মুহূর্তে আমি আর নাই।

ইকবালের এই প্রাণবন্যা ও তীর তীব্র বেগ ফররুখের মানসলোকে এক অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে এবং তার রচনায় এনে দিয়েছে অপূর্ব সুস্বাদ ঃ

সে বিপুল প্রাণবহ্নি তবু আজো মরে নাই জানি
হে বলিষ্ঠ! যদি তুমি নেমে এসে এ পথে- বারেক,
এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী
মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি গতিবেগ,
অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে তারা টানি
মৃত মাঠে নিয়ে যাবে সাহারার উদ্যাম আবেগ, (তুফান ঃ সাত সাগরের মাঝি)

ফররুখ কবিতার চেতনা ও মননগতি উপাদান ও উপজীব্য আহরণে যেমনি ইকবালের প্রভাব বর্তেছে তেমনি কবিতার আঙ্গিক প্রকরণ ও রূপকল্প নির্মাণেও তার আবেদন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইকবালের সাথে ছিল ফররুখের চেতনাগত সাযুজ্য এবং সঙ্গত কারণেই তিনি ছিলেন ইকবালের কবিতার অনুরাগী পাঠক, তার চিন্তা ও দর্শনের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং বাংলায় ইকবালের কবিতার সার্থক অনুবাদক। এসব কারণে ফররুখ মানস প্রক্রিয়ায় ইকবালের গতিশীল আবেদন একটি স্থিত রূপ লাভ করেছিল। এছাড়া ইকবাল কাব্যের বিশ্বজনীনতা এবং

তার বিরল শিল্পীজনোচিত প্রকাশভঙ্গিও তাকে প্রলুব্ধ করেছে।

কবিতার আঙ্গিক নির্মাণে ফররুখ আহমদ ইকবালকে অবলম্বন করেছেন সত্য, কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন রূপদক্ষ প্রতিভাবান কবি তাই এ উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও রূপকল্প তার কবিতায় অনুপ্রবেশের আকারে আসেনি। বিশ্বাসের জারক রসে উজ্জীবিত হয়ে কবিতায় অনির্বচনীয় রূপ লাভ করেছে। এখানে দু'একটি উদাহরণ পেশ করা যাক ঃ

আকাশের দীপ্ত বহ্নি তোমার মুষ্টিতে
তোমার চোখের কোণে সমুদ্রের রহস্য অসীম
তোমার বুকের মাঝে সুপ্ত দাবানল
পৃথিবীকে কখন জ্বালাবে? (রাত্রির অগাধ বনে)
তুমি কি শোননি মোর অনাগত মুসার পদধ্বনি
সেই প্রান্তরে উঠিছে আবার ফুটি? (কারিগর)
যেথা শবনম স্বপ্ন শুকায়ে প্রখর তাপে জেগেছে আবার। (কাফেলা)
এ আকাশ মুছে যাক, এ আকাশে এসেছে জীর্ণতা। (জওয়াব)

ফররুখ কাব্যে এ বিশেষ দিকটির দিকে ইঙ্গিত করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আবদুল ওদুদ বিভাগ-পূর্বকালেই উল্লেখ করেছেন ঃ "বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যারা অগ্রগণ্য সাহিত্যিক তারা অবশ্য প্রধানত বুদ্ধির মুক্তিবাদী। তবে মোটের উপর নিঃসঙ্গ সাহিত্যিক। আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ফররুখ আহমদ। তিনি ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেছেন, যদিও ইকবালের দার্শনিক মেজাজ তার নয়। তিনি তরুণ, বিচার-বিশ্লেষণ নয়, সুপরিণতিই আজ তার জন্য কাম্য।

কাজী আবদুল ওদুদের এ বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য মোটেই ভ্রমাত্মক ছিলনা, যদিও নিজে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে ফররুখ আহমদকে আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের অনুগত হিসেবে ব্যঙ্গ করেছেন। ফররুখ আহমদ ছিলেন মূলত রোমান্টিক কবি। প্রাণদ আবেগে তিনি কবিতায় ঝড় সৃষ্টি করতেন কিন্তু ইকবালের প্রজ্ঞা ও দার্শনিক উপলব্ধিজাত চৈতন্য তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকায় কবিতার মর্মস্বরূপে এমনি চেতনার প্রবহমানতা তার কবিতা সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে যায়নি। তাই সাত সাগরের মাঝিতে যে বলিষ্ঠতার আয়োজন আমরা দেখেছি, সিরাজাম মুনীরায় তা পরিণত হয়েছে সূফীবাদের এক অন্তলীন প্রশান্তি ও সুষমায়। রোমান্টিক কবিদের এই এক বৈশিষ্ট্য। ফররুখ আহমদও বোধ হয় পুরোপুরি বাস্তবতাবিমুখ না হয়েও মাঝে মাঝে অবচেতন মনের অতল নিঃশব্দে ডুব দিতেন।

কিন্তু একথা সত্য, ইকবালের বিশ্বাসী মনের প্রতিকৃতিতে ফররুখ আহমদ তারই ইচ্ছার স্বরূপকে উন্মোচন করেছেন। ইকবালের দৃষ্টিতে ছিল ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব, দৃঢ় সংঘবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ এবং এই ইসলামকেই তিনি মনে করতেন সকল নৈরাজ্যের অভ্রান্ত পরিত্রাণকারী। রসূলুল্লাহ (সঃ)-কে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতারূপে বিভূষিত করে তিনি যে অনাগত ইসলামী খেলাফতের স্বপ্ন সম্ভাবনাকে সূচিত করেছেন, ইকবাল বিশ্বাস করতেন, ভ্রান্তি ও দুঃখকবলিত মানবতার কল্যাণ সেখানে দীপ্যমান হয়ে উঠবে। ফররুখ আহমদের মানস প্রক্রিয়ায়ও কি এই উপলব্ধি কাজ করেনি। মানবতার বেদনা ভংগে তিনি সাত সাগর পাড়ি জমিয়েছেন হেরার রাজ তোরণের লক্ষ্যে, যে শাহী প্রাসাদের রোশনি নির্জিত মানবতার ভিড়ে আলো ছড়াবে। আউশ ধানের দেশে কবি যেমন স্বপ্ন দেখেছেন, মদীনার রক্ত গোলাপ তেমনি যুগের সংক্ষুব্ধ বিহ্বলতায় প্রার্থনা করেছেন, উমরপন্থী পথিক যারা উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল'। ইকবালের মানসপুত্র হিসেবে ফররুখ আহমদের বোধ হয় এখানেই সার্থকতা।

নবমূল্যায়নে ইকবাল

কবিরা হলেন শব্দের কারিগর। শব্দের নিঃশব্দ তর্জনী তুলে তারা সৃষ্টি করেন ফুলের বাগান, ফলের বাগিচা, ফসলের মাঠ।

একজন কবি তার সৃষ্টি প্রতিভার কল্পলোক বিহারী স্পর্শে ভাষাকে বিদীর্ণ ও বিচিত্র প্রকাশে করেন মঞ্জরিত। তার সৃষ্টিকাজ মূলত এক মননশীলতার নদী। জীবন বিন্যাসের ছন্দ মধুর রূপায়ণে কুলু কুলু নাদে যা উধাও সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলে। কবির এই কারিগরি দৈবশক্তিজাত, অভিজ্ঞতা রসে মিশ্রিত অনন্ত এবং নিরাবয়ব। কিন্তু কোন কবির সৃষ্টিই তার চারপাশের চক্রায়িত সমালোচনার গন্ডিমুক্ত নয়। পাত্রভেদে উপভোগের রস ও প্রকৃতি ভিন্ন হাতে পারে। সময়ের সৃষ্টিশীল পরিবর্তনে কবি ও কবিতার পুনর্বিচারও সম্ভব এবং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এতসব বিভিন্নতার মধ্যেও এমন কিছু গুণাবলী সপ্রকাশ যা সেই কবির বিশিষ্ট চারিত্র্য-লক্ষণ সূচিত করে এবং সাহিত্যের ইতিহাসে এই লক্ষণই তাকে বিশেষ ভাবমূর্তিতে প্রোজ্বল করে। এই যে চারিত্র্য-লক্ষণ তা হয় দেখা দেয় কবির ভাষায় কিংবা দর্শনে অথবা শৈলীতে। এসব কিছুই অপূর্বতা ও চমৎকারিত্বে এত অভিনব হয়ে ওঠে যে, তখন মনে হয় এসব কিছুই আগে ছিল অনুপস্থিত।

ইকবাল এই মাত্রার কবি। তাঁর কবিতার শিকল ভাঙা গানে শুধু উর্দূ সাহিত্যের পুরনো এসরাজ ভেঙ্গে পড়েনি, বিশ্ব সাহিত্যের শান বাঁধানো পাথর ঘাটায় নতুন দিনের সানাইও বেজে উঠেছে। এই যে কবি ইকবাল মর্মের আলোয় যিনি চোখ ফিরিয়েছেন বিশ্বাসাশ্রিত সত্যে। নিস্তরংগ ক্লৈব্যের মধ্যেও যিনি এনেছেন পুষ্প-পত্রের ইশারা, যুগ ও রুচির অতি অনিবার্য রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে তারও কবিতা পুনর্বিচারের দাবীদার। কবির সাথে তার কবিতার অভেদ্যতা, কবির সাথে তার সমাজের নিবিষ্ট সংলগ্নতাই কাম্য। জীবনশিল্পী ইকবালের জীবন ও তাঁকে পরিবৃত মানুষ, সমাজ ও ধর্মের অবিচ্ছিন্নতা প্রচন্ডভাবে স্ফুটনোন্মুখ। ইকবাল কবিতায় আপন বিশ্বাসের উচ্চারণ ঘটিয়েছেন, প্রমুক্ত আলোতে গোচরীভূত হবে সে বিশ্বাস ছাপিয়ে তাঁর চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে কেমন মিলিত হয়েছে সাধারণ নিষ্পেষিত মানুষ পরিণতিতে জীবনবাদী এই কবির অন্তর্গত সত্তায় অস্তিত্ব লাভ করেছে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকালের প্রবাহে মুক্ত ও মমতাময়ী জীবনের দ্যোৎনা। একথা সত্য, ইকবালের কবিতার শৈলী, দর্শন ও বিশ্বাসের বিস্তার অতি সংহত। মানবীয় উপাদান ও সৃষ্টিধারায় পরিপূর্ণ।

এতদসত্ত্বেও তার কবিতার প্রতি কোন কোন সমালোচকের খন্ডিত বিচার তার প্রতি নির্বিবেচক দৃষ্টিভঙ্গির ফসল ছাড়া আর কি হতে পারে। এটা সম্ভবত তার সমালোচকরা তাকে বুঝতে ভুল করেছেন কিংবা তার প্রতি নিরপেক্ষতার দৃষ্টি কবুল করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। ইকবালের সৃষ্টিধারায় এমনি যে অনাকাঙ্ক্ষিত কতগুলো ভাসমান শ্যাওলা জমা হয়েছে তার আশু বিদূরণ একান্ত প্রয়োজন। আর এটাই হবে ইকবালের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রধান মৌলিক দিক। ইকবাল কাব্য বিবেচনায় এই অশুভ ও ক্লেদপূর্ণ বৃত্তের একটি তালিকা দিচ্ছি।

১. বাংলাদেশের পটভূমিতে ইকবালের উপযোগিতা ঃ বিষয়টি মীমাংসিত হলেও বিতর্কের উদ্ভব বাংলাদেশের অভ্যুদয়কালে। রাজনৈতিক বৈরিতার রাহু ইকবাল চর্চার শুভাশুভ দিগন্তে প্রসারিত এবং পাকিস্তানের সাথে আমাদের রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ভাঙনের মওসুমে সুযোগ

অন্বেষণকারী আত্মবিক্রিত সুবিধাবাদীরা এই মূঢ়তার সংক্রান্তি নির্গমন করেছেন। জ্ঞানী, ধ্যানী ও বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি ইকবালের পরিচয় ও প্রভাব বিমলিন হবার নয় এবং বাংলাদেশে ইকবাল আছেন ঘরে ঘরে, প্রাণে প্রাণে। তাঁর কালাম, স্মৃতি ও শিক্ষার আলো হৃদয়বীণায় সুর ছড়িয়ে চলেছে অহর্নিশ।

২. ইকবাল কাব্যে প্রগতিশীলতা ঃ ইকবাল কি প্রগতিশীল কবি! তাঁর কাব্যের শরীরে এই নৈর্ব্যক্তিক দুর্নীরিক্ষ বিশেষণ আরোপ করা কি যথার্থ, যিনি জীবনকে দেখেছেন বহু বিচিত্রতায়, গতিময়তার একটি ফুল্ল ফসলরূপে। উচ্চ মানবিক ও ধ্যানশীলিত উপলব্ধির মসৃণ মখমল হলো তাঁর কবিতা– জীবনাচরণের বহু প্রসারী দিগন্তের রূপালী কারুকাজ খেলা করেছে তাঁর কবিতার শরীরে। অতি প্রগতির ভন্ডামি থেকে তাই তাঁর কবিতা অনিবার্যভাবে মুক্ত।

৩. ইকবালের ইসলামী মোহাচ্ছন্নতা ঃ বলা হয়ে থাকে ইকবাল এই এক মোহাচ্ছন্নতায়, এই এক যাপিত বিশ্বাসে কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর কবিতায় দেশ, মানুষ তার সমস্যা লুপ্ত। যেখানে ইসলামের পৃথিবী বড় বেশি উচ্চকণ্ঠ ও কোলাহলময়। এর তাৎপর্য অনির্ণিত নয়, কারণ ইকবাল দেশকে ভালবেসেছেন কিন্তু দেশের পূজাকে ঘৃণা করেছেন। আরও একটি দিক লক্ষণীয়, এ অঞ্চলে নাস্তির ধারণা যত বেশি ব্যাপ্ত হয়েছে ইকবাল তত সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। কারণ ধর্মকে যারা ঘৃণা করেন, যারা মনে করেন ধর্ম হল মধ্যযুগীয় পাপ তাদের কাছে ইকবাল কতটুকু গ্রহণযোগ্য– সেটি প্রশ্নসাপেক্ষ। কিন্তু পোড়াবারুদ আর কাস্তের অনুবর্তীরা একটি জিনিস বিস্মৃত হন, পৃথিবীতে ধর্মই মানুষের প্রথম মানবিকতার শিক্ষক আর ইকবালের কাছে ইসলামের এই তাৎপর্যই অধিকতর প্রাণময় ও গতিসঞ্চারী (Living and dynamic)। আরও একটি দিক ভাববার আছে ঃ সাহিত্যের যদি জাতপাত না থাকে আর ধর্মকে নিয়ে যদি বিশ্বের সেরা সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে তবে ইকবাল কেন উপেক্ষণীয় হবেন?

২

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা বলে ইকবালের পরিচিতি সত্য হলেও অপ্রসারী। প্রকৃত অর্থে মুসলিম ভারতের দ্রষ্টা কবি তিনি এবং একই কারণে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বেরও ইংগিতদাতা তিনি। ইকবালের বিপক্ষে প্রচারণাকারীরা বলে থাকেন ঃ ১৯৩০ সালে এলাহাবাদের মুসলিম লীগ অধিবেশনে দেয়া তার বক্তৃতায় উল্লেখিত মুসলিম ভারত পরিকল্পনায় সুদূর বাংলাদেশের কোন ইশারা নেই।

এটি একটি নির্বিবেচক প্রলাপ। কবি যখন এই ধারণা ব্যক্ত করেন তখন সমগ্র ভারতে এটি প্রায় সুদূরপরাহত চিন্তা এবং ভারতে মুসলিম অস্তিত্বের জন্য কওমের নেতৃত্বের কাছে তিনি এই প্রস্তাবনা করেছিলেন মাত্র। এলাহাবাদে দেয়া তাঁর বক্তৃতায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত পাঁচটি প্রদেশ সমন্বয়ে যে রাষ্ট্রটির ধারণা তিনি দিয়েছিলেন তা ছিল পারস্পরিক সাহচর্যে সংগ্রন্থিত একটি অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির নিবিড়তা লাভকারী ইকবাল হয়ত ভেবে থাকবেন যুগপৎভাবে মুসলিম কওমিয়াত ও ওয়াতানিয়াত হিসেবে এ অঞ্চলটির অভ্যুদয় সহজতর হবে। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমি বিচার করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ ছিল একটি বিচ্ছিন্ন একক মুসলিম জনপদ, যার পক্ষে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে অস্তিত্ব লাভ সম্ভব হলেও সহজ নয় মোটেও। ধারণা করতে পারি, কবির কাছে বাংলাদেশ তাই তখনকার মত ছিল অনুচ্চারিত। কিন্তু স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের ধারণা যত এগিয়ে এল এবং একই সূত্রে কবিও যত বেশি ভাবতে লাগলেন তখন তিনি লিখলেন সেই ঐতিহাসিক

চিঠি– কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে মৃত্যুর আগে ব্যক্ত কবির বাংলাদেশ ভাবনা যা লাহোর প্রস্তাব গ্রহণেরও তিন বছর আগে দেয়া–

"শিমালে মাগরেবী হিন্দুস্তান আওর বাঙ্গাল কো হিন্দ আওর বেরুনে হিন্দ কি দোসরী আকওয়াম কি তারাহ হক্কে খোদ এখতিয়ারী সে কেউঁ কর মাহরুম কিয়া জা সেকতা হায়।"

এই যে কবির অভিব্যক্তি যা শুধু ভারতের উত্তর-পশ্চিম কিংবা পূর্বীয় মুসলমানদের জন্যই সঞ্চিত রইল না সারা দুনিয়ার অধিকারহারা মুসলমানের জন্যই উজ্জীবিত হয়ে উঠল। বাঙ্গালী মুসলমান কবির মনোভাবনায় স্থান পায়নি–একথা তাই সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

ইকবালের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগও এই পটভূমিতে। বাঙ্গালী মুসলমানের জাতি হিসেবে স্বকীয়তার সাধনা যখন চলছে, আত্মপরিচিতি ও আত্মআবিষ্কারের মর্মজ্বালা যখন তাদের ধমনীতে রক্তের ফোয়ারা তুলেছে ইকবাল তখন এলেন জীবন জাগার নতুন কাসিদা হাতে। ইকবালের সাথে আমাদের ভাষার দূরত্ব, রুচির দূরত্ব এমনকি ভূগোলের দূরত্বও অনেকখানি। এতদসত্ত্বেও ভাববার মত একটা বিষয়, তাকে আমাদের কখনো দূরের মনে হয়নি; দূরাগত অপসৃত তো নয়ই।

ইকবাল কাব্যে বিশ্বাসের জ্বালা আছে, ধর্মের স্থির সত্যের যে প্রশান্ত নিরাবরণ প্রকাশ ঘটেছে তা আমাদের অনুভূতিতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালে রূপান্তরকালীন সময়ে জাতি হিসেবে আমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার শক্তি যুগিয়েছে। এ কথা কারো অপরিজ্ঞাত নয়, ভারত বিভাগের ফলশ্রুতিই বাংলাদেশ এবং এই যে বিভাগ ইতিহাসে যা রক্তরাঙ্গা হিসেবেই চিহ্নিত, এর মূলে শুধু একটি রাজনৈতিক বিবাদই ক্রিয়াশীল ছিল না, একটি প্রায় সমুচ্চারিত সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বও ছিল অন্যতম প্রধান কার্যকারণ। ১৯৩০ সালের মুসলিম লীগ অধিবেশনে ইকবাল যে দ্বিজাতিতত্ত্বের তথ্য প্রকাশ করলেন তাই ছিল ভারত বিভাগের অংকুর উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ আর মুসলিম সভ্যতার পুনরুত্থানের আকাঙ্খার দলিল।

এই যে দ্বিজাতিতত্ত্ব, এর পরিণাম ও লাভালাভের খতিয়ান হয়ত বিচার্য হতে পারে বিভিন্ন বলয় থেকে। ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক ও প্রকরণে, কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী এই ঐতিহাসিক সচেতনতা, ভারতীয় মুসলমানের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে অন্য এক জাতীয় ঐক্য ও তত্ত্বের মধ্যে মুক্তির প্রশ্রয় খোঁজা, বাঙ্গালী মুসলমানের নির্যাতিত মনকেও একদিন কম্পমান করেছিল। আজ যদি বাংলাদেশ ইতিহাসের এই ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কিংবা এই পুনর্জাগরণবাদী আন্দোলনের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ফলশ্রুতি আহরণে পুরোপুরি ব্যর্থ হয় তবে তার ঠিকানা নির্দিষ্ট হবে এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। বিভাগ-পূর্ব কংগ্রেসের সেক্যুলার আইডিয়া কিংবা আকবর ও কবীরের এ্যাসিমিলেটিভ কালচারের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের উপস্থিতি নেই। নেহরু ও গান্ধী যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার চিত্র আজ স্পষ্ট– অনার্য দলিত হিংসায় উন্মত্ত বর্ণাশ্রিত ভারত। ইকবাল তাই বাস্তব বুদ্ধির খাতিরে প্রচলিত অবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। ভারতের কোন ধর্মাবলম্বী যখন আপন বিশ্বাস ও আদর্শের স্খলন ঘটাতে রাজি নয় তখন বৃহত্তর পরিবেশে সম্মিলিত ভারতীয় হবার আকাঙক্ষা অলীক স্বপ্নমাত্র। ইকবালের পথ ধরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব তাই শুধু একটি রাষ্ট্রনৈতিক পরিকল্পনা নয়। আদর্শিক

পরিকল্পনাও বটে। প্রস্তাবে উল্লেখিত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ভিন্ন ভিন্ন INDEPENDENT STATES-এর উল্লেখ রয়েছে বাংলাদেশ তারই একটি। কবি ইকবালের এ বিপ্লবী ধারণা বাঙ্গালী মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবনে ক্রিয়া করেছিল এবং তার জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা এবং ইসলামী সংস্কৃতি বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ও কবিকৃতি শুধু বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল তা-ই নয়; স্বকীয়তা ও আত্মবিকাশের পথে এগিয়ে দিয়েছিল বহুদূর।

ইসলামের জীবনী শক্তিতে বিশ্বাসী ইকবাল মুসলমানদেরকে ইসলামের সারবান সত্য ও কোরআনের অমোঘ বাণীর অনুসরণ করবার কথা বলেছেন। আহবান করেছেন তিনি ঃ

মুস্তফার প্রতি যিনি ভালবাসা পোষণ করেন
ভূভাগ ও জলভাগ তার আস্তিনে জড়ানো।

আযাদ বাংলাদেশের পটভূমিতে ইকবালের উপযোগিতা বোধ হয় এখানেই।

আধুনিক ইতিহাসে ইসলামী আদর্শের প্রেক্ষিতে ভারত বিভাগ ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন একটি বিরলপ্রজ বিপ্লবী ঘটনা যা থেকে বাংলাদেশ কোনভাবেই বিচ্ছিন্ন থাকেনি। তেমনি জাতিগঠনে ধর্ম যে অতি আবশ্যিক উপাদান– এ কথাও ইকবাল জোরের সাথে বলেছেন। অতি অনিবার্যভাবে বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে ও মননে ইসলাম তার অঙ্গীকার ও প্রত্যয় নিয়েই উন্মেষিত। ইসলামেই সমাহিত তার অনুভব, আকুতি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার। বাংলাদেশে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ও প্রেরণার দীর্ঘ মিছিলে বুদ্ধিবাদী ইকবালের আহবান তাই সমভাবে ক্রিয়াশীল। অতীতের মত বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ পথ নির্মাণেও ইসলামী আদর্শ হবে তার তেজের তলোয়ার এবং চারিদিকের অপ্রেম ও নির্মানবিকতার প্রত্যুত্তর। ইকবাল এই বিপ্লবের কান্ডারী এবং সেই সূত্রে বাঙ্গালী মুসলমানের এই বিপ্লববাদেরও অগ্রনায়ক।

৩

ইকবালকে যখন প্রগতির বিপক্ষে দাঁড় করানো হয় তখন স্বাভাবিকভাবে প্রগতিশীলতার সদর্থক মহিমা আমাদের কাছে ম্লান মনে হয়। জীবনের বহু বিচিত্র এবং অনন্ত সৃষ্টিশীলতার ভাষ্যকার যে কবি তার মনন ও ঋদ্ধচিত্তের তৃতীয় স্তরে বসে নব আবিষ্কারের নেশা আমাদেরকে স্পর্শ করে।

এটা বলা অসঙ্গত হবে না, ইকবাল আজ দ্বিমুখী সমস্যার সম্মুখীন। তাঁর ভক্তের সংখ্যা যেমন সুপ্রচুর, তেমন তার অপরিণত সমালোচকের সংখ্যাও কম নয়। ইকবালের দুর্ভাগ্য, তাঁর ধ্যান ঋদ্ধ মননের কাছাকাছি আবেগ নিরাসক্ত খাঁটি সমঝদারের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। একদিকে প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধ ভক্ত যারা সর্বতোভাবে প্রগতির বিপক্ষে এবং নতুন সৃষ্টি ও নির্মাণেরও বিরোধী, সচেতন কিংবা অবচেতন অস্তিত্বে কবির বাণীর তাৎপর্য ও গতিময়তাকে স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সংকীর্ণতার চোরাগলিতে ঠেলে দিচ্ছে, অন্যদিকে একশ্রেণীর প্রগতিজীবী উন্নাসিক বুদ্ধিবাদীর দল তাঁকে চিহ্নিত করেছে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে। তাদের বিবেচনায় ইকবালের কবিতা পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন (POETRY OFESCAPE)। ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে তারা তাদের এই অভিযোগ উত্থাপন করেছেন কবির বিশিষ্ট চিন্তার অনুসৃতি থেকে। তাদের ধারণা, ইকবাল এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কবি এবং তার কবিতা সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিরচিত হওয়ার পরিবর্তে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্যই নিবেদিত হয়েছে। তিনি এমন এক

সংস্কৃতির পুনরাবর্তন করেছেন যা ইতিহাসের গর্ভে চাপা পড়ে আছে। পাশাপাশি তিনি তার সম্প্রদায়ের এমনকি বিশ্ব মানবেরও কল্যাণ প্রার্থনা করেছেন এমন এক গ্রন্থে যা মধ্যযুগীয় ধূলায় পরিকীর্ণ।

দুই দিগন্তের দুই বিপরীত বলয়ের পরিচালিত বৈরিতা থেকে এই মহান কবিকে মুক্ত রাখতে হলে প্রয়োজন তার জীবন দৃষ্টি ও জীবন ভাবনার সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন, পাশাপাশি আধুনিক সমস্যা ও সংক্রান্তির প্রেক্ষিতে তার দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিচার। কিন্তু এর চাইতেও যেটি সবচেয়ে জরুরী তা হলো প্রগতির একটি সংজ্ঞা নিরূপণ যার সাম্যাবস্থা তর্কাতীত। ভাবলেশহীন সর্বপ্রকার আবেগের অতীত যে প্রেক্ষিত ও মানদন্ডে আমরা এই মহান কবি, ঋষি ও ধ্যানীকে বিবেচনায় আনতে পারি। অস্বীকার করবার উপায় নেই, এটি একটি কঠিন প্রক্রিয়া এবং প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ বিশ্বাস ও প্রতীতিকে প্রগতিশীল বলে দাবি করতে পারে এবং তার বিশ্বাসের বলয়-বহির্ভূত যারা তাদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে চিহ্নিত করাই স্বাভাবিক। একজন আধুনিক ইকবাল গবেষকের মতে প্রগতির জন্য প্রয়োজন তিনটি বৈশিষ্ট্যের–

....the three qualities which genuine "Progressivism" postulates—a faith in the ultimale goodness of human nature and the consequent belief that life is worth living and striving for, a breadth of outlook and sympathy which refuses to be bound by racial, geagraphical and sectarian differences and an active identfication of the self with the causes of social justice and a willingness to strive for them to the best of ones obility.

(Progressive trends in Iqbal's thought, K.G. Saiydain)

প্রগতিবাদী হবে সে-ই যার মননের প্রসারতা ও অনুভূতির প্রাবল্যে ধরা দেবে সমাজ ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সমস্যা ও বিচ্যুতি। প্রগতির স্বার্থে ব্যক্তির সংকীর্ণ প্রাকারবদ্ধ চেতনার অন্তর্ধানই আবশ্যক। কিন্তু অবশ্যই সেটি যেন পরিণত না হয় কাগুজে দর্শনে (VISUALIZATION) কিংবা মানবিকতায়। উপরন্তু শেষ বিচারে বিস্রস্ত মানুষের দুঃখ-সুখের সমভাগী হওয়াই বড় কথা এবং তাদের প্রয়োজনে দ্রুত উৎকর্ষিত সাড়া ও সেবা প্রদানের মধ্যে তার অন্তর্গত চেতনা ও কল্যাণকামিতার একটি প্রোজ্জ্বল রূপ পরিগ্রহ করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই প্রসারী মনন ও জীবনানুভূতি যেন কোনক্রমেই বাধাগ্রস্ত না হয় সম্প্রদায়ের কিংবা ভূখন্ডের বেড়াজালে; বরং মানবিকতার এই পরিচর্যা চলবে বিশ্বজুড়ে বাধাহীন নির্মোহ স্রোতের কুলুকুলু ধ্বনি তুলে। প্রগতি মানেই এক অর্থে মননের চর্চা। কল্যাণকামিতার মেলবন্ধন। (ALL true Progress is a Progress in Charity) যদি তা-ই হয়, প্রগতিবাদী হবেন সেই নগরের অধিবাসী যার তোরণদ্বারে প্রবেশাধিকার তাদের জন্যই সীমাবদ্ধ সংস্কৃতঋদ্ধ, দরাজ দস্ত ও মুক্তপ্রসারী জীবনের উদ্বন্ধন যাদের লক্ষ্য। স্বীকার করি, পৃথিবীর নানা স্থানে চলছে নানা রকম গতিবিন্যাস, প্রগতির ভিন্ন ভিন্ন উৎকর্ষ সাধন। উৎপাদনের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের দ্রুতগতি এবং মারণাস্ত্রের অশেষ গতি ও প্রগতির নানা রূপ ও প্রকৃতি বটে, কিন্তু তাতে আছে নির্মানবিকতার সারমেয় যার প্রসারী দন্ত মানবতার জমিনে খুন ও অশ্রুর ক্রীড়া কেলিতেই উল্লাসী। যদি কোন দিন (এবং ইতিহাসে যার উপমা ভুরি ভুরি) এমনি ক্রুর পিশাচের হাতে ন্যস্ত হয় ক্ষমতা, পৃথিবীর গতি যদি টেনে ধরে অজান্তেই তাহলে সেদিন আবার দেখব বৈজ্ঞানিক কারুকার্য– যা আধুনিক সভ্যতার অবলম্বন তাই হবে মানবতার অশ্রু ও কারুণ্যের নিষ্প্রাণ ছবি। সত্য বটে, প্রযুক্তি যদি মানবিকতার চর্চা ব্যতীত অনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে তবে তা বিশ্বমানসের জন্য বিষবৃক্ষের ফল উৎপাদন ব্যতীত আর কি করতে পারে। অনিবার্যভাবে প্রগতির দাবিদার যে কেউই হোক না কেন তাকে এই প্রসারী জীবনবোধের অঙ্গীকার করতে হবে। প্রয়োজন হবে তার

কল্যাণকামিতার অনুজ্জ্বল দীপালোকিত ঘর উজ্জ্বল দীপমালায় সজ্জিত করা এবং সেই ঘরে ভূগোলের বন্ধনছিন্ন বিশ্বজনীনতার উদার হওয়ার প্রবেশ করানো। প্রগতির বিপক্ষে ক্রিয়াশীল শক্তি হচ্ছে অনুদার, সংকীর্ণ চিত্ত দৃষ্টিহীন জীবনবোধ। গোষ্ঠীপ্রীতি আর সহিষ্ণুতা বর্জিত মূল্যমান এক কথায় যা কিছু বিভাজিত, খন্ড খন্ড করে মানবতাকে পরিণতিতে হিংসায় উন্মত্ত, সাংঘর্ষিক চিত্রমালায় পরিপূর্ণ এক পৃথিবীর চেহারা প্রকটিত করে আমাদের সামনে। অন্যদিকে যে শক্তি অপূর্বলীলা ও কারুকার্যে গতিময়তা ও আন্দোলনের প্রাণদ আচড়ে প্রসারিত হয় জীবন ভাবনা, ভেঙ্গে পড়ে সংস্কার ও বুদ্ধিহীনতার দেয়াল এবং চিরায়ত মানবিক ক্রিয়াকর্মের হয় উজ্জীবন আমরা বলতে পারি তাই ঋদ্ধ সংস্কৃতি ও প্রগতিবাদিতার ঠাসবুনুনীর রসদ যোগায়। মানবতার জন্য আল্লাহর এই অনন্ত কল্যাণকামিতার (Purpose of God for man) বিপক্ষে দাঁড়াবার মত বড় কোন অপরাধ এ বিশ্বে নেই।

প্রগতিবাদীর এই কেন্দ্রীয় অনুভব ও অনুসিদ্ধান্তের পাশাপাশি প্রয়োজন সামাজিক ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ পরিচালনা করা। মানবতার ইতিহাস দুঃখ বিস্রস্ত, বেদনা করুণ নৈরাজ্যিক রক্তধারায় পরিপূর্ণ। সেই দুঃখ স্রোতের মোকাবেলায় এ যাবৎ চলছে শুধু সীমাহীন তিতিক্ষার পরীক্ষা, সমাজকর্মী, ধর্মনেতা ও রাজনৈতিক যোদ্ধা একযোগে, একধ্যানে এগিয়ে চলেছেন মজলুমের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায়; ইনসাফের মেঘমুক্ত নির্মল আকাশের সন্নিধানে। কিন্তু তবুও এ পীড়ন রুদ্ধ হয়নি। ধনী শোষণ করছে গরীবকে, পুরুষ নারীকে, অত্যাচারের স্টীমরোলার আছে অধিকতর শক্তিশালী পীড়ক জাতির হাতে কিভাবে গরীব দুর্বল জাতিসমূহকে ধূলি মাটিতে নিঃশেষ করে দেয়া যায়। বড় বড় যুদ্ধ যা ইতিহাসে খুন ও অশ্রুর দরিয়া সৃষ্টি করেছে মাত্র তার উদ্দেশ্য শুধু মানবতার বিশেষ অংশের স্বাধীনতা হরণ। ধর্মের নামে যুদ্ধ-বিভিন্ন সময়ে যা খোদা প্রেমের নামে নিছক মানবপীড়নের রাহুগ্রস্ত বরকন্দাজ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেকালের দাসপ্রথা একালের শ্রেণী সংগ্রাম যা কি-না পুঁজিবাদী নৈরাজ্যের বিষফল এবং সম্পদ কুক্ষিগতকরণের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া-এসব কিছুই ইতিহাসে বেইনসাফী ও জুলুমের এক-একটি দানব মুখব্যাদান করে আছে। আশার কথা এই, সামাজিক দানবের মোকাবেলায় যুগে যুগে আমরা কল্যাণকামিতার বহুপ্রসারী মননেরও প্রশ্রয় পেয়েছি এবং তারা সেই ক্ষুদ্র জনতা যারা জুলুম ও বেইনসাফীর বিরুদ্ধে ক্ষুরধার তরবারী শাণিত করেছেন। যে কোন অর্থেই তাদেরকে আমরা প্রকৃত প্রগতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। আধুনিকতার বেদনাবিধুর অনালোকিত দিকটি বোধ হয় এখানেই ঃ কারিগরী ও বাণিজ্যিক প্রসার এবং স্ফীতির সাথে কায়েমী স্বার্থের ধ্বজাধারী বিশেষ গোষ্ঠী ও ব্যক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে যাদের কারণে পৃথিবী আজ বিভাজিত। ধনী ও দরিদ্রে, শোষক ও শোষিতে। তাই প্রগতিবাদীর নিশ্চিত লক্ষণ হচ্ছে মরিচা ধরা, জুলুমবাজ সামাজিক গঠন কাঠামো উপড়ে ফেলে নতুন পৃথিবী নির্মাণের প্রতিভূ হওয়া।

সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য যা প্রগতিবাদীর চারিত্র্যবিন্যাস ও উপস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে তা হল ঃ এক অনির্বাণ বিশ্বাসের দাবদাহন যা শুধু তাকেই পীড়ন করে না। তার থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি সমাজের প্রতিকেন্দ্রে, জীবনের প্রতি স্পন্দনে আগুন ধরিয়ে দেয়। জীবনে বিশ্বাস, মানুষে বিশ্বাস, মানুষের অনন্ত কল্যাণ সম্ভাবনায় বিশ্বাস এবং তারই পাশে মিথ্যা আর জালজুয়াচুরির উপর সত্য ও ন্যায়ের চিরদিনের বিজয়ে আশাবাদ পোষণ করাই হল প্রগতিবাদীর মর্মরিত অনুভব ও অনুধ্যান। এ বিশ্বাস নৈর্বক্তিক নয়। নৈরাশ্যবাদীর দুর্নীরিক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন আশাবাদও নয়, জীবনের তাপদগ্ধ মসলিনের আলোতে দেখা বর্ণমুখর গন্ধমুখর চিত্রাবলী। প্রগতিবাদীর নেই সংশয়। মরুরুক্ষ কাঠিন্য আর দানবিক পেলবতা নিয়ে যে জীবনের বাস্তবতা তাতেও নেই উপেক্ষা। বিশ্বাস তার এমনি প্রকটিত জীবনের গভীরতা ও উত্তাপের আশ্লেষে তা এমনই অজেয়, নৈরাশ্য

ও বেদনার কাদাজল, অবহেলা আর অশ্রুর দরিয়া পার হয়ে যায় সে নিমেষে। প্রগতির এই বহু পল্লবিত বৃক্ষ শাখার তলে দাঁড়িয়ে আমরা এখন নির্মাণ করব ইকবালের সৌরভীকুঞ্জ।

৪

ইকবাল কাব্যের মর্মরিত বীণায় কিসের ছন্দ বেজে উঠেছে। কবিতা যদি হয় ভাষার ভিন্নতার বিন্যাস এবং সেই বিন্যাসের নিভৃতে যদি থাকে জীবনের অবিচ্ছিন্ন অসীমতা এবং অনন্ত উৎসের অবগাহন তবে ইকবালের পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে এই পটভূমি অবশ্যই স্মরণীয়, কারণ এর মধ্যে যথার্থ পরিমাপের লক্ষণাবলী উপস্থিত, কবিতার মধ্যে মানুষ খুঁজে পায় তারই অন্তর্গত সত্য, তার দুঃখ-বেদনা, জয়-পরাজয়, আশা-নিরাশার ইতিবৃত্ত। এক যুগে লোক কবিতার গজদন্ত মিনারে উঠে জীবনবিচ্ছিন্ন আনন্দলোকের সৃষ্টি করত; সেই পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার ছিল না পীড়িত মানবতার। মানব সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে, জাতির সাংস্কৃতিক ও রুচিবোধের রূপান্তরের স্রোতে সে যুগ হয়েছে বাসি। সে যুগের কবি ও কবিতার পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস করার জন্য নতুন প্রস্তাব এসেছে এবং বর্তমান প্রজন্মে কবিতার নিরীক্ষণ শুরু হয়েছে নতুনভাবে। কবিতা আজ মানুষের কণ্ঠলগ্না প্রেয়সী, জীবন-জীবিকার সংগ্রাম ক্ষুধা ও প্রেমের নিয়তবাহী ঝড়ে কবিতা এক ঝলমলে প্রোট্রেট।

এ কথা সত্য, কবি তার কবিতা সৃষ্টি করেন মনের গহীনে। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন প্রত্যক্ষভাবে তিনি যে সমাজের অংশীদার তার থেকে। কবির কবিতা তার সমাজের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও রূপ প্রকাশ করবে– এটাই স্বাভাবিক। লিখন শৈলীর অফুরন্ত সমৃদ্ধির সাথে জাতির একটি সাধারণ প্রবাহ তাতে ফুটে উঠবে। তবে মহৎ কবির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হবে তার কবিতার আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে। ক্ষুদ্রতাকে অভিমুখীন করতে হবে উৎকর্ষিত জীবন বৃক্ষের দিকে, জাতিগত লাঞ্ছনা ও সংগ্রামের ইতিবৃত্ত দুঃখ-সুখ আর আবেগের স্রোতধারা প্রবাহিত করতে হবে বৃহত্তর মানব সংস্কৃতির সাগর সঙ্গমের দিকে এবং তিনি যদি এই কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন সাফল্যের সাথে, স্বীকৃত হবেন তিনি মহৎ জীবনবাদী কবি হিসেবে। প্রগতিবাদী কবির অঙ্গীকার বোধ হয় এখানেই। নিছক সৌন্দর্য তাত্ত্বিক উপলব্ধি নয়। জীবনবাদী বিশ্বাসের অনুসৃতি হবে তার কাম্য। পৃথিবীর দেশে দেশে যেখানে জুলুম ও বেইনসাফীর ওঙ্কার উচ্চারণ ধ্বনিত হবে কবি ছুটবেন সেই দেশে ভূগোলের সীমানা পেরিয়ে মানবতার এই লাঞ্ছনায় তিনিও শরীক হবেন প্রতিবাদের মিছিলে। নির্মানবিকতার অন্ধকার ঠেলেঠুলে নির্মাণ করবেন তিনি জীবনের বিশ্বাসের কল্যাণকামিতার নতুন তাজমহল।

ইকবাল এ ধারার কবি। জীবনের বহুবিচিত্রতা ও অফুরন্ত সমৃদ্ধির ঘোষক তিনি। তার কবিতা সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক কারুকর্মের এক হৃদয়ধর্মী ম্যানিফেস্টো। প্রগতি ও আধুনিকতার উপরোক্ত পটভূমিতে তিনি এক প্রত্যয়শীল জীবন্ত চরিত্র।

ইকবালের বিবেচনায় সাহিত্য হচ্ছে সেই শক্তি যা জীবনের সমগ্রতাকে প্রকাশ করে একক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে। জীবনের মহৎ মানবতা ও ঋদ্ধ অনুধ্যানকে উজ্জীবিত করে নবস্বপ্নের দোলাচলে; একই সাথে মূর্ত করে তোলে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের বহমান স্রোতধারাকে। ইকবাল তাই মনে করেন সাহিত্য শিল্পকলার উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের অনন্ত উৎসের অনুসন্ধান। অপূর্ব বৈশিষ্ট্যাশ্রয়ী ভাষায় তিনি কেমন প্রকাশ করেছেন জীবনের সেই নিগূঢ় মর্মার্থ–

জানি তুমি বুদ্ধিমান তীক্ষ্ণদৃষ্টি সন্দেহ তো নাই,

বাস্তবের জ্ঞান তবু তোমাতে কি জাগিয়াছে ভাই?
উদ্দেশ্য শিল্পের হবে অন্তহীন প্রমুক্ত জীবন
ভস্মমুখী স্ফুলিঙ্গের জন্য নয়, কাব্য কুঞ্জবন।
ওগো বৃষ্টি, ফলাইবে শুক্তিগর্ভে কেন সে মুকতা?
যদি সেনা আনে হৃদে সমুদ্রের দুরন্ত মত্ততা।
সে নয় কবিতা বন্ধু গান তাহা নয় কভু নয়
শুষ্ক হয় ফুলবন যে বাতাসে সেকি গো মলয় ?
অলৌকিক কর্ম বিনা জাগে নাকো জাতির জীবন,
মুসার আঘাত যাতে নাই তাহা কবিতা কেমন? (অনুবাদ– মনিরউদ্দীন ইউসুফ)

যে কবিতার প্রাণ স্পর্শে আলোড়িত হয় না হৃদয় , সমুদ্রে ওঠে না ঝড়– ইকবাল প্রশ্ন করেছেন সেই কবিতার কুঞ্জবনে কি প্রয়োজন মানুষের। চাই সে কবিতা যার অপূর্ব জীবনীশক্তিতে উত্থান ঘটবে মৃত মানবতার নৈরাশ্য ও জড়তার প্রাচীর ভেঙ্গে খান খান হয়ে পড়বে। কবিতা আর নয় জীবন বিচ্ছিন্ন ড্রয়িংরুম বিহারিণীর বিলাসী উপকরণ । কবিতা এখন জীবনের ঝলমলে তেজীয়ান বৃক্ষ। কর্মের সহিষ্ণুতার ও সংগ্রামের নির্ভেজাল প্রতীক। আসরার-ই খুদী কবির সেই জীবনবাদিতারই ঝ`ক ঝ`কে নুড়ি পাথর–

গোলাব তুলেছো তুমি ইরানের শত গুলবাগে
দেখেছো ইরানে, হিন্দে অপরূপ সৌন্দর্য বিথার,
মরুভূর খরোত্তাপ অনুভব কর একবার।
প্রাচীন খর্জুর সুরা একবার কর তুমি পান,
তোমার শিয়রে তার তপ্ত বক্ষ হোক উপাধান
সমর্পণ কর তনু আজ তার উত্তপ্ত হাওয়ায়।
রেশম বিলাসী তুমি, ঠাঁই নাও অমসৃণ কার্পাস শয্যায়।
পুষ্পের কোমল পর্ণে নৃত্য করিয়াছ তুমি বংশ পরম্পরা,
কোমল শিশিরে ওষ্ঠ সিঞ্চন করেছ তুমি ওগো রক্তাধরা,
জ্বলন্ত বালুর পরে ছুড়ে ফেল আজ আপনারে,
ডুবে যাও, ডুবে যাও জমজমের পুণ্য উৎসধারে।
বুলবুলের মত তুমি কেঁদে যাবে কতকাল কান্না ব্যর্থতার
কতকাল রবে তুমি বিলাসী বাসিন্দা বাগিচার।

বাঁধো নীড় পর্বতের উন্নত শিখরে
বিদ্যুৎ-বজ্রাগ্নি ঘেরা সুদুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড়,
ঈগলের নীড় ছেড়ে আরো উর্ধ্বে আরো উর্ধ্ব স্তরে,
যেন যোগ্য হতে পার জেহাদের– এই জিন্দেগীর
তোমার তনু ও আত্মা দগ্ধ হতে পারে যেন এই
প্রাণ বহ্নির উপরে। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

বছরের পর বছর ধরে প্রাচ্যের মানুষ গোলামীর বিষফল ভক্ষণ করে চলেছে। তারা হারিয়েছে জীবনের গৌরব। লুপ্ত এখন তাদের সৃষ্টির অঙ্গীকার। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক জীবন বিন্যাসে অনুপস্থিত তাদের ভূমিকা। এই অবক্ষয় ও বদনসিবী শুধু তাদের রাজনীতিবিদ ও রাষ্ট্র নেতাদের আক্রান্ত করেনি। কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের মনন ও বোধেও ভাঙন ধরিয়ে

দিয়েছে। তারা এখন জঙ্গে আযাদীর মাঠে ইনসাফের জন্য, ইনসানিয়াতের জন্য খুন ঝরাতে রাজি নয় একটুও। গোলামী ও ভীরুতাকে আকর্ষণীয় ও উদ্দীপক করে তোলাই তাদের সাহিত্য ও শিল্পকলার উদ্দেশ্য–

দার্শনিক, কবি ও বুদ্ধিজীবী
আটক এখন সবাই গোলামীর জিঞ্জিরে
যদিও এ যুগ নয় শূন্যতার।
কিন্তু এই ভাল মানুষের দল
যারা ছিল এক দিন বুদ্ধির ইজারাদার
তাদের উদ্দেশ্য আজ একটি।
(কিসেরই উদ্দেশ্য?) সিংহকে পরামর্শ দেয়া
হরিণীর মত পলায়ন এবং তার সাহসকে
গুপ্ত রাখা বিস্মৃতির অন্ধকারে।
যদিও তারা ভান করে সমস্যা সমাধানের (ধর্ম, দর্শন ও শিল্পকলা)
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা
নিয়োজিত গোলামের সমুখে গোলামীকে আকর্ষণীয় করা।

এমনি যে কবি জীবনের সৌরভ সুন্দর কল্যাণের কথা বললেন, মানুষের অনন্ত সাফল্যের ইংগিত করলেন হৃদয়গ্রাহী ভাষায়, বললেন মানুষের চিত্তোত্থানের কথা কি করে তাকে প্রগতিহীনতার পক্ষে প্রত্যয়ন করা সম্ভব। যার কবিতা গোলামী ও ভীরুতার বিরুদ্ধে বর্ষমুখ, দুনিয়ার তাবৎ দুর্গত দীন-দুঃখীর স্বপক্ষে যার লেখনী ঝলসে ওঠে তরবারীর মত, বাজের সমুখে যিনি ভাঙ্গিয়ে দেন চটকের ভয় কিংবা যে কবি জালিমের শস্যাদি পুড়িয়ে দেয়ার আহবান জানান যেখানে নেই মজলুমের অংশীদার, তিনি কি করে প্রতিক্রিয়াশীল হতে যাবেন। খোদার ফরমান কবিতায় তিনি যখন ভবিষ্যৎ বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলেন–

ওঠ, দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।
কর– ঈমানের আগুনে তপ্ত গোলামী খুন,
বাজের সমুখে চটকের ভয় ভাঙ্গিয়ে দাও।
ঐ দেখ আসে দুর্গত দীন দুখীর রাজ,
পাপের চিহ্ন মুছে যাও, ধরা রাঙ্গিয়ে দাও।
কিষাণ মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।
স্রষ্টা ও তার সৃষ্টির মাঝে কেন আড়াল?
মধ্যবর্তী মোল্লাকে আজ হাঁকিয়ে দাও। (অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

কবির এই বিশ্বাস আরো প্রখর হয়ে ওঠে যখন তিনি ডাক দেন সাধারণ মানুষের পরিবর্তে সাহিত্য ও শিল্পের রূপকারদের যারা জীবনেরই ভাষ্যকার, যাদের তুলিতে উঠে আসে জীবনের সত্য। কবি মনে করেন মহৎ শিল্পের কখনো উদ্ভব ঘটে না সস্তা বিলাসিতা ও পলায়নী আবেগের মৃত্তিকায়। তার জন্য চাই খুন ও অশ্রুর কাদাজলে মানবিকতার উত্থান। জীবনের যে সহজীয়া প্রবৃত্তি তার মধ্যে আছে শুধু শিল্পের অপমৃত্যু। কবি তাঁর বিশ্ববিশ্রুত মসজিদে কর্ডোভা (Mosque of Cordova) কবিতায় মহৎ শিল্প ও শিল্পীর মূল্যায়ন করেছেন–

প্রেম থেকে জানি অস্তি তোমার ওগো মসজিদ কর্ডোভার,

ক্ষয় নাই যা, নাইতো বিলয়, অতীত অথবা অধুনা আর।
হোক তসবীর অথবা পাথর।
বেনুকার সুর অথবা গান
হৃদয় রক্তকণায় শিল্প হয় জীবন্ত হৃদি সমান।
শিলাকে যে করে জিন্দা দিল, সে জিগরের তাজা কাতরা খুন
হৃদয় রক্তে জাগে অসহন বেদনা দহন, সুর আগুন।
হৃদয় জাগানো প্রেরণা তোমার, হৃদয় জ্বালানো আমার গান
তুমি শুধু ডাকো, আমি খুলে যাই সকল হৃদয় তিমির ম্লান।

(অনুবাদ– ফররুখ আহমদ)

কবির বিপক্ষীয় সমালোচকরা তাই যখন তাকে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা প্রগতির বিপক্ষে দাঁড় করান তখন ইকবালের এই বিশ্ববীক্ষার সামনেও সমালোচনা মনে হয় অপরিণত। সত্য বটে, ইকবালের কবিতা প্রগতির যে বাণী বহন করে এনেছে তার সাথে মিশ্রিত আছে ধর্মের মোহমুগ্ধ স্বস্থতা এবং তিনি তার প্রেরণার উৎসমূল করেছেন ইসলামকে। কিন্তু অনুদার এই সমালোচকদের দৃষ্টি হল আচ্ছন্ন। তাদের ধারণা ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট যা কিছু তাই অপরিচ্ছন্ন এবং প্রতিক্রিয়াজাত এবং তার বিপক্ষে দাঁড়ানোই প্রগতি ও সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। প্রগতির নামধারী এ ভন্ড প্রতারকের উদ্দেশ্যে ইকবালের নিম্নোক্ত বাণীই যথেষ্ট হবে বলে মনে করি যা তিনি লিখেছিলেন ১৯১৬ সালে প্রাচীন এক আরবী কবির কবিতা প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যা বলেছিলেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইকবালের এ উক্তি এমন সময় দেয়া যখন ভারতে নাস্তি-নির্ভর প্রগতিবাদী আন্দোলন দানা বাঁধেনি মোটেও এমনকি ইউরোপেও এ আন্দোলন তখন মাটি খুঁজে পায়নি পুরোপুরি–

"The ultimate end of all human activity is life glorious, powerful, exuberant, All human art must be subordinated to this final purpose and the value of every thing must be determined in reference to its life yielding capacity. The highest art is that which awakens our dormant will force and nerves us to face the trials of life manfully. All that brings drowsiness and makes us shut our eyes to Reality around, on the mastery of which alone life depends, is a message of decay and death. There should be no opium eating in art, The dogma of Art for the sake of Art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power.

৫

ইকবালের কবিতায় স্বাদেশিকতার দৃষ্টান্ত প্রচুর। এমনকি তাঁর কবি জীবনের প্রথম পর্বে বিরচিত কবিতার সুর প্রধানত দেশপ্রেমের দাবদাহনে নিষিক্ত। কিন্তু হৃদয়হীন সমালোচকের অপ্রসারী দৃষ্টি থেকে আদৌ বিমুক্ত থাকতে পারেননি তিনি। বলা হয়ে থাকে ইকবালের পরিণত বয়সের কবিতায় দেশ এবং তার সমস্যা উপেক্ষিত এবং ইসলামী আদর্শের মত ধর্ম-দর্শন দ্বারা কবলিত। এই সমালোচনার দু'টি দিক স্পষ্ট। প্রথমত, ইকবাল জাতীয়তা ও দেশ-প্রেমের আধুনিক দেবতার নির্মাল্য রচনা করতে অস্বীকার করেছেন এবং দ্বিতীয়ত, মানবতার প্রতি তাঁর আহবান নিছক ইসলামী আদর্শের ব্যঞ্জনায় সিক্ত হয়ে আছে।

প্রকৃত অবস্থাটা কি? ইকবাল কাব্যের গভীরে দৃকপাত করলেই নজরে আসবে, এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন যে কবি তাঁর প্রিয় জন্মভূমির প্রতি কোন অনুরাগ পোষণ করেননি। কবির পরিণত বয়সের রচনাবলীতেও স্বদেশের প্রতি উদ্দীপক ও সাড়া জাগানো কবিতার প্রশ্রয় যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান যা তাঁর দেশপ্রেমেরই ঋদ্ধ অংগীকার। কিন্তু একটি পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট যে, তার প্রথম জীবনের কবিতায় স্বদেশের বহিরাংগিক চিত্রাবলীই মূর্তিমান। কিন্তু বয়সের পরিণতির সাথে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা যত প্রসারিত হতে থাকে, মানব সভ্যতার চরম লক্ষ্য যখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চিন্তার দিগন্তে, ইকবালের কাব্য ও দর্শনের অন্তর্গত বিশ্বাস ও ক্ষুরধার উপলব্ধি তখন ভূগোলের নির্দিষ্ট সীমানায় আবদ্ধ হতে অস্বীকৃতি জানায়। সভ্যতার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের গতিপ্রবাহকে আত্মস্থ করে ইকবাল মানবিকতার চিরন্তন সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক জিহাদকে অধিকতর কর্মপ্রবণ করবার লক্ষ্যে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশের প্রতি ইকবালের অনুরাগ এই বৃহত্তর মানবিক চেতনার আঙ্গিকে বিচারের দাবীদার এবং তিনি এখন বিশ্বাসের এই অন্তর্গত মূল্যমানকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে উৎসাহী। স্বদেশের বহিরাংগিক চিত্র, মৌসুমী হাওয়ার পরিবর্তন, নদ-নদী শ্যামলিমার মাধুকরী দৃশ্য এখন তাঁর কাছে গৌন। নিঃসন্দেহে ইকবালের এই রূপান্তর স্বদেশের প্রতি তাঁর অতি উৎকর্ষিত মনোভঙ্গির দৃষ্টান্ত, কেননা এ পর্যায়ের কবিতায় উন্মোচিত হয়েছে বিশ্বসভায় স্বদেশের গৌরবমন্ডিত স্থান যা কি-না আযাদী অর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়। ইকবাল যখন পরাধীন ভারতের নাভিশ্বাসের কথা বলেন তখন তাঁর বিশ্বাসের জ্বালা ও ধ্রুপদ চিন্তার মনিকাঞ্চন প্রবল প্রভা ও দীপ্ত মাঙ্গল্যে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে–

কে জানে ভারতের ভবিতব্য–
ফিরিঙ্গি রাজ প্রাসাদের যা আজ উজ্জ্বলতম রত্ন
এই যে চাষী কবর উদগারিত মুর্দার মত,
কে জানে তার রহস্য কোথায় গুপ্ত–
শরীর ও আত্মা উভয়ই নিষ্পেষিত বন্ধকী দেনায়
গৃহ এবং গৃহকর্তা অনুপস্থিত–
পশ্চিমের গোলামীতে তোমরা আছ বেশ
আমার অনুযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে
পশ্চিমের বিরুদ্ধে নয়। (যরবে কলীম)

ভারতে ঔপনিবেশিক শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে ইকবালের এই কঠোর বাক্য উচ্চারণ একটি কিংবা দু'টি নয় । তাঁর কাব্যে ও সৃষ্টিকর্মে এই প্রতিবাদ ধ্বনি বারে বারে ঘুরেফিরে এসেছে সেই শক্তি ও ক্রিয়াকান্ডের বিপক্ষে যা কি-না জনগণের সামাজিক ও মানবিক অগ্রগতিকে অবরুদ্ধ করে। তাঁর পরিণত বয়সের রচনা 'পচ চেহ্ বায়াদ কারদ'-এ উন্মোচিত হয়েছে এক জাগ্রত প্রাচ্যের দৃশ্য। পশ্চিমী দুঃশাসন নিক্ষেপ করে প্রাচ্য তার অন্তর্গত শক্তি আবিষ্কার ও মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে নবযাত্রা শুরু করেছে, ইকবাল তাঁর এই কাব্যে ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন ভারতের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গোত্রীয় কলহের প্রতি যা কি-না দেশটির সামাজিক বুনিয়াদ অস্থির করে তুলেছে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের মৃত্তিকায় তাদের প্রাসাদ নির্মাণ করছে–

ও হিমালয়, আটক ও গঙ্গানদী
আর কতকাল তোমরা থাকবে বল বর্ণ ও গন্ধহীন

এই মাটির পলিতকেশ সন্তানেরা বুদ্ধিভ্রম
তরুণেরা বঞ্চিত ইশকের দীপ্তি থেকে
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়ই বিমুক্ত;
কিন্তু আমরা আটক গোলামীর জিঞ্জিরে
অন্যেরা আমাদের মৃত্তিকায় নির্মাণ করছে তাদের প্রাসাদ
মানবতা ভারতে রাহুগ্রস্ত বিভেদ আর বৈরিতায়
পুরনো বিবাদ উসকে উঠেছে নতুন করে।
যতক্ষণ না পশ্চিমের কোন দেশ স্বেচ্ছায়
বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের ঘেরাটোপে মধ্যস্থতাকারীর
ভূমিকা পালন করছে
উন্মোচিত হবে না এই রৌদ্র চমকিত পানি
ও মরীচিকার পার্থক্য
বিপ্লব চাই আজ সব নিবীর্যতা ঝেড়ে ফেলার জন্য।

যে কবি স্বদেশের বেদনা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে এমনি মর্মরিত হয়েছেন, হৃদয়ের রক্তে যার উন্মোচিত হয়েছে স্বদেশী চিত্র– কি করে আমরা তাকে দেশপ্রেমবর্জিত কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কবির যরবে কলীমে শুয়ায়ে উমীদ (আশার কিরণ) কবিতার উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, যেখানে তিনি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন মাতৃভূমির অনালোকিত তসবীরের বুকে আশার কিরণ সম্পাৎ করবার। আশ্চর্য বর্ণনাভঙ্গি ও নাটকীয় সংলাপের মধ্যে এ কবিতা, কবি ও শিল্পীদের জন্য এক বিপ্লবী ম্যানিফেস্টো যারা জীবনকে দেখতে চান বহু বিচিত্রতায়। বহু বর্ণের সম্মিলনে। কবিতার মূলগত ধারণা ব্যক্ত হয়েছে উপমা-উৎপ্রেক্ষার ছলে। কোন এক সময় সূর্য পৃথিবীর অধিবাসীদের নীচতা ও বিকৃতি দর্শনে বিরক্ত হয় এবং সে তার তাবৎ কিরণকে এই দুঃখ জ্বালার এঁদো ডোবা থেকে ফিরে আসার আহবান জানায়। পৃথিবী জোড়া ছড়ানো-ছিটানো সমস্ত কিরণ এ আহবানে সাড়া দেয়, শুধু একটি মাত্র অস্থির, উন্মুখর প্রোজ্বল কিরণ, যে মনস্থির করেছিল প্রাচ্য এবং বিশেষত হিন্দুস্তানের দুঃখ ও জিল্লতির অপসারণ করবার, সূর্যের আহবান প্রত্যাখ্যান করে। এই অমিততেজ কিরণের ভাষ্য এ রকম ঃ

উদ্ধত কিরণ এক হুর– চক্ষুসম দীপ্তিমান,
বিশ্রান্তি আরাম ভোলা বিচঞ্চল পারদ সমান
কহিল সে, জ্যোতির্ময় বক্ষ হতে দাওগো বিদায়,
দিগন্তে আবার নামি, ফিরিব– না না উজলি হায়,
প্রাচ্যের প্রতিটি কণা, দূর করি হিন্দের আঁধার,
জাগাব সকলে ভেঙ্গে রুদ্ধ যত স্বপ্নের দুয়ার।
প্রাচ্য দেশ– আশা কভু জন্ম নিবে এরি ধূলি হতে,
ইকবালের অশ্রুরাশি বয় হেথা প্লাবনের স্রোতে,
এদেশেরি ধূলি মেখে চাঁদ-তারা উজ্জ্বল মহান,
প্রতি ধূলিকণা এর মুক্তসম বহু মূল্যবান,
দার্শনিক কভু সেই জন্মেছিল এ মাটির পরে
যাদের চিন্তার ফলে থই জাগে জ্ঞানের সাগরে।
যে বীণা জাগিয়েছিল প্রাণে প্রাণে গভীর চেতনা,

মন্দিরের দ্বারে দেখ, শুয়ে আছে হতাশ ব্রাহ্মণ,
মসজিদ মিম্বর তলে কাঁদিতেছে মুসলিমের মন।
ত্যাজনা পশ্চিম কিংবা বিমুখ না হও প্রাচ্য পর,
প্রকৃতি-ইংগিতে তুমি প্রতিটি রজনী কর ভোর।

(অনুবাদ– মনিরউদ্‌দীন ইউসুফ)

ব্যতিক্রমী এই কিরণ ইকবাল নিজেই; প্রাচ্যের দিগন্তে যিনি এনেছিলেন আলো ঝলোমলো রঙিন দিনের স্বপ্ন। তাঁর ছিল একাধারে বিশ্বদৃষ্টি এবং বিশ্ববীক্ষণ। ইকবালের অন্তর্গত চেতনায় ধরা পড়েছিল দেশপ্রেম যা স্বদেশের কল্যাণকামিতা ও উৎকর্ষ বিধানের লক্ষ্যে প্রণোদিত আর জাতীয়তাবাদ হচ্ছে এক ধরনের বিষবৃক্ষ যার উৎপাদিত ফল রাজনৈতিক কার্যক্রম ও প্রচারণার মধ্যে শান্তি, স্বাধীনতা ও ইনসাফের হন্তারক হিসেবে সতত ক্রিয়াশীল। ইকবাল ছিলেন মানবতাবাদী, একই সাথে আন্তর্জাতিকতাবাদী, তাই কার্যত তিনি জাতি রাষ্ট্রের ধারণা অস্বীকার করেছেন। ইসলামের উদার শিক্ষা এবং রক্ত, বর্ণ ও গোত্রের অলীক পূজাপাঠ পরিত্যাগপূর্বক ইসলামের নবী যে মানবতার অবিভাজ্যতা ও একক অস্তিত্বের কথা বলেছেন ইকবাল তার থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। ইকবাল এই বিশ্বাশ্রিত সত্য উপলব্ধিতে নিছক নিঃসঙ্গ একলা চলার পথিক নন। বর্তমান কালের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিবাদী মনীষার ধারণাও ইকবালের সমার্থক, যদিও তাদের চিন্তা-ধারণা ও বিশ্বাসের বিস্তৃতি বিভিন্ন বলয় অভিমুখীন এবং সেটাই সংগত ও স্বাভাবিক তথাপি পরিণতিতে তারা সকলেই একমত হয়েছেন বর্তমানকালে জাতীয়তাবাদের নির্মানবিক চেতনা নৈতিক ও জাগতিক কল্যাণের প্রতিবন্ধক এবং রাজনৈতিক হানাহানি ও আগ্রাসনের উপযোগিতা নির্মাণে সহায়ক। সভ্যতার অনিরুদ্ধ গতিপ্রবাহ তা টিকিয়ে রাখতে হলে জাতীয়তাবাদের অপচেতনার বিলোপ অবশ্যম্ভাবী ও জরুরী। সত্যিকার অর্থে যিনি প্রগতিবাদী একথা অবশ্যই স্বীকার করবেন কারিগরী ও অর্থনৈতিকভাবে পরস্পর নির্ভরশীল আধুনিক পৃথিবীতে এই দানবিক চিন্তার শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য চাই বিশ্ববিক্ষা, দেশপ্রেমের উর্ধ্বে দেশাতীত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের চর্চা।

ইকবালের সাথে অন্যান্য চিন্তাবিদের পার্থক্য স্বকীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে। বার্ট্রান্ড রাসেল, এইচ জি ওয়েলস, বার্নাড'শ কিংবা যোয়াড এবং রাজনৈতিক দল যেমন সমাজবাদীরা মানব সমাজে জাতীয়তাবাদ-নির্ভর এই খন্ডিত চেতনাকে আঘাত করেছেন এবং বলেছেন, ক্রমহ্রাসমান দূরত্বের আধুনিক পৃথিবীতে যখন পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন জাতীয়তার বিষক্রিয়ায় নতুন করে উদগত হবে শ্রেণী-সংঘর্ষ, বাণিজ্যিক বিরোধ, যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ যা কি-না মানবতার সার্বিক বিপর্যয় সূচনা করবে। ইকবালের বিবেচনা ধর্মাশ্রিত ও নৈতিকতাজাত, আধ্যাত্মিক ও মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ। তাঁর কাছে সকল ব্যবস্থাই অনুপযোগী যার বুনিয়াদ বৈরিতা ও জুলুমের মৃত্তিকায়, যা কি-না মানব সমাজের ভবিষ্যতকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলবে। তিনি তাঁর এই বক্তব্য তুলে ধরেছেন বিশ্ববিখ্যাত মাদ্রাজ বক্তৃতায় অসামান্য বলিষ্ঠতা ও যৌক্তিকতার সাথে–

Both nationalism and atheistic socialism, at least in the present state of human adjustments, must draw upon the psychological forces or hate, suspicion and risentment which tend to impoverish the soul of man and close up his hidden sources of spiritual energy. Neither the technique of medieval mysticism nor nationalism nor atheistic socialism can cure the ills

of a dispairing humanity.

Surely the present moment is one of great crisis in the history of modern culture. the modern world stands in need of biological renewal. And religion. Which in its higher manifestations is neither dogma nor priest-hood. nor ritual. can alone ethically prepare the modern men for the burden of the great resonsiblity which the advancement of modem science necessarily involves. and restore to him that attitude of faith which makes him capable of winning a personality here and retaining it here after.

দর্শনের এই ঋদ্ধ অনুভব প্রাণ ফিরে পেয়েছে তার কবিতার ছন্দে, নব নব আঙ্গিক ও সৌকর্যে। যেমন–

ফিতরাতের উদ্দেশ্য কি
আর কিবা রহস্য ইসলামের মর্মরিত বিশ্বাসে?
মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা, এবং ইশকের অনিরুদ্ধ প্রবাহ,
অবলুপ্ত কর রক্ত ও বর্ণের জাতীয়তা
হারিয়ে যাও মিল্লাতের মাহফিলে।
মুছে দাও এই পার্থক্য
তুরান, পারস্য বা আফগানের ভেদরেখা।
অন্যত্রই–
লোভ মানবতাকে বিচ্ছিন্ন করেছে কলহমান দলে
উচ্চারণ কর প্রেমের বাণী
শিক্ষা দাও উখওয়াতের ভিত্তি।
কেন এই বিভেদের আয়োজন
হিন্দ, তুরান, আফগান এবং খোরাসান?
তোমরা উপকূলের অধিবাসী
দৃষ্টিকে সীমাহীন রাখো।
তোমাদের ডানায় ভর করেছে বর্ণ ও গোত্রের ধূলি
হারেমের পাখী
উর্ধ্বচারণের পূর্বে ঝেড়ে ফেল তোমার ধূলি ধূসরিত ডানা।

ইকবাল জোরের সাথে উল্লেখ করেছেন, জাতীয়তাবাদ এবং পুঁজিবাদ ও তার অবৈধ উপজাত সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপকে করেছে নগ্নিকা। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ এখন ধুঁকছে আসন্ন বিপর্যয়ের অপেক্ষায়–

মানুষ আজও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উপাচার;
এ কেমন বেদনার্ত চিত্র
মানুষ, মানুষেরই খাদক
সভ্যতার আলোরাশি,
মুগ্ধ করেছে মানব আঁখি,
তার অঞ্জনস্পর্শে
কিন্তু এ হলো মিথ্যার শৈল্পিক নির্দেশ

পশ্চিমের জ্ঞানপাপীরা গর্বিত বিজ্ঞানের
কিন্তু এ হলো লোভ ও রক্তমিশ্রিত
যুদ্ধের ক্ষুরধার তরবারী
রাজনীতির যাদু সভ্যতাকে ধারণ করতে পারে না
অন্তর যার যুক্ত পুঁজিবাদী পাপের সাথে।

ইকবালের অপরিণত সমালোচনার কুয়াশা এর পরেও কি অভেদ্য রয়ে যাবে যে, তিনি দেশপ্রেমিক নন। ইকবাল যে বিশ্ববীক্ষার কথা বলেছেন তা অবশ্য আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে এবং জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কল্যাণকামিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইকবালের আরো এক দল সমালোচক আছেন যাদের ভাষ্য– মানবতার সমস্যাকে তিনি ধর্মের ঠুলি পরে অবলোকন করেছেন এবং কার্যত তাই তিনি তার সৃষ্টি-কর্মের আবেদনকে বিশ্বমানবতার পরিবর্তে নিছক মুসলিম উম্মার কাছে সীমিত করে ফেলেছেন। এ কথা সত্য, ইকবাল তার কাব্য-ভাবনার গভীর নির্দেশ পেয়েছেন ইসলামে শাশ্বত মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে। কিন্তু একথা উচ্চারণ কি যথার্থ এটি তার কাব্যের শিল্পিত মূল্যকে ক্ষুণ্ন করেছে কিংবা তার বিশ্বজনীন আবেদনের হানি ঘটিয়েছে একটুও। ইকবাল তাঁর অসাধারণ মনীষা ও প্রজ্ঞার দীপ্তিতে ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্বসমাজের কাছে এবং আরো বিশেষ করে মুসলিম সমাজের কাছে তুলে ধরেছেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল কিংবা সমার্থক কিছু অভিধায় চিহ্নিত করা ন্যায়ত সম্ভব?

অনুদার সমালোচকরা একটি কথা বিস্মৃত হন বিশ্বের সব বড় কবি, লেখক কিংবা চিন্তাবিদরা প্রেরণা গ্রহণ করেছেন নিজ সমাজ থেকে; যে বলয় ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তিনি বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। একথা সত্য, সৃষ্টিধর্মী ও বিকাশমান মনীষা কখনো অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না স্বসমাজের সাথে শিকড় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এবং একমাত্র এই পটভূমিতে নিজস্ব সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও জীবন চেতনাকে আত্মস্থ করেই মনীষার বিকাশ সম্ভব এবং তখনই তার মধ্যে উজ্জীবিত হয় সৃষ্টিধর্মী মৌলিকত্ব, কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে, চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির নতুন দিগন্তকে আমন্ত্রণ জানানো এবং কল্যাণকর উপযোগিতার বুনিয়াদ নির্মাণ। ইকবাল এ দু'টি শর্তকেই পূরণ করেছেন সাফল্যের সাথে। প্রথমত তিনি ছিলেন বড় মাপের ইসলামী চিন্তাবিদ কোরআনী জীবন-দর্শন ও রাসূল (সঃ)-এর আদর্শবাদকে তিনি মূল্যায়ন করেছেন গভীর অন্তরঙ্গিতায়। দ্বিতীয়ত আধুনিক বিজ্ঞানের বহু প্রসারী জীবনধারা ও পদ্ধতির সাথেও তাঁর ছিল সমান পরিচয়। অতি অনিবার্যভাবে তাই তাঁর ব্যাখ্যাত ইসলাম নিবীর্য অতীতের ভারবাহী শকট নয়। ইসলাম তাঁর কাছে মানবমুক্তির প্রশ্রয়, মানবপীড়নের হাতিয়ার নয়। ইকবালের ব্যাখ্যাত ইসলামে চিন্তার ক্লৈব্য নেই, নেই অসহিষ্ণুতার উত্তাপ। আছে মুক্ত প্রসারী জীবনের দ্যোতনা। ইসলাম তাঁর কাছে প্রচলিত অর্থের কোন ধর্ম নয় যা মানুষের অন্তরে নিরুদ্বেগ পৃথিবীর এক অলীক স্বপ্ন উজ্জীবিত করে এবং জীবন সংগ্রামে মানুষকে পশ্চাদপসরণে উৎসাহিত করে। ইসলাম তাঁর কাছে সেই ধর্ম নয় যা মানুষের কাছে আফিম হিসেবে বিবেচিত। ইসলাম তার কাছে মুক্ত মানুষের জীবন বিশ্বাস, গতি ও সংগ্রামের প্রতীক, বিশ্ব জয়ের আলেখ্য। ইকবাল তাই বিক্ষুব্ধ হয়েছেন নিবীর্য আত্মার প্রতীকে যারা আজও ধর্মের কান্ডারী সেজে বসে আছে–

হে ক্ষমতা বঞ্চিত আল্লাহর সন্তানেরা!
যাও নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে
প্রার্থনা কর নিভৃত গুহা কন্দরে।
যাও!
আবিষ্কার কর ইসলামের নতুন শৈলী
যেখানে শিক্ষা দেয়া হয়
বিনয়ের জাল জুয়াচুরি
গোলামীর কাছে আত্মসমর্পণ
আর নৈরাশ্যের চিরন্তন উপযোগিতা
মুল্লারা ভাবছে ঃ
এই হল মুক্ত ইসলামের ছবি
কেননা এই দেশে তারাই
সালাতে– নেতৃত্ব দেয়ার অধিকারী।

ইকবালের কাছে ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির (POWER AND VISION) কার্যকরী উপমা। আধুনিক বিশ্বে শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টির বিচ্ছেদ, ধর্ম ও বিজ্ঞানের বৈরিতা, জ্ঞান ও বোধির অসংযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে কারুণ্য ও ব্যর্থতার এক মহাদুর্বিপাক। ইকবালের ব্যাখ্যাত ইসলাম এই অসংগতি থেকে মুক্ত। তাঁর ধর্মে উজ্জীবন ঘটেছে ন্যায় প্রেমবোধ, ভ্রাতৃত্ব ও মানবতার। বিজ্ঞানী ও পূজারীর ঔদ্ধত্য নেই এ সমাজে।

এমনি যে গতিময় শক্তিমান জীবন-দর্শনের ব্যাখ্যাদানকারী কবি তিনি কেন উপেক্ষিত হবেন অনুদার জীবন চেতনাবাহীদের হাতে। যারা তাঁর কাব্যের এমনিতর মানহানি করতে চায়। ধরে নেয়ার যথেষ্ট কারণ আছে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবেই এ প্রচারণার জন্ম দিয়েছে, কেননা তারা জানে ইকবালের ব্যাখ্যাত আদর্শ কখনো ম্লান হবার নয়। যদি তার কাব্যের শিল্পকেও উপজীব্য হিসেবে ধরি তবে একথা মেনে নেয়া যায়না যে, তাঁর কবিতার অন্তর্গত বাণী বিশ্বজনীন আবেদন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণে যে, তিনি তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস করেছেন ইসলাম ও তার সংস্কৃতিকে। তাহলে পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একই কথা ওঠাই স্বাভাবিক। এটা কি করে বলা সম্ভব শেক্সপীয়র কিংবা গ্যাটের সৃষ্টিকর্ম কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি অথবা তাঁদের স্ব স্ব শিল্প-নৈপুণ্য যথেষ্ট গুণমান-সম্পন্ন বিবেচিত হয়নি। এ কারণে যে, তারা যথাক্রমে ইংরেজ ও জার্মান সংস্কৃতির অনুবর্তন ও অনুপ্রাস সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয়েরই সাহিত্যকর্ম খ্রষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের জারকরসে মিশ্রিত হয়ে আছে। উর্দূতে ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকী প্রকাশনার লগ্নে বাবায়ে উর্দূ মৌলভী আব্দুল হকের কাছে লেখা প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর একটি চিঠি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে–

I think it is unfair to describe Iqbal as the poet of Islam only, as it restricts unnecessarely the scope of his influence. It is true that he has written a great deal about Muslim philosophy, Muslim culture and Muslim achievements. But no one has ever sought to limit the appeal of Milton's poetry by calling

him the poet of Christianity or the appeal of kalida's poetry by calling him the poet of Hinduism; nor have the followers of other religions ever belittled their greatness on this account. If Iqbal writes of the great deeds of Muslim history and of Muslim cultural achievements, is there any reason why non-Muslims should Value him any the less on that account.

সভ্যতার নিরন্তর বিবর্তনের ফলে পৃথিবীর মানুষ আজ পরস্পর সংলগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পারস্পরিক সংলগ্নতা ও আত্মীয়তার পরিধি ক্রম-সম্প্রসারিত হয়ে চলছে দিনে দিনে। মানবতার এই প্রসারণ ক্রিয়াকে সংহত করতে হলে চাই সাহিত্যে এবং শিল্পে উৎকর্ষিত জীবনের চর্চা। ইকবাল কাব্যের অন্তর্গত বাণী নির্মোহ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে স্বীকার করবার যথেষ্ট কারণ আছে আধুনিককালের জীবনবাদী ও প্রগতিশীল সাহিত্য সৃষ্টিতে তাঁর অবদান উধাও সমুদ্রের মতই ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবিকতার কল্যাণকামিতায় তাঁর কবিতা চিরদিনের, চিরকালের বিপ্লবী অংগীকার। মানুষকে তিনি ভালবেসেছিলেন। তাঁর অন্বেষা ছিল মানুষ ও বিশ্বজগত। বিশ্বজগতের মুখোমুখী বলদর্পী মানুষ। কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ বলেছেন ঃ ইকবালের কবিতার শেষকথা হল ঃ মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা। এই মূল্যবোধ ও বিবেচনাই কবি ইকবালের কাব্যকর্মকে শেষ বিচারে উৎরে দিয়েছে– শাশ্বত কালের যাত্রায়।

ইকবাল ঃ জীবন ও কর্ম

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত সিয়ালকোট শহরে ১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ নভেম্বর বিশ্ববিশ্রুত কবি ও দার্শনিক আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের জন্ম। ইকবালের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন সাপ্রু বংশীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জনৈক সূফীর প্রভাবে এ পরিবার ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়। পাঠান শাসনের বিশৃঙ্খলার সময় কাশ্মীর পরিত্যাগ করে তারা সিয়ালকোটে বসতি কায়েম করেন।

ইকবালের আব্বা শেখ নূর মুহাম্মদ ছিলেন একজন সূফী ব্যক্তিত্ব। তাসাউফের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। নামাজ ও মোরাকাবার মধ্যে তাঁর অধিকাংশ সময় নির্বাহ হত। ইকবাল তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছেন কবি বন্ধু আকবর এলাহাবাদীর কাছে লেখা এক চিঠিতে–

Daybefore yesterday, he was having his evening meals, and the talk turned to a relative who had died recently. During the conversation he remarked : 'No body knows since when man has been seperated from his creator.' This idea affected him so deeply that he almost fainted and till 11'o clock at night he remained in a semi conscious condition. Such silent communications one can get only from the sages of the East, one can not get them in Europe. (Iqbalnama, Sheikh Ataullah)

ইকবালের আম্মাও ছিলেন স্বামীর মতই ধার্মিক। তিনি চেয়েছিলেন পুত্র ইকবালও ঈমানদার মুসলমান হিসেবে গড়ে উঠুক। জননীর জীবন ছিল ইকবালের আজীবন প্রেরণার উৎস। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি লিখেছেন ঃ

নক্ষত্রের কিসমত যে পেয়েছি আমি, এতো তোমারই শিক্ষার ফল
অস্তিত্বের ইতিহাসে সোনালী অক্ষরে লেখা তোমার জীবন।

ইকবালের শিক্ষা জীবন শুরু হয় সিয়ালকোটেই। অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন ইকবাল স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বত্রই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

সূফী ভাবাপন্ন পিতা শেখ নূর মুহাম্মদের ইচ্ছা ছিল পুত্র ইকবালকে মাদ্রাসায় দেওয়া, কিন্তু উস্তাদ সৈয়দ মীর হাসানের পরামর্শে তাকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করানো হয়। মক্তবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্তির সময় ইকবাল সৈয়দ মীর হাসানের সাহচর্যে আসেন এবং পরবর্তীতে এ সাহচর্য্য তাঁর জীবনে কল্যাণ দীপ হয়ে জ্বলে ওঠে।

সৈয়দ মীর হাসান ছিলেন সে সময়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পন্ডিত বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম। ইকবালের খোদাদাদ জেহেনের পরিচয় পেতে তাঁর মোটেও দেরী হয়নি। উপরন্তু তিনি ইকবালকে কবিতা রচনায় উৎসাহ যোগাতেন। ইকবাল তাঁর উস্তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাঙ্গ-ই-দারার একটি কবিতায়–

মুর্তজা আলীর খানদানের আলোকরশ্মি তুমি
আমার জীবনে তুমি হলে এক পূর্ণ আশ্রয়স্থল

তোমার অন্তর থেকেই বিকশিত হল আমার আকাঙ্ক্ষার দল
আমি হলাম তত্ত্বজ্ঞানী তোমারই মহিমায়।
প্রার্থনা করি আসমান ও যমীনের প্রভুর দরগায়
যেন তাঁর কবর জিয়ারতে তিনি আমাকে করেন
বার বার সৌভাগ্যবান।

সিয়ালকোটে প্রাথমিক ও প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করবার পর স্কচ মিশন কলেজ থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি লাহোরে এসে সরকারী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৭ সালে তিনি বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯৯ সালে একই কলেজ থেকে সম্মানের সাথে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে দর্শনে এমএ পাস করেন। তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসেবে তাঁকে একটি স্বর্ণ পদকও দেয়া হয়।

লাহোরের সাহিত্য সাংস্কৃতিক সংগঠন আঞ্জুমান-ই-হিমায়েত-ই-ইসলাম ছিল ইকবালের প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত স্থান, এই অরাজনৈতিক সংগঠনটি তৎকালীন লাহোরের মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। ইকবাল তাঁর কোন কোন সাড়া জাগানো ও প্রাণোদ্দীপক কবিতা এ সংগঠনটির সাহিত্য সভায় প্রথম পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীতে ইকবাল আঞ্জুমানের কর্মকর্তা হিসাবেও অভিষিক্ত হন।

লাহোর সরকারী কলেজে অবস্থান কালেই ইকবাল প্রখ্যাত পন্ডিত বুদ্ধিজীবী স্যার থমাস আর্নল্ডের সংস্পর্শে আসেন। আর্নল্ড ১৮৯৮ সালে লাহোর কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ইকবাল এই অধ্যাপকের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায় মুগ্ধ হন এবং নিজের অন্তরে তার জন্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির একটি উচ্চাসন নির্মাণ করেন। বিনিময়ে আর্নল্ডও তার ছাত্রের যোগ্যতা ও মেধার স্বীকৃতি দেন এবং ইকবালকে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালে অধ্যাপক আর্নল্ড লন্ডনের উদ্দেশ্যে লাহোর ত্যাগ করেন। এই বিচ্ছেদ ইকবালকে অত্যন্ত মর্মাহত করে। তাঁর এই মনোকষ্টের স্বাক্ষর রয়েছে নিম্নোক্ত কবিতায়–

হে প্রতীচ্যের মৃত্তিকা!
তোমার সন্তান অবশেষে তোমারই বক্ষদেশে স্থান গ্রহণ করল
হায়! প্রাচ্যের মাটি ও মানুষ তার কাছে হল অপাংক্তেয়
জানি এ সত্য আমার মনে অহর্নিশ পীড়ন করে চলেছে
বিচ্ছেদের আলোকশিখা রাত্রের অন্ধকারের চেয়েও মর্মান্তিক ।।

এম এ পাস করার পর ইকবাল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে আরবীর প্রভাষক পদে নিযুক্তি পান, কিন্তু কিছুদিন পরেই ইংরেজী ও দর্শনের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে লাহোর সরকারী কলেজে তিনি বদলী হয়ে আসেন। চরিত্র মাধুর্য ও গভীর ব্যক্তিত্বের কারণে অধ্যাপক হিসেবে ইকবাল সকলের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। আরবীর প্রভাষক থাকাকালীন ইকবাল অর্থনীতির উপর একটি পুস্তিকা রচনা করেন। ঘটনাক্রমে এটিই ছিলো উর্দূতে অর্থনীতির উপর প্রথম পুস্তক।

অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইকবাল ছুটি নিয়ে ইংল্যান্ড গমনের সিদ্ধান্ত নেন। যাত্রাপথে দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনি প্রখ্যাত সূফী হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার মাযার শরীফ জিয়ারৎ করেন।

জিয়ারৎকালে তার সঙ্গী ছিলেন পুরনো বন্ধু মীর গোলাম ভীক নৈরাং এবং খাজা হাসান নিযামী। মাযার শরীফে ইকবাল একটি কবিতা রচনা করেন যা ছিল নিযামুদ্দীন আউলিয়ার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার নিদর্শন–

তোমার কবর জিয়ারতে জিন্দা হয় দিল
জানি তোমার ইজ্জত ঈসা ও খিজিরের
অনেক উর্ধে।

ইংল্যান্ডে ইকবাল অগ্রবর্তী ছাত্র হিসেবে কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেন পাশাপাশি লিংকনস ইনএ আইন অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ম্যাকটেগার্টের অধীন তিনি কাজ করেন এবং 'ফিলসফিক্যাল ট্রিপস' ডিগ্রী প্রাপ্ত হন।

এ সময়ে তিনি মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য যোগ দেন। মিউনিকে অবস্থানকালে তিনি জার্মানীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। হাইডেলবার্গে তার পরিচয় ঘটে আতিয়া বেগম নাম্নী এক বুদ্ধিমতী ভারতীয় তরুণীর সাথে। তিনিও তখন উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে বসবাস করছিলেন। আতিয়া বেগম (পরবর্তীকালে মিসেস ফয়জী রেহামীন) ছিলেন প্রখ্যাত ফয়জী তাইয়েবজী পরিবারের সন্তান। এই তরুণীর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও সপ্রতিভ চালচলন ইকবালকে মুগ্ধ করে। পরবর্তীকালে এই পরিচয় ইংল্যান্ডে ঘনিষ্ঠতার রূপ নেয়; দেশে প্রত্যাবর্তনের পরও এ বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এমনকি ইকবালের পারিবারিক বিশৃঙ্খলা যখন তাকে অশেষ দুঃখ ও জ্বালার মধ্যে নিক্ষেপ করে, আতিয়া বেগম তখন আশ্চর্য সুন্দর ও সমবেদনায় পরিপূর্ণ চিঠি লিখে তাঁকে উৎসাহ যোগাতেন।

মিউনিকে ইকবাল তাঁর বহু বিখ্যাত অভিসন্দর্ভ 'দ্যা ডেভলপমেন্ট অব মেটাফিসিকস ইন পারসিয়া' জমা দেন। তারিখটি ছিল ৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৭ সাল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম ছিল দুই বছরের আবাসিক ছাত্র ছাড়া অভিসন্দর্ভ জমা নেয়া হয় না। কিন্তু ইকবালের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এটি বিশেষ বিবেচনা হিসেবে গ্রহণ করেন। উপরন্তু তিনি তাঁর অভিসন্দর্ভ ইংল্যান্ডে জমা দেয়ারও অনুমতি পান। ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার পর ইকবাল ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লিংকনস ইনের সাথে নিজেকে যুক্ত রাখেন। লন্ডনে অবস্থান কালে ইকবাল ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষত পাক ভারত উপমহাদেশ থেকে আগত কিছু তরুণ মুসলমানদের কার্যকলাপে আগ্রহ পোষণ করেন। এ সমস্ত তরুণ প্যান ইসলামিজমের প্রবক্তা ছিল। এ কার্যক্রম পরিচালিত হতো আঞ্জুমান-ই-ইসলাম নামীয় সংগঠনের মারফত– যার সম্পাদক ছিলেন প্রখ্যাত হাফিজ মাহমুদ শেরানী; তিনি এ সময় ব্যবসায়িক কার্যে লন্ডনে অবস্থান করছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি লাহোর ইসলামীয়া কলেজের অধ্যাপক হিসেবেও যোগদান করেছিলেন। উল্লেখ্য হাফিজ শেরানীর পর এ সংগঠনের সম্পাদক হিসেবে স্থলাভিষিক্ত হন স্বনামধন্য পন্ডিত বুদ্ধিজীবী ডঃ আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দী। এ সময় সংগঠনটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় প্যান ইসলামিক সোসাইটি।

প্যান ইসলামিক সোসাইটির উদ্যোগে ও সহযোগিতায় ইকবাল ইংল্যান্ডে কয়েকটি বক্তৃতা দেন; এর একটি বিখ্যাত ক্যাক্সটন হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং ইংল্যান্ডের জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে তা প্রকাশিতও হয়।

১৯০৬ সালে উপমহাদেশে মুসলিম নবজাগৃতির স্বপ্ন সম্ভাবনা নিয়ে ঢাকায় মুসলমানদের একমাত্র

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯০৮ সালে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে এর একটি শাখা গঠন করেন। আল্লামা ইকবাল ওতপ্রোতভাবে এ সময় মুসলিম লীগের সাথে জড়িত হন।

ইকবাল ১৯০৭ সালের এপ্রিল মাসে ব্যারিস্টারী পাস করেন, কিন্তু অগ্রবর্তী ছাত্র হিসেবে লিংকনস ইনে যোগ দেয়ার কারণে ১৯০৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি আইন ব্যবসা শুরু করার অনুমতি পাননি।

এ সময় ইকবাল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ৬ মাসের জন্য আরবীর অধ্যাপনাও করেন। উল্লেখ্য, প্রবাসকালীন সময়ে ইকবাল মাত্র ২৪টি কবিতা লিখেছিলেন সম্ভবত সময়ের স্বল্পতার জন্য এবং অধিকাংশই তাঁর বন্ধু মাখজান সম্পাদক স্যার আবদুল কাদিরের অনুরোধে। প্রবাসে তিন বছরের কর্মমুখর জীবন শেষে ২৭ জুলাই ১৯০৮ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। লাহোরে তাঁর ভক্ত-অনুরাগীরা তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানায়। আইনজীবী বন্ধু শেখ গোলাব দীনের উদ্যোগে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। লাহোরের অভ্যর্থনা শেষে ইকবাল সিয়ালকোটে আব্বা আম্মার সাথে দেখা করতে যান। ১৯০৮ সালের অক্টোবর মাসে পাঞ্জাব চীফ কোর্টে ইকবাল আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন এবং একই সময় লাহোরের আনারকলিতে একটি বাসাও ভাড়া করেন। প্রাথমিকভাবে ইকবালের লক্ষ্য ছিল আইন ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করা, কিন্তু এ পর্যায়ে ইকবাল সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন– তিনি আইন ব্যবসায় জড়িত হবেন কিংবা শিক্ষকতাকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী যেমন তাকে আইন ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত করলো তেমনি শিক্ষকতার পেশাটিও তার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘটনাক্রমে লাহোর সরকারী কলেজের অধ্যাপক জেমসের মৃত্যুর পর কর্তৃপক্ষ শূন্যপদ পূরণের জন্য দ্বিতীয় কোন যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান পাচ্ছিলেন না, এমনি আপৎকালীন সময়ে তারা ইকবালের মুখোমুখি হন। যেহেতু ইকবাল আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করতে পুরোপুরি রাজী হননি তাই কর্তৃপক্ষ সরকারী সহায়তায় এক নজীরবিহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চীফ কোর্টের বিচারকদের এইমর্মে অনুরোধ করা হয়, যেন ইকবাল তাঁর নির্ধারিত মামলাসমূহ বিকালে পরিচালনা করতে পারেন। এইভাবে কিছুদিন চলার পর ইকবাল শিক্ষকতার পেশা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তার অনেক অনুরাগীই কিন্তু আশা করতেন তিনি শিক্ষকতার পেশায় যেন যুক্ত থাকেন। যেদিন ইকবাল সরকারী কলেজের দায়িত্ব অব্যাহতি দিয়ে আসেন, সেদিন তাঁর পুরনো ভৃত্য এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন ঃ

আলী বকস! আমার জাতির জন্য আমার কিছু বাণী রয়েছে। সরকারী চাকরিতে থাকলে এগুলো তাদের কাছে পৌছানো যাবে না।

পেশা নির্বাচনের এই সিদ্ধান্তহীনতার পাশাপাশি ইকবালকে এই সময় কিছু পারিবারিক সমস্যাও ভারাক্রান্ত করে তোলে। ইকবালের বিবাহ হয়েছিল তিনবার; তার প্রথম বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তার এ বিবাহ সুখের হয়নি। দ্বিতীয় বিবাহ লাহোরের এক কাশ্মীরী পরিবারে। কিন্তু যখন এ বিবাহের আয়োজন চলতে থাকে তখন কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং এ পর্যায়ে ইকবাল লুধিয়ানার এক ধনী পরিবারে বিবাহ করেন। ইকবালের এই স্ত্রী বাচ্চা প্রসবের সময় মারা যান। ইতোমধ্যে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে সব ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে এবং বাকী জীবন তার সাথেই কাটান। এই সমস্ত কারণে ইকবালকে অত্যন্ত দুঃখ ও মনোবেদনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ এ সময়টা ছিল বিশ্বমুসলিমের জন্য এক পরম দুর্যোগের কাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়ংকর থাবা পৃথিবী কাঁপিয়ে তুললেও ইসলামী দুনিয়ায় আঘাতটা এসেছিল তুলনামূলকভাবে বেশী। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার নেতৃস্থানীয় মুসলমান রাজনীতিবিদদের কারাগারে অন্তরীণ করেন। এ সময় ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের এ মর্মে আশ্বস্ত করে যে, তাদের পবিত্র স্থানসমূহের কোন ক্ষতি করা হবে না কিংবা তুর্কী খেলাফতের উপর কোন অন্যায় আচরণের কিছু ঘটবে না। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ ও তাঁর মিত্রবর্গ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। এমতাবস্থায় মুসলিম নেতৃবৃন্দ খেলাফত আন্দোলনের ডাক দেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস তাঁকে জোরালো সমর্থন দেয়। রাজনৈতিক দিক দিয়ে এ সময় দেশের পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তপ্ত। রাউলাট বিল, জালিয়ানওয়ালাবাগের দুঃখজনক ঘটনা, পাঞ্জাবে সামরিক শাসন ইত্যাদি মিলিয়ে সর্বত্র চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

ইকবাল সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, কিন্তু নিজেকে এসবের সাথে কখনো সম্পৃক্ত করেননি। সম্ভবত পরিস্থিতি তাঁকে এ ধারণা দিয়ে থাকতে পারে এ সমস্ত আন্দোলনের কার্যকারিতা তেমন একটা নেই; উপমহাদেশে যেহেতু নানা জাতির অধিবাস তাই প্রত্যেকের স্বাধীন আবাসভূমির মধ্যেই সমস্যার প্রকৃত সমাধান নিহিত।

১৯২৩ সালে নতুন বছরে ব্রিটিশ সরকার ইকবালকে নাইট খেতাব দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর এ নাইটপ্রাপ্তি ভক্ত-অনুরাগীদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করে। বিরুদ্ধবাদী কবিরা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখে তাঁকে আক্রমণ করে। এমনকি বন্ধুরা চিঠি লিখে আশ্বস্ত হতে চায় ঘটনা যেন কোনক্রমেই তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশে কিংবা কওমের প্রতি খেদমতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। পুরনো বন্ধু মীর গোলাম ভীক নৈরাং-এর চিঠির উত্তরে ইকবাল যা লেখেন তা তাঁর পরিকল্পিত মর্দে-মুমিনেরই উচ্চারণ–

I have recieved hundreds of letters and telegrams regarding this conferring of knighthood, and I wonder why people attach so much importance to these honours. With regard to the fears you have expressed, I can only say that I can swear in the name of the Glorious God who holds my life and honour in His possession, and I swear in the name of that great and distinguished personality to whom I owe my faith in God, that no power on earth can stop me from speaking the truth. In practice, Iqbal may not be a Momin, but he has the heart of a Momin.

ইকবালের জীবন বিবেচনা করলে প্রতীয়মান হবে প্রাথমিক জীবনে রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ কোন সুস্পষ্ট আকার নেয়নি। দার্শনিক ও কবি সুলভ বৈরাগ্য তাঁকে সবসময় নির্জনতার দিকেই আকর্ষণ করত। কিন্তু উপমহাদেশের নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থা বিশেষ করে মুসলমানদের দুঃখজনক চিত্র তাঁকে পীড়িত করে তোলে। ইকবালের প্রতীতি জন্মে রাজনীতির প্রতি তার এই প্রীতিহীন আচরণ অবশ্যই পরিণতিতে ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত হবে, ফলে তিনি ১৯২৬ থেকে আমৃত্যু সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িত হন এবং মুসলমানদের প্রতিটি সমস্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯২৩ সালে পাঞ্জাব প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ভক্তরা তাকে অনুরোধ করলে তিনি রাজী হয়েও সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন যখন তিনি দেখতে পান পুরনো বন্ধু মিয়া আবদুল আজিজও একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। অবশ্য

পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি বিজয়ী হন।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভবিষ্যৎ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের পটভূমি তৈরির প্রত্যাশায় সাইমন কমিশন প্রেরণ করলে কংগ্রেস দেশব্যাপী অসহযোগিতার ডাক দেয়। এমতাবস্থায় ইকবাল নওয়াব জুলফিকার আলী খান ও আহমদীয়া নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলীর সাথে যৌথভাবে এক বিবৃতি প্রকাশ করে কমিশনকে সহযোগিতা করবার আশ্বাস দেন এবং উল্লেখ করেন, মুসলমানরা যদি কমিশনকে সহায়তা না করে তবে তারা তাদের স্বার্থকেই বিঘ্নিত করবে।

যদিও ইকবাল এ সময় রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে প্রায় একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর কাব্য ও সাহিত্য সাধনাকে বিঘ্নিত হতে দেননি। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইকবাল মাদ্রাজে তাঁর বিশ্বনন্দিত **'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'** শীর্ষক বক্তৃতা দেন। জানা যায়, এ বক্তৃতার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করতে তাঁর তিন বছরের মত সময় লেগেছিল। এ সুযোগে তিনি দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখেন। যেখানেই যান জনগণ তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করে।

বক্তৃতার আয়োজন শেষ না হতেই ইকবালকে উপস্থিত হতে হয় দিল্লীতে আহূত ন্যাশনাল কনফারেন্সের জাতীয় সম্মেলনে এবং পরে সভাপতি হিসেবে ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে। সভাপতির ভাষণে ইকবাল তাঁর যুগান্তকারী স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারণা পেশ করেন। ভিনসেন্ট স্মিথের ভাষায়–

Iqbal gave Indian Islam a sense of seperate destiny. (The Oxford History of India)

ইকবালের ধমনীতে ছিল কাশ্মীরের উত্তরাধিকার। এ কারণে কাশ্মীরের প্রতিটি ঘটনা ও সমস্যার ব্যাপারে তার আগ্রহ ছিল স্বাভাবিক। কাশ্মীরের জুলুমবাজ ডোগরা শাসকেরা বহুদিন ধরে সেখানকার মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে আসছিলো। ইকবালের কাছে এটি ছিল রীতিমত উদ্বেগের ব্যাপার।

লাহোরে বসবাসকারী কাশ্মীরীরা সীমান্তের ওপারে তাদের ভাইদের সাহায্য করবার জন্য আঞ্জুমান নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। ইকবাল ছাত্র জীবন থেকেই সংগঠনটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ছাত্র জীবনে ইকবাল তাঁর বহু বিখ্যাত অনেক কবিতাই এ সংগঠনটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছেন। ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি এটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ডোগরা মহারাজার ক্রমবর্ধমান জুলুম ও বেইনসাফীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে লাহোরে সর্বভারতীয় কাশ্মীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে কাশ্মীর প্রশাসনের অন্যায় নির্যাতনের সমালোচনা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলন শেষে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রাকালে পুলিশ প্রহার শুরু করে; পরে একচেটিয়া গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটে।

এছাড়া আল্লামা মাশরেকীর নেতৃত্বে আহরার নামীয় মুসলিম সংগঠন রাজ্যে শোভাযাত্রা প্রবেশ করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পাশাপাশি তারা কাশ্মীর কমিটি গঠন করে মজলুম কাশ্মীরীদের সহায়তা করবার জন্য যাবতীয় আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের পদ্ধতিসমূহ খুঁজে দেখতে শুরু করে। ইকবাল কাশ্মীর কমিটিতে কাজ করবার জন্য গভীরভাবে উৎসাহিত হন; তিনি কাশ্মীরের গ্রেফতারকৃত মুসলমানদের সাহায্য করবার জন্য আইনজীবী প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় ইকবাল মুসলিম কনফারেন্সেরও সভাপতি ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে কনফারেন্সের পক্ষ থেকেও ইকবাল কাশ্মীর সমস্যার কথা জোরালোভাবে সরকারের কাছে তুলে ধরেন। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার

গ্ল্যান্সী কমিশন গঠন করে কাশ্মীরী মুসলমানদের সমস্যা নিরসনের জন্য রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে এ রিপোর্টের আলোকে কাশ্মীরীদের দুঃখ-লাঞ্ছনা কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়। এভাবে ইকবাল কাশ্মীরের মজলুম মুসলমানদের পাশে এক কল্যাণব্রতীর ভূমিকায় এসে দাঁড়ান। শুধু তা-ই নয়, মানবতাবাদী কবি ইকবাল তাঁর কবিতায় কাশ্মীরের দুঃখ ও লাঞ্ছনাকেও অসীম মমতা ও ভালবাসায় মূর্ত করে তোলেন–

ভোরের বাতাস তুমি যদি জেনেভামুখী হও
তবে আমার আরজ পৌছে দিও জাতিপুঞ্জের কাছে
ওরা বেচে দিয়েছে কৃষককে, তার চাষের জমিকে
তীর তীর করে বয়ে চলা নদী আর উপত্যকাকে
বেচেছে মানুষকে একেবারে পানির দরে।

উল্লেখ্য, কবিতাটিতে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বেনিয়া কর্তৃক ডোগরা মহারাজা গুলাব সিংহের কাছে ৭৫ লক্ষ রুপীর বিনিময়ে কাশ্মীর রাজ্য বিক্রি করে দেয়ার সেই দুঃখজনক ও মর্মান্তিক ইংগিত।

১৯৩২ সালে আলোয়ার রাজ্যের মুসলমানরাও একইভাবে সেখানকার মহারাজার হাতে নিপীড়িত হতে থাকে। সেখানকার মুসলমানরা একত্রিত হয়ে খাদেমুল মুসলেমীন নামে একটি সংগঠন দাঁড় করায়, যাতে সমস্যাবলীর প্রকৃত গুরুত্ব জরুরী ভিত্তিতে সরকারকে বোঝানো যায়। মহারাজার সরকার এটিকে বেআইনী ঘোষণা করলে মুসলমানরা বিক্ষোভ শুরু করে। ফলে নির্বিচারে গ্রেফতার ও গুলীর ঘটনা ঘটে। এতে একশ' জনেরও অধিক মুসলমান শহীদ হয় এবং কয়েক হাজার মুসলমান রাজ্য থেকে হিজরত করতে বাধ্য হয়। ১৯৩২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী ইকবাল মুসলিম কনফারেন্সের সম্মেলনে আলোয়ার রাজ্যের মুসলমানদের সমস্যা বিবৃত করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে কনফারেন্সের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল আলোয়ারের মহারাজার সাথে দেখা করবার প্রস্তুতি নেয়, কিন্তু মহারাজা প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানাতে অস্বীকৃতি জানান। পরে ইকবাল ভাইসরয় লর্ড ওয়েলিংটনের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে তিনি রাজ্যের মুসলমানদের সমস্যা সমাধানের আহবান জানান। পরিণতিতে আলোয়ার রাজ্যের মুসলমানদের সকল সমস্যা দূরীভূত হয়।

রাজনৈতিক দলগুলির ক্রমাগত অসহযোগিতার মুখে যখন এ কমিশনের অকার্যকারিতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সরকার তখন ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। এ বৈঠকের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ ভারতের জন্য একটি শাসনতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করা। ইকবাল এ বৈঠকে আমন্ত্রিত হন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সময় (১৫ ডিসেম্বর ১৯৩১) তিনি লর্ড লেমিংটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হাউস অব কমনসের এক সভায় বক্তৃতাও দেন।

তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক শেষে ইকবাল দেশে প্রত্যাবর্তনের পথে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং বহু উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। প্যারিসে তিনি বিখ্যাত দার্শনিক বার্গস'র সাথে মিলিত হন এবং জীবন ও জগতের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে তাঁর সাথে মতবিনিময় করেন। প্যারিস থেকে তিনি মাদ্রিদ পৌছান।

সেখানে বিখ্যাত Divine Comedy and Islam গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক আসিনের সাথে

সাক্ষাৎ করেন। এরপর মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তিনি একটি বক্তৃতাও দেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল ঃ Spain and the Intellectual Advancement of Islamic World.

স্পেনে তিনি মুসলিম গৌরব ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন লীলাভূমি প্রত্যক্ষ করেন। স্পেনে মুসলিম সভ্যতার এই দীপ্তিমান ঐতিহ্য তাঁকে গভীরভাবে নষ্টালজিয়ায় আপ্লুত করে। তাঁর এ অনুভূতি বিবৃত হয়েছে এ সময়ে রচিত বিভিন্ন কবিতায়–

> হে স্পেনের গুলিস্তান সেদিনের কাহিনী তোমার মনে আছে
> যেদিন তোমার পুষ্পশাখায় আমাদের আশ্রয় নীড় তৈরী হয়েছিল
> ওগো তাইগ্রীসের ঢেউ, তুমিওতো জানো আমাদের।
> আজো আমাদের স্মৃতি বহন করে তোমার তরঙ্গ।

স্পেন থেকে ইকবাল ইতালীতে যান। সেখানকার বিদ্বৎসমাজে তিনি বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। ইকবাল মুসোলিনীর সাথেও সাক্ষাৎ করেন এবং তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন।

চার মাসের অনুপস্থিতির পর ইকবাল ১৯৩৩ এর ফেব্রুয়ারীতে লাহোর প্রত্যাবর্তন করেন। একই বছর সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানের বাদশাহ মহামান্য নাদির শাহ ইকবালকে সে দেশে আমন্ত্রণ জানান। আফগানিস্তানে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন বন্ধু মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী এবং স্যার রস মাসুদ। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করবার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী রিপোর্ট প্রণয়ন। উল্লেখ্য নাদির শাহ ইকবালকে অপরিসীম ইজ্জত করেন এবং চিন্তাবিদ সমাজে তাঁর জন্য একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করে দেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইকবালের অবস্থান মুসলিম ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পর্যায়ে পৌছেছিল, কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বিপুল এবং পরিচয়ের দিগন্ত ছিল শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত।

প্রথমত তিনি ছিলেন একজন কবি ও দার্শনিক। সংস্কারক হিসেবে তাঁর স্থান ছিল অদ্বিতীয় এবং মুসলিম ভারতের পুনর্জাগরণের প্রতিভূ হিসেবে তাঁর অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর কবিতা পরাধীন জাতির প্রাণে মুক্তির নতুন ভোরের সূচনা করেছিল।

১৯৩৫ সালে মাওলানা জাফর আলী খান ও আহরার দল আহমদীয়াদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আহমদীয়া মতবাদের প্রচারক মীর্জা গোলাম আহমদ খতমে নবুয়তের মতো প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করে ইসলামের জন্য যে বিপদ ডেকে এনেছিল তাঁর বিরুদ্ধে মুসলিম জনতাকে সোচ্চার করা। পাশাপাশি সরকারকে এইমর্মে অবগত করানো, আহমদীয়ারা যেহেতু খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করে, তাই তাদেরকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই এবং রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থেই সরকারের উচিত আহমদীয়াদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিসেবে ঘোষণা দেয়া।

ইকবাল বিভিন্ন সময় বক্তৃতা ও বিবৃতিতে আহমদীয়া মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং আহমদীয়া সম্প্রদায়কে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হিসেবে ঘোষণার দাবীকে জোরালো সমর্থন করেন।

এ সময় ভারতের মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যার অপরিসীম কর্তব্যবোধ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং ধীমান ব্যক্তিত্ব এ সময় সবচেয়ে বেশী অনুভূত হতে থাকে তিনি হলেন কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। দুঃখের বিষয়, ভারতের

রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তহীনতা তাঁকে দেশত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি তখন ইংল্যান্ডে আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। মুসলমানদের জন্য এ ছিল এক ক্রান্তিকাল, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কয়েকজন মুসলিম নেতৃবৃন্দ কায়েদে আযমকে বোঝাতে সমর্থ হন, দেশে তাঁর নেতৃত্বের প্রয়োজন কত বেশী, পাশাপাশি মুসলিম লীগের পুনর্গঠন কত জরুরী।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কায়েদে আযম এতদুদ্দেশ্যে পাঞ্জাব সফর করেন এবং ইউনিয়নিস্ট পার্টি প্রধান স্যার ফজলী হোসেনের সাথে মোলাকাত করেন। কিন্তু ফজলী হোসেনের শীতল অভ্যর্থনা তাঁকে ব্যথিত করে। কায়েদে আযম তখন ইকবালের মুখোমুখী হন; সময়টা ছিল ১৯৩৬ সালের মে। মতলুব-উল-হাসান সাঈদ এ ঘটনাকে বিবৃত করেছেন অপূর্ব এক ভঙ্গিতে–

In the midst of all this darkness there shone a flickering light in Lahore. (Mohammad Ali Jinnah, A Political Study)

ইকবাল ছিলেন কায়েদে আযমের কাছে এক আলোকস্তম্ভের মতো। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শরীফ আল মুজাহিদ লিখেছেন–

Iqbal was Jinnah's only consolidation. It was Iqbal who stoud steadfast by Jinnah in those trying days and helped chartar the course of Indo-Muslim politics. ("Re-emergence of the All India Muslim League", A History of the Freedom Movement)

১৯৩৬ সালে ইকবাল পাঞ্জাব মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হন। একই সালের ১২ই মে ব্যারিস্টার মিয়া আবদুল আজিজের বাসভবনে মুসলিম লীগের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ইকবাল সভাপতিত্ব করেন। পাঞ্জাব মুসলিম লীগের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বৈঠকে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং পরিশেষে ইকবাল সর্বসম্মতিক্রমে প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য, আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে কায়েদে আযম ইকবালকে মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্যও মনোনীত করেন। এ সময় লাহোরের শহীদগঞ্জ মসজিদ মুসলমানদের জন্য এক অপরিসীম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে ইকবালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উল্লেখের দাবী রাখে।

মসজিদটি ছিল শিখদের দখলে এবং মুসলমানরা আইনানুগ পন্থায় এটি উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে আসছিলো। এসময় প্রদেশের ক্ষমতায় ছিল ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা ছিল নৈরাশ্যজনক। ২৬ জানুয়ারী, ১৯৩৮-এর লাহোর হাইকোর্টের এক রায়ে মসজিদ পুনরুদ্ধারের দাবী অস্বীকৃত হলে মুসলমানরা সরাসরি জিহাদের ডাক দেয়। এক পর্যায়ে ইকবাল মুসলমানদের এ বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেয়ার প্রস্তাব দেন এবং মসজিদ পুনরুদ্ধারের জিহাদে শহীদ হতে যারা ইচ্ছুক তাদের সাথে কাজ করতে উৎসাহ দেখান।

আমাদের কাছে এখন স্পষ্ট হবে, ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮– এ সময়ের মধ্যে ইকবাল মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তথাপি একটি ধারণা প্রচলিত আছে, রাজনৈতিক অংগনে ইকবালের ভূমিকা তেমন বৈশিষ্ট্যমন্ডিত নয়। একথা সত্য, সমকালের স্বার্থসন্ধানী দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদদের মত তিনি ছিলেন না। সংগত কারণেই তাদের অবস্থান দখল করবার মতো সুযোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী ভারতীয় মুসলমানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাঁর অবদান খাটো করে দেখবার কোনই অবকাশ নেই।

ইকবালের স্বাস্থ্য কোনদিনই ভাল ছিল না। কিন্তু ১৯৩৪-এ এসে তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হতে থাকে। এ বছরেরই শেষ দিকে লাহোরের বাদশাহী মসজিদে ঈদের নামাজ পড়তে যেয়ে তাঁর ঠান্ডা লাগে এবং গলা বসে যায়, পরবর্তীতে তিনি হৃদরোগের শিকার হন। দেশে প্রাপ্ত সব চিকিৎসাই ব্যর্থ হয়। কেবলমাত্র হাকিম নবীনার (প্রকৃত নাম হাকিম আবদুল ওহাব) তত্ত্বাবধানে সাময়িক উপশম হয়।

অসুস্থতার কারণে ইকবালকে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করতে হয়। ফলে, তাঁর জীবিকার সকল উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এসময় ভূপালের নওয়াব স্যার হামিদুল্লাহ খান ইকবালকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে মাশোহারা দিতেন এবং প্রায়শই তাঁকে ভূপালে আসার দাওয়াত পাঠাতেন। ইকবালের প্রতি নওয়াবের এই উদারচিত্ত ব্যবহার আমাদের গ্যাটে ও ডিউক অব উইমারের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এসময় ইকবাল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রোডস বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ পান। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল– The Muslim Conception of Time– সময় সম্পর্কে ইসলামী ধারণা। অসুস্থতার কারণে ইকবাল তাঁর এ নির্ধারিত পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হন।

১৯৩৬-এর শীতে ইকবাল শারীরিকভাবে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানা ছেড়ে কয়েক কদম এগিয়ে যাওয়ার শক্তিও তিনি প্রায় হারিয়ে ফেলেন। এ বছরই আঞ্জুমান-ই হিমায়েত-ই-ইসলামের একটি অনুষ্ঠানে শেষবারের মতো তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হন। উল্লেখ্য, এ সংগঠনটির মঞ্চ থেকেই ইকবাল প্রথম কবি হিসেবে জনস্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এ সময় ইকবাল মঞ্চের উপর বসেছিলেন। যাতে জনতা তাকে ভাল করে দেখতে পায়। পাশাপাশি কয়েকজন তরুণ তাঁরই রচিত উদ্দীপনাময় ও জাতীয় জাগরণমূলক কবিতাগুলো আবৃত্তি করছিল।

১৯৩৭ এ ইকবালের দৃষ্টিশক্তি এত কমে যায় যে, তিনি পড়া ও লেখা উভয়ই ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মিয়া মুহাম্মদ শফী নামে একজন তরুণ সাংবাদিক বন্ধু ইকবালকে প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে শোনাতেন এবং তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক ইকবালের কাছে লেখা চিঠিপত্রের উত্তর দিতেন।

১৯৩৮ এর শুরুতে ইকবাল শেষবারের মতো ইসলাম ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ নিয়ে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।

ইকবালের শরীর এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো যে, এ সময় বোঝাই যেতো– তাঁর সময় শেষ হয়ে আসছে।

১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল সকাল বেলায় ইসলামী পুনর্জাগরণের এই মহান সৈনিক এবং মুসলিম ভারতের দীপ্তিমান জ্যোতিষ্ক ইন্তেকাল করেন।

মৃত্যুর আগে ইকবাল তাঁর শেষ কবিতায় লিখেছেন ঃ

ধার্মিকজন মোমিন মানুষ তাঁহার কাহিনী শোন,
বলিতেছি শোন তার পরিচয় লিপি ঃ
মরণ যেদিন তাহার দুয়ারে বাজাবে রুদ্র বাঁশী,
মোমিন তাহারে হাসিমুখে নিবে বরি।
....
অতীতের সুর আবার বাজিবে
হয়তো বাজিবে নাকো!

হেজাযের বায়ু তুলিবে শিহরে
হয়তো তুলিবে নাকো!
এই যে ফকির দূর দরবেশ তাহার জীবন দিন।
আজিকে তাহার চির অবসান হল
তারপরে এই জীবন খেয়ানী রহস্যজ্ঞানী জন
হয়তো আসিবে এই ধরণীর ঘরে;
কে জানে সে কথা বল?
চলে যাওয়া জন হয়তো আসিবে নাকো। (অনুবাদ- মনীন্দ্র দত্ত)

লাহোর বাদশাহী মসজিদের পাশে তাঁর শেষ আশ্রয়স্থল নির্মিত হয়।

ইকবালের মৃত্যুতে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর পুত্রের কাছে যে শোকগাঁথা প্রেরণ করেন তার ভাষা ছিল নিম্নরূপ–

To me he was a friend, guide and philosopher, and during the darkest moments through which the Muslim League had to go, he stood like a rock and never flinched one single moment.

এ হল এক মহাপুরুষের পক্ষ থেকে আর এক মহাপুরুষের প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন।

ইকবাল তাঁর অসামান্য মনীষা এবং প্রতিভার আলোকচ্ছটায় আমাদেরকে মুগ্ধ করেছেন–আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করেছেন। তাঁর জন্ম হয়েছিলো এক পরাধীন বিরুদ্ধ পরিবেশে কিন্তু তিনি নিজের মধ্যে উজ্জীবিত করেছিলেন এক প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য। দুঃখের রাত্রিতে তাই তিনি জ্বেলেছিলেন এক কল্যাণ স্নেহদীপ। জরাগ্রস্ত হতাশ জাতির জন্য তিনি এনেছিলেন নতুন দিনের বার্তা।

ইকবাল রচনাবলী

ইকবাল ছিলেন মুক্তছন্দ কবি ও লেখক। গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায়ই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি লেখালেখি করেছেন। অর্থনীতির মত জটিল বিষয় থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিকতার মতো বিমূর্ত বিষয় পর্যন্ত। গ্রন্থ রচনা করা ছাড়া তিনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছেন। রাজনৈতিক বিবৃতি তৈরী করেছেন এবং প্রয়োজনে তাঁকে সাক্ষাৎকারও দিতে হয়েছে। ভক্ত অনুরাগীরা তা সংরক্ষণ করেছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে। এছাড়া ইসলামের অতি আধুনিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁকে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে। ধর্মীয় নেতা, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীদের সাথে তিনি আজীবন চিঠিপত্র বিনিময় করেছেন। ইকবাল রচনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে সন্নিবেশিত হলো–

১। ইলমুল ইকতিসাদ

অর্থনীতির উপর লেখা উর্দূতে প্রথম পুস্তক। লাহোর সরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক থাকাকালীন ১৯০৩ সালে ইকবাল এটি রচনা করেন। বইটিতে ইকবাল অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় যেমন– ভূমি, শ্রম, পুঁজি, লভ্যাংশ, বেতন, রাজস্ব, সুদ, জনসংখ্যা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন।

২। তারিখ-ই-হিন্দ– হিন্দুস্তানের ইতিহাস

মধ্য ইংরেজী স্কুলের পাঠ্য হিসেবে ১৯১৩–১৪ সালে বইটি পড়ানো হত। বইটির একটি সংস্করণ অমৃতসর থেকে প্রকাশিত হয়। মূল পুস্তকের কোন কপির সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩। আসরার-ই-খূদী

ইকবাল রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। ইকবালের কবিখ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লেও এতদিন পর্যন্ত তাঁর কোন কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়নি। দেশব্যাপী তাঁর উর্দূ কবিতাসমূহ পঠিত হত, কিন্তু তিনি প্রথমে তাঁর ফার্সী কবিতাসমূহ সংকলিত করার সিদ্ধান্ত নেন। আসরার-ই-খূদী প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। ১৯১৪ সালে আঞ্জুমান-ই-হিমায়েত-ই-ইসলামের বার্ষিক সম্মেলনে ইকবাল শ্রোতৃবৃন্দকে সর্বপ্রথম তাঁর খূদী দর্শনের একটি পূর্ণতর পরিচয় দেয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় তিনি বইটির একটি ভূমিকাও লেখেন। এখানেও তিনি তাঁর খূদী দর্শনের প্রকৃতি নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। তিনি এখানে দেখিয়েছেন প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত খূদী অর্থ অহমিকা ও ঔদ্ধত্যের সাথে তাঁর ব্যাখ্যাত খূদী–মানবের ক্রমাগত সৃষ্টিশীলতার প্রতীকে ব্যবহৃত যে চিত্র তার পার্থক্য।

আসরার-ই-খূদী প্রকাশিত হবার পর সুধী মহলে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়, কিন্তু সূফী তরীকার অনুসারীরা এই পুস্তক প্রকাশকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে গ্রহণ করেননি। কেননা ইকবাল এমন ৩৫টি কবিতা লিখেছিলেন যেখানে তিনি সূফী কবি হাফিজ শিরাজীর তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। উত্তেজনা এতই চরম আকার ধারণ করেছিল যে, খান বাহাদুর পীরজাদা মোজাফফর আহমদ ফজলী রাজ-ই-বেখূদী নামে একটি দীর্ঘ কবিতাও প্রকাশ করেন যা মূলত ইকবালের চিন্তাধারাকে আঘাত করবার জন্যই করা হয়েছিল। সূফী মহলে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে ইকবাল আসরার-ই-খূদীর পরবর্তী সংস্করণ থেকে উল্লেখিত ৩৫টি কবিতা বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এতে অবশ্য তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয়নি। ইকবাল মনে করতেন, কবি হাফিজ শিরাজীর বিরুদ্ধে তিনি যা লিখেছেন তা কোন ব্যক্তিগত ঘটনা নয়। উপরন্তু এ ছিল তাঁর প্রচারিত বিশ্বাসের সমালোচনা যা কিনা ইসলামী দুনিয়ায় সৃষ্টি করেছিল এক ক্রমাগত নির্জীবন প্রক্রিয়া।

আসরার-ই-খূদী প্রকাশিত হবার পাঁচ বছর পর প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ আর, এ, নিকলসন এর ইংরেজী তরজমা করেন। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিকলসনকৃত এ তরজমা বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয়।

৪। রমূযে বেখূদী

১৯১৮ সালে বইটি প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ নতুন কবিতা সংকলন ছিল আসরার-ই-খূদীরই একটি ক্রমসম্প্রসারিত দিগ্বলয়। খূদীর যে ব্যক্তি-অস্তিত্ব তার সামাজিক রূপায়ণ সম্ভব মিল্লাতের মধ্যে। ইকবালের ধারণা মিল্লাতেরও আছে ব্যক্তির মতই একটি খূদী। এ হলো সকলের সমন্বিত খূদীর একটি চিত্ররূপময় কারুকার্য। পরবর্তীকালে দুটি কাব্য গ্রন্থ আসরার-ও-রমূয নামে একই সাথে প্রকাশিত হয়।

রমূযে বেখূদীতে ইকবাল এক আন্তর্জাতিক ইসলামের চিত্র উন্মোচন করেছেন। রমূযে বেখূদীর অনুবাদক প্রখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ আর্থার জন আর্বারীর ভাষায়–

He was in search of a Caliphat centre to which 300.000.000 Muslims of the world could gravitate spiritually and politically.

৫। পায়াম-ই-মাশরিক

এই বইটির প্রকাশকাল ১৯২৩। এ সময়ে ইকবাল কবি হিসেবে সর্বজন খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং তাঁর কবিতাশিল্প পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। তিনি তাঁর এ কাব্যে যেমন পাশ্চত্য দর্শনের অন্তরঙ্গ চিত্র উন্মোচন করেছেন, পাশাপাশি প্রাচ্যের জ্ঞান ভান্ডার বিশেষত কোরআনী চিন্তার ফসলকেও তুলে এনেছেন। এ কাব্য মূলত গ্যাটের WEST OSTLICHER DIVAN-এর অনুসরণে বিরচিত। ভূমিকায় ইকবাল এ কাব্য রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞানের ভান্ডারে গ্যাটের অসামান্য অবদানের কথা বলেছেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে জার্মানীতে গড়ে ওঠা ওরিয়েন্টালিস্ট আন্দোলনের উত্থান ও বিকাশের একটি চিত্রও পেশ করেছেন যা কিনা গ্যাটেকে তাঁর বিখ্যাত ডিভান রচনায় অনুপ্রাণিতও করেছিল। ধারনা করা হয়ে থাকে প্রাথমিকভাবে গ্যাটে ফারসী কবি হাফিজ, আত্তার, সাদী এবং ফেরদৌসী কর্তৃকও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর এ কাব্যে মোট আশিটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ খানকে উদ্দেশ্য করে একটি দীর্ঘ কবিতাও রয়েছে। এর পরে 'সিনাইয়ের ত্যুলিপ' (Tulip of Sinai) নামে ১৬০টি পদ গ্রন্থিত হয়েছে যার বিষয়বস্তু মূলত দর্শনমূলক। পদের নামকরণের মধ্যেও এই দার্শনিক অনুভূতি লক্ষণীয়। যেমন– জীবন, চিরন্তনতা, খোদা, ইশক, যুক্তি এবং মানবজীবনের সাথে এসবের সম্পর্ক। কাব্যটির পরবর্তী অধ্যায়ে রয়েছে নানা ধরনের বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক কবিতা সমষ্টি। যেমন প্রকৃতি বিজয়, চিরন্তন জীবন, কর্মমুখর পৃথিবী, স্বর্গ, কাশ্মীর, মোস্তফা কামালের প্রতি। নকশী ফারাঃ (পাশ্চাত্যের ছাপ) অধ্যায়ে ইউরোপের কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের উপর লেখা কয়েকটি ছোট কবিতা রয়েছে। যেমন– শপেনহ্যায়ার, টলস্টয়, কার্লমার্ক্স, নীটশে, আইনস্টাইন, হেগেল, গ্যাটে, বার্গসঁ এবং লেনিন। বইটি শেষ হয়েছে জীবন ও জগতের নানা সমস্যার উপর লেখা কয়েকটি কবিতার মধ্য দিয়ে।

৬। বাঙ্গ-ই-দারা– কারাভানের ডাক

ইকবালের উর্দূ কবিতার সংকলন। ইকবালের কবি জীবনের শুরু উর্দূ কবিতার হাত ধরে। উর্দূতেই তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক এবং জনচিত্তে আগুন ধরানো কবিতাসমূহ। কিন্তু উর্দূতে রচিত তাঁর কবিতাসমূহ গ্রন্থিত হতে বেশ সময় লেগেছিল। সবশেষে ভক্তদের পুনঃ পুনঃ দাবীর মুখে ইকবাল তাঁর প্রাথমিক জীবনের কবিতাসমূহ ১৯২৪ সালে বাঙ্গ-ই-দারা নামে প্রকাশ করেন। কাব্যটির ভূমিকা লিখেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ মাখজান সম্পাদক স্যার আবদুল কাদির।উল্লেখ্য ইকবাল তাঁর প্রাথমিক জীবনের অনেক বিখ্যাত উর্দূ কবিতা মাখজান পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ভূমিকায় স্যার আবদুল কাদির ইকবাল প্রতিভা এবং তার কবিতার শিল্প ও সৌন্দর্য নিয়ে আলোচনা করেছেন।

কাব্যটির তিনটি অংশ। প্রথম অংশের কবিতাসমুহ ১৯০৫ সালের পূর্বে লেখা যার মধ্যে রয়েছে তাঁর শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ। দ্বিতীয় অংশের কবিতা ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে লেখা। এগুলোর মধ্যে ইকবালের প্রকৃতিপ্রীতি সুস্পষ্ট। শেষাংশে রয়েছে ইসলামী অনুভূতিতে আচ্ছন্ন কবিতাসমূহ যা ১৯০৮ সালের পরে লেখা হয়েছিল।

৭। যবূর-ই-আযম

১৯২৭ সালে ফার্সী কবিতার এ সংকলন প্রকাশিত হয়। এর দুটি অংশ। প্রথম ভাগে রয়েছে কিছু ক্ষুদ্র কবিতা ও গীত এবং দ্বিতীয় অংশের নাম গুলশান-ই-রাজ-ই-জাদীদ (রহস্যাবৃত নতুন

গোলাবকুঞ্জ)। সূফী কবি মাহমুদ শাবিস্ত্রীর সুপ্রসিদ্ধ মসনবী গুলশান-ই-রাজের (রহস্যাবৃত গোলাব কুঞ্জ) অনুকরণে ইকবাল তাঁর এ মসনবী রচনা করেন। মসনবীতে ইকবাল তাঁর বিশিষ্ট দার্শনিক ভঙ্গিতে বর্তমান পৃথিবীর সমস্যাবলীর আলোকে কিছু উচ্চাঙ্গের প্রশ্ন সাজিয়েছেন এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে সেগুলির তিনি উত্তরও দিয়েছেন। এছাড়া এ কাব্যে গ্রন্থিত হয়েছে 'বন্দেগী নামা' নামে আরেকটি ছোট্ট মসনবী, যেখানে ইকবাল দাসত্ব ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে মানবতাকে সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। স্বাধীনতাবিহীন জাতির কাছে ইকবাল পেশ করেছেন মুক্ত মানবের সৃষ্টিশীল চিত্র। ধারণা করা হয়ে থাকে যবূর-ই-আযম কাব্যে ইকবালের গীতি কবিতাসমূহ চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। কোন কোন লেখক মনে করেন ইকবালের নিজের মতেই এ কাব্য হলো তাঁর শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবিতার সংকলন।

৮। ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন

ইকবালের বিশ্বনন্দিত বক্তৃতার সংকলন। এ বক্তৃতা হলো তাঁর সংস্কারক ও দার্শনিক মনের প্রোজ্জ্বল চিত্র। ইসলামী সমাজদেহ থেকে আপতিত জঞ্জাল সরিয়ে তার উপর কল্যাণ প্রসূত লাবণ্য বিস্তারের যুগন্ধর ভূমিকা নিয়ে ইকবাল এখানে উপস্থিত। এ বক্তৃতার বিষয়বস্তু প্রস্তুত করতে তাঁর প্রচুর সময় ও শ্রমের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৯২৮ সালের ৫ ডিসেম্বর পুরনো বন্ধু মীর গোলাম ভীক নৈরাংকে লেখা এক চিঠিতে ইকবাল এ বক্তৃতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লিখেছেন–

The audience for these lectures are those Muslims who are influenced by western philosophy and are desirous of interpreting Islamic Philosophy in terms of western philosophy. If there are certain defects in the old ideas, they should be removed. My job in this matter is constructive and creative, but in doing so I have kept the best traditions of Islamic philosophy foremost in my mind.

এটা অনস্বীকার্য, প্রত্যেকটি বক্তৃতাই ছিল সারগর্ভ তথ্যপূর্ণ ও বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল। তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকের চিন্তা-ভাবনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছিল অত্যন্ত সতেজ ও অনুভূতিপ্রবণ। পাশাপাশি ইকবালের কোরআনী চিন্তার ব্যাখ্যায়নও ছিল অধিকতর দীপ্তিমান। এ সমস্ত বক্তৃতার বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করতে হলে পাঠককে অবশ্যই ইকবালের কবিতাসমূহের সাথে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। কেননা, তাঁর কবিতার দর্শন চিন্তার সাথে এ সমস্ত বক্তৃতা সম্পর্কযুক্ত।

৯। জাভিদনামা– শাশ্বত গাথা

দান্তের ডিভাইন কমেডির অনুসরণে ইকবাল এটি রচনা করেন। জাভিদনামা প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। সাহিত্য জগতে পারলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতিক স্তরে পরিভ্রমণ হলো কবি ও দার্শনিকদের চিরদিনের খেয়াল। ইকবালও তেমনি জীবন রহস্য, অস্তিত্ব, অনস্তিত্বের সমস্যা, খোদা, চিরন্তনতা, সময় প্রভৃতি সমস্যার মুখোমুখী হয়ে আধ্যাত্মিক পৃথিবীতে যাত্রার সিদ্ধান্ত নেন এবং সেখানে অবস্থান করছেন এমন কিছু ব্যক্তিত্বের সাথে মোলাকাত করেন যারা কিনা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বীয় কর্ম ও প্রতিভার ছোঁয়ায় স্থায়ী আবেদন রেখে গেছেন। তাদের সাথে ইকবালের আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয় জীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে। খাজা সুজার কাছে লেখা ১৯৩১ সালের ২০ জানুয়ারী এক চিঠিতে ইকবাল তাঁর জাভিদনামার একটি রূপকল্প হাজির করেছেন–

My latest poem is going to be Javid Nama which probably would consist of two thousand verses. It is not as yet complete and would most likely be finished in March. This is a sort of Divine Comedy written according to the pattern of Rumis' Mathnawi. Its introduction will be very intersting and would contain many things for India, Persia and for that matter, for the entire Muslim world.

বইটি প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর এই আধ্যাত্মিক যাত্রার সঙ্গী ও মুর্শিদ হন ফার্সী কবি রুমী, যেমন দান্তের ক্ষেত্রে ভার্জিল। রুমীর সাথে ইকবাল অধ্যাত্ম পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং এখানকার বাসিন্দাদের সাথে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়।

ইকবালের সাথে দেখা হয় সংস্কারক জামালুদ্দীন আফগানী এবং সাঈদ হালিম পাশার, সাম্রাজ্যবাদী কিচেনারের, সুফী হাল্লাজের, শহীদ তাহিরার, বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর ও সাদিকের এবং চিন্তাবিদ লেখক ও কবি গালিব, নীটশে, তাহির গনী কাশ্মীরী এবং ভতৃহরির। এ সমস্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, প্রাচীন ও আধুনিক উভয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার সাথে ইকবালের অন্তরঙ্গতা ছিল ব্যাপক।

১০। বাল-ই-জিব্রীল– জিব্রাইলের ডানা

বাঙ্গ-ই-দারা প্রকাশিত হবার পর ইকবাল পুনরায় ফার্সী কবিতার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তিনি নিজেও মনে করতেন, তাঁর দার্শনিক অনুভূতি ও চিন্তা বিবৃত করবার জন্য ফার্সী হলো উত্তম মাধ্যম। কিন্তু আধুনিক মুসলিম ভারতের ভাষা হিসেবে উর্দূর জনপ্রিয়তা যেহেতু বেড়ে চলেছিল এবং তিনি নিজেও ছিলেন ভারতীয় মুসলমানদের কল্যাণকামী, তাই তিনি নতুন করে উর্দূর দিকে নজর দেন এবং ১৯৩৫-এ তাঁর উর্দূ কাব্যগ্রন্থ বাল-ই-জিব্রীল প্রকাশিত হয়। অনেকের ধারণা, বাল-ই-জিব্রীল ইকবালের শ্রেষ্ঠ উর্দূ কাবিতার সংকলন। কল্পনার প্রসারতায়, বর্ণনার চিত্তহারী মাধুর্যে, শব্দ চয়ন ও সৌন্দর্যে কবিতাসমূহ মধুরতর হয়ে উঠেছে।

কাব্যের বিষয়বস্তু কেন্দ্রীভূত হয়েছে খূদী, মোমিন, আযাদী, জিহাদ, ইশক প্রভৃতির উপর। এছাড়াও রয়েছে সাকীনামা নামে একটি ছোট মসনবী যাতে বিবৃত হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণ-নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার দুর্গতি। পাশাপাশি মুসলমানদের বিপর্যয়ের চিত্র উন্মোচন করে তিনি তাদের এ ঘুম থেকে জেগে ওঠারও আহ্বান জানিয়েছেন। এরপরে রয়েছে রুমী ও তাঁর ভারতীয় সাগরিদের (ইকবাল) মধ্যে একটি কাব্যিক কথোপকথন, যার মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছে ইকবালীয় চিন্তার ফসল। বাকী কবিতা সমূহও চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে মনোরম। বিশেষ করে মুসলিম স্পেন বিষয়ক কবিতা ও খোদার সম্মুখে লেনিন এক অপূর্ব ভঙ্গিমায় জাজ্বল্যমান।

১১। 'পস্ চেহ বায়াদ করদ আয় আকওয়ামে শারক্ মায়া মুসাফির'– তবে কি করা চাই, হে প্রাচ্যের জাতিসমূহ?

ইকবালের ফার্সী কবিতার এ সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। ইকবালের প্রতি রুমীর উপদেশের মধ্য দিয়ে কাব্যটির শুরু। রুমী ইকবালকে নির্দেশ দিচ্ছেন প্রাচ্যবাসীকে ধর্ম ও রাজনীতির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করাতে। সে পরিপ্রেক্ষিতেই ইকবাল এ কাব্যে দুটি অংশ বিরচন করেন– **হিকমত-ই-কলিমী** (মুসার প্রজ্ঞা) এবং **হিকমত-ই ফিরাউনী** (ফিরাউনের প্রজ্ঞা)

এর পরে বিবৃত হয়েছে ইকবালের বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চিন্তা ভাবনার ফসল ; যেমন খোদার একত্ব, ইসলামী তাসাউফ, আযাদী, ইসলামী জীবন ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিকতার সমস্যা, মানবতার ঐক্য ইত্যাদি।

ইকবাল আফগানিস্তানের বাদশাহ নাদির শাহ কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে কাবুল সফর করেন; উদ্দেশ্য সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার। এ সুযোগে ইকবাল আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থান ও ঐতিহাসিক কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। এ সফরের অভিজ্ঞতাই বাণীরূপ পেয়েছে তাঁর মসনবী মুসাফিরে যা এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। মুসাফিরের শুরু বাদশাহ নাদির শাহর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে। ইকবাল তাঁর চরিত্রের উজ্জ্বলতর দিকগুলি মূর্ত করে তুলেছেন পাশাপাশি আফগান জনগণের প্রতি তাঁর অপরিসীম অবদানের কথাও উল্লেখ করেছেন।

১২। যর্‌বে কলীম– কলীমের আঘাত

এই বইটিও ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এর একটি উপশিরোনাম (Sub title) হলো এলান-ই-জং দাউর-ই-হাযর কি খিলাফ– বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। নামকরণের মধ্যেই পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য নিহিত। বিভিন্ন শিরোনামে বইটি বিভক্ত, যেমন ইসলাম ও মুসলমান, শিক্ষা, নারী, সাহিত্য ও সুকুমার কলা, রাজনীতি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইত্যাদি। কবিতাগুলো ছোট কিন্তু বর্তমান সভ্যতা বিশেষত পাশ্চাত্য সভ্যতার সমালোচনায় পরিপূর্ণ।

১৩। আরমুগান-ই-হিজায–হিজাযের সওগাত

ইকবালের মৃত্যুর পর এ কাব্য প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে গ্রন্থিত হয়েছে ফার্সী কবিতাসমূহ এবং শেষ দিকে কিছু উর্দূ কবিতা। ফার্সী কবিতার অধিকাংশই ক্ষুদ্রাকার, কিন্তু এগুলি হচ্ছে ইকবালীয় চিন্তার এক একটি ফুল্লকুসুম।

উর্দূ কবিতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **ইবলিস-কি মজলিস-ই শূরা**। এর মধ্যে বিধৃত হয়েছে বর্তমান দুনিয়ার অস্থির রাজনৈতিক চিত্র এবং মুসলিম মিল্লাতের উপর তার অশুভ প্রভাব। এর পরে রয়েছে বন্ধু স্যার রস মাসুদের অকাল মৃত্যুতে ইকবালের একটি কবিতা। প্রাথমিকভাবে তিনি এটিকে একটি শোকগাঁথা হিসাবে লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আবেগের অবিশিষ্ট প্রকাশে এটি পরিণত হয় একটি উচ্চাঙ্গের দীর্ঘ কবিতায়– যার মধ্যে ইকবাল তাঁর খূদী, মোমিন ইত্যাদি দর্শনজাত উপলব্ধিকেও অন্তর্ভুক্ত করেন।

ইকবালের জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর যা প্রকাশিত হয় তা ছাড়াও তাঁর ছিল অন্যান্য পরিকল্পনা। অর্থনৈতিক কারণে কিংবা রাজনৈতিক ব্যস্ততার জন্য অথবা শেষের দিকে দীর্ঘ অসুস্থতা হেতু তিনি অনেক কিছুই অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন। যুবক বয়স থেকেই ইকবালের স্বপ্ন ছিল ইসলামকে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করা। সে লক্ষ্যে তিনি ধারণা করেছিলেন যদি ইসলামী নীতিমালাসমূহ আধুনিক সমস্যাবলীর আলোকে সবার সামনে উপস্থাপন করা যায় তবে এর একটি কার্যকর রূপ ফুটে উঠতে পারে এবং এভাবেই ইসলামের শরীর থেকে কুসংস্কার ও অন্ধত্বের জঞ্জাল অপসারণ সম্ভব। ইকবাল বর্তমান কালে প্রচলিত আইনের উপর ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। সৈয়দ সুলায়মান নদভীর কাছে ১৯২৬ সালের ৭ এপ্রিল লেখা এক চিঠিতে ইকবাল

তার উল্লেখ করেছেন–

My ambition is to study Islamic concepts in the light of Modern jurisprudence. But this should be done with a critical attitude and not in a slavish manner.

এ লক্ষ্যে ইকবাল অনেক পরিকল্পনাই হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই পূর্ণতার মুখ দর্শন করেনি।

ইকবাল আর একটি কাজ করবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিন্তু সেটিও শেষ পর্যন্ত অপূর্ণ থেকে যায়। Islam As I Understand It নামে তিনি একটি বই লিখবেন মনে করেছিলেন। যদিও তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় স্বীয় বিশ্বাসের প্রকৃতি বিপুল পরিমাণে বিধৃত হয়েছে, তবু তিনি চেয়েছিলেন বিশ্ববাসীর সামনে ইসলামের একটি সংহত ও কল্যাণপ্রদ চিত্র তুলে ধরতে।

তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মতে, ইকবাল জীবনের শেষ দিনগুলোতে একটি বই রচনার কথা প্রায়শই বলতেন যা নাকি পাঠককে গভীর অভিনিবেশ সহকারে কোরআন পাঠে আগ্রহান্বিত করে তুলতে পারে। বইটির নাম দিয়ছিলেন তিনি AIDS TO THE STUDY OF THE QURAN'. নীটশের THUS SPAKE ZARATHUSTRA' র অনুসরণে তিনি আরেকটি বই লিখতে চেয়েছিলেন; এটির নাম নির্বাচন করেছিলেন The Book of An Unknown Prophet বইটিতে কিছু আধ্যাত্মিক সমস্যাকে সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করবার তাঁর পরিকল্পনা ছিল।

বহুদিন ধরে ইকবালের ইচ্ছা ছিল তিনি একটি ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলবেন যেখানে পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী ও ধর্মীয় নেতাদের সমাবেশ ঘটবে যারা কিনা মানবতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে অবিসংবাদী ভূমিকা পালন করবেন। এটি হবে একটি আবাসিক প্রতিষ্ঠান এবং এখানে গবেষকদের সকল জাগতিক চাহিদা পরিপূরণের নিশ্চয়তা থাকবে। ইকবাল চেয়েছিলেন এখান থেকে এমন একদল গবেষণাকর্মী বের হয়ে আসবে যারা কিনা ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার উপর পুস্তক রচনা করবে পাশাপাশি ইসলামী আদর্শকে এমনভাবে উপস্থাপিত করবে যা কিনা পৃথিবীতে বিপ্লব সংগঠিত করতে পারে।

কিন্তু তাঁর এ পরিকল্পনাও বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। ১৯৩৭ সালে চৌধুরী নিয়াজ আলী নামে জনৈক ধার্মিক মুসলমান ইকবালকে পাঠানকোটের কাছে এক বিস্তীর্ণ এলাকা ছেড়ে দেয়ার আশ্বাস দেন যাতে তিনি তাঁর বহুদিনের লালিত স্বপ্ন দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। নিয়াজ আলী এ প্রতিশ্রুতিও দেন পাঠানকোটের বিস্তীর্ণ জমি গবেষকদের কল্যাণেই ব্যবহৃত হবে।

এমনিভাবে ইকবাল তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে দেখে কায়রো আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান মোস্তফা-আল-মারাগীর কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি দার-উল-ইসলামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখে জানান এবং তাঁর সহযোগিতা কামনা করেন–

We have decided to establish an institution, which would be incomparable in this part of world. It is our wish that it should be better than similar religious institutions in other parts of the Muslim world. The main purpose is to bring together certain leading scholars of modern sciences and some outstanding theologians together. These scholars should be of high standard

206p.

and superior calibre, and those who are prepared to dedicate their lives for Islam. Away from the din and storm of the centres of civilisation, these scholars will live in a hostel which will be attached to their research Academy. We want a renowned scholar who will have a perfect insight into the Quran and who will act as a guide to the rest of the scholars about the Holy Book and the traditions of the Holy Prophet. In view of the significance of such a project, I would request that a famous Egyptian scholar of the expense of the Al-Azhar University may be loaned to us to guide us in the righteous plan.

দুঃখজনকভাবে ইকবাল এরপর বেশীদিন বাঁচতে পারেননি; তাই তাঁর স্বপ্নও পূর্ণতা পায়নি।

ইকবালের জীবন ছিল সমৃদ্ধিশীল, বিকাশমান ও গৌরবদীপ্ত। বিপুল প্রসারী মুক্ত আকাশের মত তাঁর বিস্তৃতি। তাঁর কর্মই তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের আলোকোজ্জ্বল স্বাক্ষর– তাঁর সাধনাদীপ্ত জীবনের হীরন্ময় প্রতিচ্ছবি।

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
30801
LAHORE

লেখক পরিচিতি

প্রতিশ্রুতিশীল লেখক-গবেষক ফাহমিদ-উর-রহমান ১৯৬৩ সালের ২৮ অক্টোবর যশোর জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম ডাঃ মাসুদুর রহমান ছিলেন যশোরের বিখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যশোর জেলা স্কুলে তাঁর লেখাপড়ার সূত্রপাত। একই স্কুল থেকে ১৯৭৯ সালে তিনি এস.এস.সি এবং যশোর সরকারী মাইকেল মধুসূদন কলেজ থেকে ১৯৮১ সালে এইচ.এস.সি পাস করেন।

১৯৮৮ সালে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সার্ভিসে কর্মরত।

ছোটবেলা থেকেই সাহিত্য চর্চার প্রতি তাঁর অনুরাগ জন্মে। দৈনিক আজাদের 'মুকুলের মহফিলের' মাধ্যমে তাঁর সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ ঘটে। বর্তমান গ্রন্থ ছাড়াও ইকবালের উপর তিনি একাধিক প্রবন্ধ লিখেছেন। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে : *খলিফাতাবাদের সন্ধানে, কেন জিন্নাহ?* প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর জীবনের
ইকবালের জীবন, দর্শন ও রাজ
হিসেবে তাঁকে প্রথম সারিতে
পাশ্চাত্য সভ্যতা, কমিউনিজম
অকৃপণভাবে উপস্থাপন করেছেন

00030801

গ্রন্থকার উপমহাদেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের ইতিহাস তুলে ধরেছেন বিচক্ষণতার সাথে। বিভিন্ন মনীষীর উদ্ধৃতি এনে সমৃদ্ধ করেছেন গ্রন্থখানাকে। ভাষার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তিনি ইকবালকে আত্মস্থ করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর ইকবাল যে আঘাত করেছেন লেখক তা চিত্রায়িত করেছেন নির্ভীকভাবে। গ্রন্থখানা যে কোন পাঠকের বারবার পড়তে ইচ্ছে হবে বলেই বিশ্বাস।